মুগনিউর রহমান তাবরীজ

অ্যা লেটার টু অ্যাথিইস্ট

বই সম্পর্কে

সমাজবিজ্ঞানের মোড়কে 'বস্তুবাদ' গিলতে গিলতে, জীববিজ্ঞানের মোড়কে 'বিবর্তনবাদ' লজেন্স চুষতে চুষতে হতাশার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে ভাবতে থাকি, 'মার্ক্সবাদ' কিংবা 'লেলিনবাদ'-ই তাহলে একমাত্র আশা। এই সুযোগে ডেভিড হিউম এসে কানে কানে বলে যায়, 'আরে ধুর, স্রষ্টা কী, আর ধর্মই বা কী, বাদ দাও তো বাপু! এসবের ভিত্তি আছে নাকি? এসো তোমাকে আলোর পথ দেখাচ্ছি।'

ব্যস, আমরাও চোখ বন্ধ করে আরাধ্য পথ হাতড়ে বেড়াই।

এই হলো জাহেলিয়াতের রূপ। রূপ দেখলেও তার স্বরূপ দেখেছেন কখনো? সময় করে একটু ঘুরে আসুন মুহাম্মাদ আসাদের 'ইসলাম অ্যাট দ্য ক্রস রোডস', স্যামুয়েল পি হান্টিংটনের 'দ্য ক্ল্যাশ অব সিভিলাইজেশন' কিংবা প্যাট্রিক গ্লাইনের 'গড : দ্য এভিডিয়েন্স'-এ। এসবে আপনি দেখবেন ঈশ্বরের নামে বানানো মানুষের তৈরি মূর্তি আর ধর্মগ্রন্থের নামে বানানো নানান মিথোলজির সঙ্গে বিজ্ঞানের তুমুল ঝগড়াতে নাস্তিক্যবাদের জন্ম হয়েছে। সে ঝগড়ায় ইসলাম ছিল অনুপস্থিত।

কিন্তু হাল জামানার নাস্তিকতা মানেই ইসলাম বিরোধিতা। কারণ, নাস্তিক্যবাদের মূলে কুঠারাঘাত করেছে আল ইসলাম। তারা আপনাকে জোর করে বোঝাতে চায়, মানুষের বানানো মূর্তির মতো আল্লাহ তাআলাও একজন ভিত্তিহীন কল্পিত স্রষ্টা। মিথ-পুরাণের মতো কুরআনও মানুষের লেখা মিথ; যেখানে আছে অনেক ভুল। সাড়ে চৌদ্দশত বছর আগে আরব দেশের মুহাম্মাদ নামের একজন ব্যক্তির মনগড়া মতবাদ 'ইসলাম' আজকের দুনিয়ায় বড্ড সেকেলে, অচল জীবনদর্শন।

সত্যি কি তাই?

না, কক্ষনো না। চলুন একবার ঘুরে আসি স্রষ্টা, কুরআন, ইসলাম আর নাস্তিক্যবাদের সংঘাত জগতে।

অ্যা লেটার টু অ্যাথিইস্ট

মুগনিউর রহমান তাবরীজ

অ্যা লেটার টু অ্যাথিইস্ট

মুগনিউর রহমান তাবরীজ

গার্ডিয়ান পাবলিকেশন
৩৪, নর্থব্রুক হল রোড (২য় তলা),
বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০
✆০১৭১০-১৯৭৫৫৮, ০১৯৯৮-৫৮৪৯৫৮
guardianpubs@gmail.com
www.guardianpubs.com

অনলাইন পরিবেশক
www.rokomari.com
www.boibajar.com

প্রথম প্রকাশ : ১০ নভেম্বর, ২০১৮

শব্দ বিন্যাস : মো. জহিরুল ইসলাম
প্রচ্ছদ : হাশেম আলী
মুদ্রণ : একতা অফসেট প্রেস
১১৯ ফকিরাপুল, জবেদা মেনশন, মতিঝিল ঢাকা।

হার্ডকভার মূল্য : ৩৩৫
পেপারব্যাক মূল্য : ৩০০

ISBN- 978-984-8254-16-5

A Letter to Atheist by Mugniur Rahman Tabriz Published by Guardian Publication, Price Tk. 335 (HC)/Tk. 300 (PB) Only.

প্রকাশকের কথা

অবিশ্বাসী আত্মা বরাবরই অভিযোগপ্রবণ। সন্দেহ আর অবিশ্বাসের দেয়ালে ধাক্কা খেতে খেতে তারা কেবল অভিযোগের সুর সাধে। 'বিশ্বাসীরা যুক্তির তোয়াক্কা করে না'– অভিযোগ তুলে তারা নিজেদের অবিশ্বাসী দর্শনের গায়ে একটা পরিতৃপ্তির চাদর পরিয়ে দেয়। সময়ের ব্যবধানে তাদের কোনো দাবিই শেষমেশ টিকে থাকে না। ঠিক তেমনি এই অভিযোগও ধোপে টিকেনি। লড়াইটা শুরু হয়েছিল 'প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ' বইয়ের মাধ্যমে। ঠিক যে ভাষায় তারা বুঝতে চায়, সে ভাষাতেই ইসলাম সম্পর্কে উত্থিত আজগুবি প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছিল। এরপর বেশ কয়েকজন তরুণ লেখক খুবই চমৎকারভাবে অবিশ্বাসীদের প্রশ্নবাণের যৌক্তিক ও প্রাঞ্জল প্রত্যুত্তর দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ। এ ধারাবাহিকতার নতুন সংযোজন *অ্যা লেটার টু অ্যাথিইস্ট*।

একজন আলোর পথযাত্রী তরুণ মুগনিউর রহমান তাবরীজ সামর্থের সর্বোচ্চটুকু ঢেলে গ্রন্থটি সাজিয়েছেন। বিশ্বাসী একজন ছোটো ভাই তাঁর অবিশ্বাসী বড়ো ভাইকে হৃদয়স্পর্শী ভাষায় চিঠি লিখে ইসলাম সম্পর্কে ভুল অপনোদনের প্রয়াস চালিয়েছেন। ক্রমবর্ধমান সোস্যাল মিডিয়ার সুযোগ নিয়ে আমাদের সমাজব্যবস্থায় এমন অবিশ্বাসী বড়ো ভাইদের তৎপরতা বেড়েই চলেছে। থেমে নেই বিশ্বাসী তরুণদের লড়াইও। এই গ্রন্থে বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের সেই চিরন্তন লড়াইয়ের দৃশ্যপট খুঁজে পাবেন।

সম্মানিত লেখক এই গ্রন্থ নিয়ে প্রায় এক বছর টানা পরিশ্রম করেছেন। পাণ্ডুলিপি নিয়ে *গার্ডিয়ান পাবলিকেশন* পরিবার সর্বোচ্চ পেশাদারিত্ব নিয়ে সম্পাদনা করার চেষ্টা করেছে। বিশেষ করে তরুণ আলেমে দ্বীন মুহতারাম শাহাদাৎ হুসাইন খান ফয়সাল ভাই গ্রন্থটি খুব যত্নের সাথে সম্পাদনা করেছেন। সম্মানিত লেখক, সম্পাদকসহ গ্রন্থটি পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করার পুরো প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমরা মানবিক সত্তা হিসেবে শতভাগ ত্রুটিমুক্ত থাকতে পারি না। যতটুকু ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে তার দায় আমাদের, যা কিছু কল্যাণকর ও ভালো হয়েছে, তার বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা আমাদের মুক্তি দান করুন।

নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের
বাংলাবাজার, ঢাকা।
৩০ অক্টোবর, ২০১৮

সম্পাদকের কথা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِيْنَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ أَجْمَعِيْنَ. أَمَّا بَعْدُ:

আস্তিক-নাস্তিক দ্বন্দ্ব নতুন কোনো বিষয় নয়। প্রাচীনকাল থেকেই শয়তানের প্ররোচনায় আদমসন্তান সিরাতে মুস্তাকিম থেকে বিচ্যুত হয়েছে। কখনো ধর্মের ভেতরে থেকে, কখনো ধর্মের বাইরে গিয়ে তাদের বিচ্যুতি ঘটেছে। প্রাথমিকভাবে ও প্রধানত ধর্মগুলোই নাস্তিকতার বিরুদ্ধে প্রধান ও শক্ত চ্যালেঞ্জ। তাই নাস্তিকরা প্রথমত ধর্মকে আঘাত করে ধর্মে বিশ্বাসীদের বিশ্বাসকে নড়বড়ে করে দেওয়ার অপচেষ্টা চালায়। পরবর্তী ধাপে যাদের বিশ্বাসে চির ধরাতে পারে, তাদেরকে নিজেদের দলে ভিড়ানোর চেষ্টা করে। এই চেষ্টায় তারা প্রধানত তিনটি বিষয়কে প্রধান হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে; বিজ্ঞান, ধর্মীয় গ্রন্থের বিকৃতরূপ এবং ধর্মানুসারী কর্তৃক ধর্মের বিকৃত চর্চা। অথচ এই তিনটি বিষয় তাদের পক্ষে কথা বলে না। বিজ্ঞান ও ধর্মগ্রন্থ; বিশেষ করে ইসলাম ধর্মের ধর্মগ্রন্থ উলটো তাদের অবিশ্বাসী দর্শনকে বাতিল ঘোষণা করে।

বিজ্ঞানের কিছু অপ্রমাণিত তত্ত্ব ও তথ্য সাময়িকভাবে জন্য ধর্মানুসারীদের বিভ্রান্ত করতে পারলেও চূড়ান্তভাবে তাদের দলে রাখতে সক্ষম হয় না। আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা হিদায়াত এমন এক আলো, যা তার চারপাশের সবকিছুকে এমনভাবে আলোকিত করে, ইচ্ছা করলেও সেই আলো থেকে আড়ালে থাকা প্রায় সম্ভব হয় না। হিদায়াতের মূল কথাই হচ্ছে এক আল্লাহতে বিশ্বাস। এটি মানুষের স্বভাবজাত বিষয়। তাওহিদ বা আল্লাহর একত্ব হচ্ছে সকল কিছুর কেন্দ্র। এই কেন্দ্র থেকে যতদূরেই যাক না কেন, কেন্দ্রের টান সবসময় সে অনুভব করবেই। শুধু দুর্ভাগ্যবানরাই এই হিদায়াতের আলো থেকে স্থায়ীভাবে বঞ্চিত হয়।

নাস্তিক্যবাদী অবিশ্বাসী দর্শন ও বিশ্বাসকে দুমড়েমুচড়ে দেওয়ার জন্য কুরআন ও সুন্নাহই যথেষ্ট। তারপরও যুগে যুগে অনেকেই কুরআন ও সুন্নাহর পাশাপাশি অকাট্য যুক্তিও উপস্থাপন করেছেন। কিন্তু এরপরেও অবিশ্বাসী ও ইসলাম বিদ্বেষীরা কালে কালে নানান প্রশ্ন তুলে ইসলাম, কুরআন, সুন্নাহ, আল্লাহ, মুহাম্মাদ (সা.)-কে অস্বীকার করতে চেয়েছে। মুখে অস্বীকার করার কথা বললেও বাস্তবে তারা কখনোই স্রষ্টাকে অস্বীকার করতে পারেনি। কারণ, তাদের দেহের প্রতিটি লোমকূপ, শিরা-উপশিরা একজন মহাশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব জানান দিয়ে যাচ্ছিল। যদিও তারা সৃষ্টিকর্তাকে অস্বীকার করার মিথ্যা দাবি করে আসছে।

সেসব মিথ্যা ও অসার দাবিগুলোকে বহুবার বহুভাবে মিথ্যা ও অসার প্রমাণ করার পরও তারা কখনো বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে, আবার কখনো কিছু ধর্মীয় গ্রন্থের বিকৃতরূপ ও ধর্মানুসারী কর্তৃক ধর্মের বিকৃতচর্চার দোহাই দিয়ে সর্বশক্তিমান আল্লাহকে অস্বীকার করার চেষ্টা করেছে এবং ধর্মে বিশ্বাসের অসারতা প্রমাণের চেষ্টা করেছে।

অন্যান্য ধর্মগুলোর চেয়ে অপেক্ষাকৃত বেশি তাদের রোষানলে পড়েছে ইসলাম। কারণ, ইসলামই সর্বাধুনিক জীবনব্যবস্থা। এই ব্যবস্থার মূল গাইডবুক কুরআন সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ তাআলা। তাই ইসলামই বর্তমান পৃথিবীর একমাত্র গ্রহণযোগ্য ও অবিকৃত দ্বীন। আর এজন্য অন্যান্য ধর্মের তুলনায় ইসলামের প্রতি নাস্তিকদের ক্ষোভ অনেক বেশি। ইসলামের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে নাস্তিকপাড়া বিষোদ্‌গারে ব্যতিব্যস্ত।

তাদের এসব বিষোদ্‌গারের জবাব এর আগেও বহুবার দেওয়া হলেও তাদের মিথ্যাচার ও অপবিজ্ঞান চর্চা থামেনি। থামবে কিনা জানি না। তবে অবিশ্বাসী ও সন্দেহবাদীদের থাবা থেকে কোমলমতি শিশু-কিশোর-তরুণদের বাঁচানোর জন্য কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক প্রমাণ এবং অপবিজ্ঞানের অসারতা প্রমাণে বিজ্ঞান ও যুক্তির ব্যবহার দাওয়াতি কাজে হিকমাহ ব্যবহারের অনন্য উপমা। অবিশ্বাসী ও সংশয়বাদী মন থেকে সকল অবিশ্বাস ও সংশয়কে ধুয়ে মুছে সাফ করে এক আল্লাহতে বিশ্বাসী আলোকিত প্রজন্ম গড়ার প্রত্যয়ে লেখা বই *অ্যা লেটার টু অ্যাথেইস্ট*।

নাস্তিক বড়ো ভাইয়ের কাছে লেখা আস্তিক ছোটো ভাইয়ের একটি দীর্ঘ চিঠিই এই বইয়ে একটি বড়ো অংশ জুড়ে আছে। সেই চিঠিতে আল্লাহ, ইসলাম, মুহাম্মাদ (সা.), কুরআন ইত্যাদি বিষয়ে নাস্তিকদের তোলা বেশ কিছু প্রশ্ন ও সংশয়ের প্রামাণ্য, যৌক্তিক, তথ্যনির্ভর ও বিজ্ঞানভিত্তিক জবাব দেওয়া হয়েছে। নাস্তিকদের বিভিন্ন জবাবের পাশাপাশি বইটিতে তরুণ লেখক প্রিয় মুগনিউর রহমান তাবরীজ খ্রিষ্টান ও হিন্দু ধর্মের অসারতাও তুলে ধরেছেন। এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করে একদিকে যেমন একজন নাস্তিক খুঁজে পাবে তার স্রষ্টাকে, অন্যদিকে খ্রিস্টান ও হিন্দু ভাইবোনেরা খুঁজে পাবে সত্যের নিশান।

আমি নিজেকে আলিম মনে করার চেয়ে তালিবে ইলম মনে করাই বেশি উপযোগী মনে করি ও তাতেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি। প্রকাশক ও লেখকের পক্ষ থেকে এই বইটির সম্পাদনার প্রস্তাব পেয়ে আড়ষ্ট হয়েছি। নিজের ইলমি অযোগ্যতা ও স্বল্পতা বিবেচনায় অভিজ্ঞ কোনো আলিমকে দিয়ে সম্পাদনা করানোর অনুরোধ করেছিলাম। তারপরও তারা আমার ওপর আস্থা রেখেছেন। এড়াতে না পেরে শেষ পর্যন্ত

আমিও আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে এবং আল্লাহর কাছে তাওফিক কামনা করে দায়িত্ব নিয়েছিলাম। বড়ো রকমের কোনো সমস্যা বা ভুল আমি বইটিতে পাইনি। ছোটো ছোটো কিছু সমস্যা পেয়েছি, যা সংশোধিত হয়েই পাঠকের হাতে যাচ্ছে, আলহামদুলিল্লাহ।

আয়াত-হাদিসগুলো পুনঃযাচাই করার পাশাপাশি আকিদার বিষয়গুলো বেশি গুরুত্ব সহকারে দেখার চেষ্টা করেছি। ফারায়েজের আউল পদ্ধতিসহ কিছু ফিকহি মাসয়ালাও বইটিতে স্থান পাওয়ায় সেগুলোও সাধ্যানুযায়ী যাচাই করেছি। মানুষ ও বিভিন্ন প্রাণীর ছবি ব্যবহারের বিষয়টি যদিও সাধারণভাবে অনুমোদিত নয়, তারপরও বিষয়বস্তু স্পষ্টভাবে উপস্থাপন ও নাস্তিক্যবাদী দর্শনের অসারতা, বিজ্ঞানহীনতা ও কূপমণ্ডুকতা প্রকাশ করার মতো বৃহত্তর কল্যাণের স্বার্থে সেগুলো রাখা হয়েছে। আল্লাহ যেন আমাদের মাফ করেন। আমিন।

সাধ্যানুযায়ী সাবধানতার পরেও কোনো ভুলত্রুটি আমার দৃষ্টি থেকে ছুটে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। এমন কিছু যদি হয়েই থাকে, তাহলে আল্লাহ যেন আমাকে এবং লেখক-প্রকাশকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ক্ষমা করেন। বিচক্ষণ পাঠকগণ যদি গ্রহণযোগ্য কোনো ভুল দেখতে পান, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে লেখক, প্রকাশক বা আমাকে জানানোর অনুরোধ করছি। যাতে করে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে দেওয়া যায়। আমার কাছে মনে হয়েছে, এই বইটি অবিশ্বাসী নাস্তিকদের কল্পিত দুর্গকে ভেঙে তাওহিদের পতাকাকে সমুন্নত করার পথে একটি মাইলস্টোন হবে ইনশাআল্লাহ। সংশয়বাদীদের সকল সংশয়কে দূর করে নিশ্চিত বিশ্বাসের মশালকে উড্ডীন করার পথে সহায়ক হবে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁর তাওহিদ ও দ্বীনের পক্ষে লেখকের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করে নিন এবং এই উসিলায় ভুলপথে উদভ্রান্তের মতো ঘুরতে থাকা ভাইবোনদেরকে হিদায়াতের আলোক রশ্মিতে উদ্ভাসিত হওয়ার তাওফিক দান করুন। আমিন।

শাহাদাৎ হুসাইন খান ফয়সাল
দাওরায়ে হাদিস, মাদরাসাতুল হাদিস, ঢাকা
এম.ফিল গবেষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়।

লেখকের কথা

হিরোশিমায় বিস্ফোরিত 'লিটল বয়'-এর মতোই নাস্তিকপাড়া বিধ্বস্ত করে দিয়েছিল *প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ*। একের পর এক তাদের অভিযোগের দাঁতভাঙা উত্তর পেয়েও যখন ১৮০ ডিগ্রিতে বেঁকে বসেছে, তাতে আমরা একটুও অবাক হইনি। একটু মুচকি হেসে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলাম তাদের *ডাবল স্ট্যান্ডার্ড* কত হাস্যকর। *বিশ্বাসের যৌক্তিকতা* সম্পর্কে যে তাদের কোনো ধারণাই নেই, তা বুঝিয়ে আমরা উত্তর পাঠিয়েছিলাম *আরজ আলী সমীপে*। কিন্তু হায়! আরজ আলীর গুঁটি কয়েক ভক্ত বুঝতে পারলেও, কিছুই বুঝতে পারেনি তার অন্ধ ভক্তকুল। *নাস্তিকতার স্বরূপ সন্ধানে* নামলেই বুঝতে পারবেন যে, নাস্তিক মহল ধার ধারে না *সত্য কথন*-এর। *বিশ্বাসের বয়ান* ছাড়তে ছাড়তে আমাদের *শনি সাহেব অসুস্থ* হয়ে গেলেও তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি নিজেদের *উল্টো নির্ণয়* করা। শনি সাহেবের অসুস্থতা নিয়ে কিছুদিন আনন্দে ছিল বটে, কিন্তু সব আনন্দ মাটি করে দিতে ঝড়ের বেগে এলো *অ্যান্টিডোট*। সে কয়দিনেই নাকের পানি চোখের পানির বন্যায় ভেসে গেছে নাস্তিকপাড়া। আরজুর সবগুলো আর্গুমেন্ট তো *আর্গুমেন্টস অব আরজুতে* দেখেছে, তাতে যদি তাদের একটু *লজ্জা* হতো তাহলে অন্তত আর লাফালাফি করত না। অতএব, দেখতেই পেলেন যে, ইসলামের সত্যতা *কষ্টিপাথর* দিয়ে যাচায় করে দেওয়ার পরও তারা অজ্ঞতাপূর্ণ বদ্ধমনা থেকে *বাক্সের বাইরে* এসে মুক্তমনা হতে পারল না। তবুও আমরা দুআ করি, তারা যেন ফিরে আসতে পারে *অন্ধকার থেকে আলোতে*।

এখানে আমি ইসলামের প্রতি নাস্তিক এবং খ্রিষ্টান মিশনারিদের প্রধান কয়েকটি অভিযোগের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছি। মূলত এসব প্রশ্নগুলোর টোপে পড়ে একটা পর্যায়ে আমি নিজেই একজন সংশয়বাদী হয়ে পড়েছিলাম। এক পা দু পা করে যখন অবিশ্বাসের অন্ধকার জগতে প্রবেশ করছিলাম, ঠিক তখনই মহান আল্লাহ তাঁর অশেষ রহমতের বারিধারা ঢেলে প্রশ্নগুলোর উত্তর মিলিয়ে দিয়েছেন।

এ ছাড়াও প্রকাশ্যে অথবা অপ্রকাশ্যে যারা আমার মতো 'এত ধর্মের মধ্যে কোন ধর্ম ঠিক' প্রশ্নের ঘূর্ণিপাকে পড়েছেন, তাদের জন্য ছোট্টো সমাধান হতে পারে বইটি। কোনো সংশয়বাদী যদি একটুখানি সমাধান পেয়ে আল্লাহর পথে ফিরে আসে, সেই জাজাহ যেন আমার নাজাতের ওয়াসিলা হয়।

আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ গার্ডিয়ান পরিবারের প্রতি। সম্মানিত প্রকাশক নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের ভাইয়ের উত্তরোত্তর দিকনির্দেশনা, প্রিয় মাহমুদুল হাসান এবং হাসিবুর রহমান ভাইয়ের আন্তরিক পরিশ্রম, ভালোবাসা আর রাত জাগার মিশ্রণে বইয়ের বর্তমান রূপ। আমার অত্যন্ত প্রিয় এবং ভালোবাসার মানুষ উস্তাদ শাহাদাত ফয়সাল ভাই অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে শারঈ দিকগুলো দেখেছেন, নির্দেশনা দিয়েছেন, নিজে সংযোজন করেছেন। এই মানুষগুলোর প্রতি আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

এ ছাড়াও বইয়ের বিভিন্ন প্রসঙ্গ লিখতে যে সকল ভাইয়ের থেকে সামান্যতম উপকৃত হয়েছি, সেখানে প্রয়োজনীয় স্বীকারোক্তি দিয়েছি। মহান রাব্বুল আলামিন সবাইকে দুনিয়া ও আখিরাতে উত্তম প্রতিদান দিন। বইটিতে যত কল্যাণ সব আল্লাহর পক্ষ থেকে, আর কোনো ভুল-ভ্রান্তি অথবা অকল্যাণ থাকলে তা আমার অযোগ্যতা এবং শয়তানের পক্ষ থেকে।

মুগনিউর রহমান তাবরীজ
facebook.com/TabrizMR
[Mugniur Rahman Tabriz]
Gmail: tabrizmr8@gmail.com

সূচিপত্র

লাশটা কার? কী করেই-বা খুনটা হলো? সবার মুখে একটাই প্রশ্ন। প্রশ্নাতুর চোখে তাকাচ্ছে একজন অন্যজনের দিকে। রাজধানীর এমন অভিজাত এলাকায় কড়া নিরাপত্তার মধ্যেও কীভাবে একটা জলজ্যান্ত মানুষ খুন হতে পারে? আর বাহির থেকেও তো এই লাশ এলাকায় প্রবেশ করানোর কোনো সুযোগ নেই। তাহলে এখানে কীভাবে এলো? কোনোভাবেই কারও মাথায় ঢুকছে না। এমন গভীর রহস্যে ভরা চিন্তার মধ্যে আচমকা একটা উঁচু আওয়াজ শোনা গেল, 'আহারে বদনসিব, এমন যুবক বয়সেই রাস্তায় পড়ে মরতে হলো! এমন একটা তাজা মানুষকে খুন করতে একটাবারের জন্যও বুক কাঁপল না? আরে বাবা কেউ না দেখুক, আল্লাহ তো দেখছে যে, তুই খুন করছিস। কাল কিয়ামতে কী জবাব দিবি? আহ! সবই তকদিরের লিখন!'

গলার আওয়াজ শুনে ধ্যান ভাঙল অ্যান্টনির। এমন একটা ক্রিটিক্যাল মুহূর্তেও ভাগ্যের ওপর এরূপ অদ্ভুত বিশ্বাস দেখে মেজাজটা আর ঠিক রাখতে পারল না সে।

একটা খুনের যথাযথ কারণ অনুসন্ধান না করে, তার বিচারের দায়ভার চাপাচ্ছে আল্লার ওপর! যাকে দেখা যায় না, যার কোনো প্রমাণ নেই, যার অস্তিত্বেও বিশ্বাস করা যায় না, সেই আবার করবে বিচার! আরে ভাই, আল্লা যদি দেখেই থাকে কে খুনটা করেছে, তাহলে তাকে থামাল না কেন? তাকে থামালেই তো টগবগে একটা জীবন বেঁচে যেত। আর খুনিকেও মানব হত্যার মতো অপরাধ করতে হতো না, বিশৃঙ্খলাও সৃষ্টি হতো না। আচ্ছা, না হয় বুঝলাম তাকে থামাল না। কিন্তু এখন তো বলে দিতে পারে কে খুনটা করেছে? সৃষ্টিকর্তা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করাবেন, আবার সেটা করার জন্য ব্যক্তিকে শাস্তিও দেবেন, এটা কোনো লজিক হতে পারে না। আচ্ছা, এই যে লোকটা খুন হলো, তিনি যদি স্রষ্টায় অবিশ্বাসী মুক্তমনা হয়ে থাকে, তাহলে এতক্ষণে কি তার শাস্তি শুরু হয়ে গেছে? আবার যে খুনটা করল, তাকেও জাহান্নামে পুড়তে হবে। এ কেমন কথা?

বুঝলাম, এই লোকটি স্রষ্টায় বিশ্বাস করত না, তাই জাহান্নামে যাবে। কিন্তু খুনি লোকটার কী হবে? তার ভাগ্যে তো স্রষ্টাই লিখে রেখেছেন, সে খুনটা করবে। তাই এখন সে খুন করল, ব্যস। দোষ তো তার না। অথচ সেও নাকি জাহান্নামে পুড়বে! এমন বেমানান নিয়ম কি কখনো ন্যায়বিচার হতে পারে? একজন সৃষ্টিকর্তাই যদি থাকবেন, তাহলে তার সবকিছুতেই কেন ভুল থাকবে? বিচারিক কাঠামোয় ভুল, মানুষের শরীরে ডিজাইনগত ভুল, তার পাঠানো দাবিকৃত কিতাব কুরআনের মধ্যে বিভিন্ন রকমের ভুল! স্রষ্টা কেন ভুল করবে? আসলে সৃষ্টিকর্তার ধারণাটাই ভুল। পুরোটাই মানুষের কাল্পনিক বিলাস মাত্র; যা বিজ্ঞান ও যুক্তি কখনোই সমর্থন করে না। সবচেয়ে বড়ো কথা হলো, সবকিছুর স্রষ্টা আল্লা হলে আল্লার সৃষ্টিকর্তা কে?'

এতক্ষণে এক নিশ্বাসে মনের সমস্ত চাপা ক্ষোভ ঝেড়ে নিল অ্যান্টনি। কিন্তু তা উচ্চারণ না করে মনের ভেতরেই সীমাবদ্ধ রাখায় কেউ আওয়াজ শুনতে পেল না। নিজের আশেপাশে দাঁড়িয়ে থাকা কোনো মানুষকেই মুক্তমনা বলে মনে হলো না। সব মানুষ গোঁয়াড়, ধর্মে বিশ্বাসী। এই গোঁয়াড়গুলোকে যতই দেখছে, ততই মেজাজ খারাপ হচ্ছে তার। উৎসুক মানুষের চিল্লাচিল্লি, পুলিশের গাড়ির সাইরেন, বাঁশির বিরক্তিকর শব্দ, মিডিয়া কর্মীদের ভিড়, সবমিলিয়েই একটা বিরক্তিকর পরিবেশ। ভিড় ঠেলে বের হয়ে একটা রিকশায় চেপে বসল। সোজা বাসায় এসে ধপাস করে শুয়ে পড়ল অ্যান্টনি।

শরীরে জ্বর জ্বর ভাবটা এখনও কাটেনি। তাই গত তিন দিন ধরে অফিসেও যাওয়া হচ্ছে না তার। মাথাটা খুব ঝিম ধরে আছে, শুয়ে চোখ বন্ধ করে ঘুমানোর চেষ্টা করছে। মাথা ঝিম ধরে থাকা যতটা না কষ্টকর, তার চেয়ে বেশি কষ্টকর ঘুমের জন্য অপেক্ষা করা। এই জগতে অপেক্ষার সময়গুলো যেন কাটতেই চায় না।

'আচ্ছা, অপেক্ষার সঙ্গে কি আপেক্ষিকতার কোনো সম্পর্ক আছে?' নিজেকে প্রশ্ন করে অ্যান্টনি।

মুক্তমনা হওয়ার পর থেকে একটা দারুণ সুবিধা হয়েছে, সবকিছুতেই বিজ্ঞান এবং যুক্তি অনায়াসে চলে আসে। আচ্ছা, জগতের কোনো কিছুই তো ধ্রুবক নয়, সব আপেক্ষিক। সময়ও আপেক্ষিক, অপেক্ষার ঘড়ি আইনস্টাইনের থিওরি অব রিলেটিভিটি অর্থাৎ আপেক্ষিকতার সূত্র মেনে ধীরে চলবে, খুব ধীরে।

কিন্তু নাহ! কথাটা ঠিক নয়। সময়, ঘড়ি বা অন্য কোনো কিছুই আইনস্টাইনের থিওরি অব রিলেটিভিটি মেনে চলে না। সবকিছুই আগে থেকেই তার নিজের মতো করে চলে। আইনস্টাইনের থিওরি অব রিলেটিভিটি থেকে আপেক্ষিকতা, ধ্রুবক ইত্যাদি বিষয়ে জানা যায় মাত্র। অন্যদিকে আলোর গতি আপেক্ষিক নয়, ধ্রুবক। বিজ্ঞান যেকোনো সময় যেকোনো চমক দিতে পারে। হয়তো কয়দিন পর জানা যাবে আলোর গতি ধ্রুবক নয়, আপেক্ষিক।

যেমন, ৩০০ বছর ধরে রাজত্ব করেছিল নিউটনের তত্ত্বগুলো। অথচ মাত্র কিছুদিন আগে প্রমাণ হলো, নিউটনের সব তত্ত্ব সব ক্ষেত্রে চলে না। বেচারার মহাকর্ষীয় বলের ক্ষেত্রেও ঘোরতর আপত্তি জানালেন মহামতি আইনস্টাইন।

আবার ১০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে রাজত্ব করেছে আইনস্টাইনের তত্ত্ব। এখন দেখা গেল ব্ল্যাকহোল এবং কোয়ান্টাম মেকানিক্সের ক্ষেত্রে আইনস্টাইনের সূত্র অচল। এভাবেই কিছুদিন পরপর বিজ্ঞান নতুন নতুন চমক দেখাচ্ছে।

সামির ওকাশা নামের ভদ্রলোকের একটা কথা মনে পড়ল। তিনি বলেছিলেন, 'বিজ্ঞান এত দ্রুত বদলায় যে, আপনার পছন্দমতো বিজ্ঞানের যেকোনো শাখাই বিবেচনা করুন না কেন, আপনি নিশ্চিত হবেন, ওই শাখার প্রভাবশালী থিওরি ৫০ বছর আগের থিওরির চেয়ে অনেক ভিন্ন। আর ১০০ বছর আগের চেয়ে ব্যাপক ভিন্ন হবে।'[১]

ব্রিটিশ গণিতবিদ, পদার্থবিদ ও জ্যোতির্বিদ স্যার জেমস জিনস (Sir James Jeans) তার *The New Background of Science* নামক গ্রন্থে বলেছেন,

> We can never say that any theory is final or corresponds to absolute truth, because at any moment new facts may be discovered and compel us to abandon it.
>
> 'আমরা কখনোই কোনো তত্ত্বকে চূড়ান্ত কিংবা নিরঙ্কুশ সত্য বলে ঘোষণা করতে পারি না। কারণ, যেকোনো সময়ে ওই তত্ত্বকে মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট নতুন তথ্য বেরিয়ে আসতে পারে।'[২]

---

১. Philosophy of science, A very Short Introduction- Samir Okasha; p.77 (Oxford University Press, 2002)

২. সেমিনার স্মারক-গ্রন্থ (২০০৩-২০০৫), বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, পৃষ্ঠা : ৪৭-৪৮

জার্মান পদার্থবিদ ম্যাক্স প্লাঙ্ক (Max Plank) বলেছেন,

> We have no right to assume that any physical laws exist or if they have existed upto now, that they will continue to exist in a similar manner in the future.
> 'জগতে কোনো প্রাকৃতিক নিয়ম বা সূত্রের অস্তিত্ব আছে বলে ধরে নেওয়ার কোনো অধিকার আমাদের নেই। বর্তমানে যদি তেমন কোনো সূত্র থেকেও থাকে, তা ভবিষ্যতেও একই রকম থাকবে- এমনটি বলা যায় না।'[৩]

আসলে বৈজ্ঞানিক সত্য কখনোই চূড়ান্ত সত্য নয়; বরং যা আজ সত্য হিসেবে বিবেচিত, হয়তো কাল তা পরিবর্তিত, এমনকি বাতিলও ঘোষিত হতে পারে।[৪]

এসব ভাবতে ভাবতে চোখ লেগে এলো অ্যান্টনির। কিন্তু বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না। মাইকের আল্লাহু আকবার... আল্লাহু আকবার... শব্দে চোখ খুলে গেল। ঘুমাতে না ঘুমাতেই ঘুম ভেঙে গেলে মেজাজ এমনিতেই খিটখিটে হয়ে যায়। আর আজানের শব্দে ঘুম ভেঙে যাওয়াতে মেজাজটা আজ একটু বেশিই খারাপ হয়ে গেল। চোখেমুখে মহা বিরক্তির ছাপ।

'হাতে ক্ষমতা থাকলে আজকেই শব্দদূষণ প্রতিরোধ আইন তৈরি করতাম। যত্তসব! এই মুসলমান চরমপন্থি, জঙ্গি, মোল্লাগুলোর যন্ত্রণায় আর শান্তিতে থাকা যায় না।' অ্যান্টনি বিড়বিড় করে নিজে নিজে কথাগুলো বলে চলছে।

অবশ্য এই বুদ্ধিহীন ক্যাটাগরির মোল্লা টাইপের লোকগুলোর কাছ থেকে মাঝে মাঝে কমেডির চাহিদা পূরণ হয়ে যায়। এটা খারাপ না। এমন চিন্তা করেই ফিক করে হেসে দিলো। আল্লাহকে কি কখনোও দেখেছেন? না দেখলে বিশ্বাস করেন কেন? সবকিছু যদি আল্লাহ ভাগ্যেই লিখে রাখেন, তাহলে পাপ করলে আমাদের দোষ কী? এমন কিছু মৌলিক প্রশ্ন করলেই মোল্লাদের দফারফা। তাদের একটাই উত্তর, 'মরলে বুঝবা বাজান, মরলে বুঝবা' এই বলে পালাবে। হা হা হা...

---

[৩]. সেমিনার স্মারক-গ্রন্থ (২০০৩-২০০৫), বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, পৃষ্ঠা : ৪৭-৪৮

[৪]. National Center for Science Education, https://ncsc.com/node/16774 (বিশ্বাসের যৌক্তিকতা, রাফান আহমেদ, পৃ : ৬৩)

কয়েকদিন আগের কথা–

অফিস থেকে আসার সময় টি স্টলে দাঁড়িয়ে চায়ে চুমুক দিচ্ছিল। ঠিক তার পাশেই দুজন লোকের কথোপকথন তার কানে ভেসে এলো। একজন মোল্লা এক রিকশাওয়ালাকে বোঝাচ্ছে,

'বুঝলা, খালি খাইয়া-দাইয়া আনন্দ-ফূর্তি করার লাইগা আল্লাহ আমগোরে এই দুনিয়ায় পাঠায় নাই। আল্লাহর ইবাদত করতে হইব, সিজদা দিয়ে তার কাছে মাথা নত করতে হইব।'

'তাতে কী লাভ? ইবলিস শয়তান কি ইবাদত কম করছে? তারপরেও সে নাকি দোজখে যাইব। আল্লায় তারে দোজখে দিলে তার এত ইবাদতের কী দাম রইল?,

'অহংকার, দ্যামাগ-গরিমা কইরা ইবলিস তার নিজের জায়গা জাহান্নাম কইরা লইছে। আল্লাহ আদম নবিরে বানাইবার পর, তারে কইছে সিজদা দিতে। কিন্তু ইবলিস নিজেরে সেরা দাবি কইরা আল্লাহর কথা শুনল না। হের লাইগা কাফির হইয়া গেছে। আইচ্ছা, একটা কথা ভাবো তো, এই যে আমি এই মসজিদের মুয়াজ্জিন, এখন মসজিদ কমিটি একজন ইমাম বানাইয়া সবাইরে কইল তারে ইমাম মানতে। সবাই মাইন্যা লইল। কিন্তু আমি যদি কই, এই লোকেরে আমি ইমাম মানি না। কারণ, আমি এই মসজিদে গত দুই বছর ধইরা আছি। এখন আমিই ইমাম হইবার যোগ্য, এই লোক না। তাইলে কি কমিটি আমারে ইমাম বানাইব, নাকি চাকরি নট কইরা দিবো?'

'খুব সোজা। পগারপার, মানে চাকরি খাইয়া আপনারে ক্যাদাই দিবো।'

'হ সহজ কথা, ইবলিস শয়তান নিজেরে বড়ো মনে কইরা গরিমা দেখাইছে, আল্লাহর আদেশ অমান্য করছে, আবার আল্লাহর লগে জেরা করছে। তারপরও সে যদি আল্লাহর কাছে মাফ চাইত, আল্লাহ তারে মাফ কইরা দিত। কিন্তু শয়তান তা করে নাই। আমরাও এই শয়তানের পাল্লায় পইড়া আল্লাহর অনেক অবাধ্য হই। বাজান, আল্লাহর কাছে মাফ চাও, নামাজ-রোজা ধরো। আল্লাহ মাফ কইরা দিবো। আল্লাহ বড়ো দয়ালু।'

'হ, আল্লাহ বড়ো দয়ালু। আল্লাহ দয়ালু হইলে আমরা না খাইয়া থাকি ক্যান? কেউ ট্যাকার বিছানায় ঘুমায় আর কেউ ট্যাকার অভাবে খাইবার পায় না। কন তো হুজুর, এইডা আল্লার কেমন বিচার?'

'আল্লাহর দিকে অভিযোগ দিলো? আহা! আমরা তো আল্লাহর কোনো হক আদায় করবার পারি না। আল্লাহ আমাগোরে হাত দিছে, পাও দিছে, আলো-বাতাস-রিজিক সব দিছে। এইডা মনে পড়ে না? একটু কষ্ট সহ্য করবার পার না? আল্লাহর দিকে অভিযোগ? এইডা পরীক্ষা, আল্লাহ কুরআনে কইছে, "ধন-সম্পদ, ফসল-ফলাদি, পোলা-মাইয়া, অসুখ-বিসুখ দিয়া তার বান্দাগো নানান রকমের পরীক্ষা নিব। যে টিকব হেই পাইব বেহেশত।"[৫] আর হাদিসে আছে, আল্লাহর রসূল কইছে, "গরিব লোক ধনী লোকের ৫০০ বছর আগে বেহেশতে যাইব।"[৬] এই কারণে আল্লাহ কুরআনে কয়, "ওয়া কানাল ইনসানু কাফুরা-মানুষ বড়োই অকৃতজ্ঞ।"[৭] "কুল্লু নাফসিন যা-ইকাতুল মাউত-বেবাক প্রাণী একদিন মরণের স্বাদ গ্রহণ করব।"[৮] মরণ একদিন আইবো বাজান, মরলে বুজবা। আল্লাহ তোমারে বুঝ দান করুক। আমিন।'

বলেই মোল্লা সাহেব বিড়বিড় করতে করতে চলে গেল। মোল্লা সাহেবের চলে যাওয়া দেখে, অ্যান্টনির খুব হাসি পেল। রিক্সাওয়ালার প্রশ্নটা খুব সহজ ছিল। একটু মাথা খাটালেই লজিক্যালি উত্তর দিতে পারত। যেমন : আল্লাহ যদি সবাইরে ধনী বানাত, তাহলে পৃথিবীর ভারসাম্য ঠিক থাকত না। সবাই ধনী হলে ঘরে বসেই সব পেতে চাইত। কাজ কে করত? চাষ কে করত? ফসল আসত কোথা থেকে? খেতো কী? অবশ্য বর্তমানের অর্থনৈতিক মন্দার জন্য মুসলমানদের আল্লাহকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। সারা বিশ্বে চলছে পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা। এই অর্থব্যবস্থায় সামনে পিঁপড়া দেখিয়ে পেছনে হাতি পার করা হয়। বড়োলোক আরও বড়োলোক হবে, ছোটোলোক আরও ছোটো। যতদিন সমাজতন্ত্র সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রতিষ্ঠা করা না যাবে, ততদিন সমস্যা থেকেই যাবে। পুঁজিবাদ হচ্ছে মানুষকে অর্থ দিয়ে বিবেচনা করা, যেখানে মানুষের কোনো মূল্যায়ন হয় না। কেবল সমাজতন্ত্রই পারে সব সমস্যার সমাধান করে মানুষের সব অধিকার নিশ্চিত করে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে।[৯] মনে মনে এভাবেই স্বগতোক্তি করছিল অ্যান্টনি।

---

৫. সূরা বাকারা-০২ : ১৫৫
৬. জামে আত-তিরমিজি, হাদিস নং-২৩৫৩ (হাসান সহিহ)
৭. সূরা বনি ইসরাইল-১৭ : ৬৭
৮. সূরা আলে ইমরান-০৩ : ১৮৫
৯. একজন মার্কসবাদীর চিন্তা

অ্যান্টনি স্রষ্টা, ধর্ম এবং স্রষ্টার পাঠানো কোনো ধর্মগ্রন্থকে বিশ্বাস না করলেও মানুষ হিসেবে যথেষ্ট যুক্তিবাদী। যুক্তি সঠিক হলে সে মেনে নেবে। কিন্তু মোল্লাগোষ্ঠীরা যুক্তির আশপাশ দিয়ে না হেঁটে খালি কাল্পনিক জান্নাত-জাহান্নামের ভয় দেখায়। এটাই তার বিরক্তির কারণ। আবারও সেই ডায়ালগ মনে পড়ে গেল, 'মরলে বুঝবা...' হেসে উঠল সে।

হঠাৎ করেই জানালার ওপর চোখ পড়াতে হকচকিত হয়ে উঠল অ্যান্টনি। জানালার ওপাশ থেকে এক জোড়া চোখ তাঁর দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। সন্ধ্যার আলো আঁধারির মধ্যে এমন অদ্ভুত অবয়ব দেখে কিছুটা জমে গেল এবং ভয়ও পেল। ভূত-প্রেতের প্রতি বিশ্বাস তাঁর একেবারেই নেই। তারপরেও কেন জানি মনে হচ্ছে, বুকের বামপাশটা স্বাভাবিকের তুলনায় একটু বেশিই কাঁপছে।

'কে?' শব্দটি পুরোপুরি বের না হয়ে গলায় আটকে থাকল। অ্যান্টনি বুঝতে পারল আতঙ্কে তার গলা এমন অদ্ভুত আচরণ করছে। তাই গলাটাকে ভালো করে ঝেড়ে আবার ডাকল, 'কে? কে ওখানে?'

'হে... হে... স্যার আমি। স্যার কি ভয় পাইছেন?'

হাসির সঙ্গে দুপাটি দাঁত দেখে লোকটাকে চিনতে দেরি হলো না অ্যান্টনির। সে অফিসের পিয়ন হারু মিয়া। ওর প্রশ্ন করার ধরন দেখে, ঠাশ করে থাপ্পর দিয়ে দুইটা আক্কেল দাঁত ফেলে দিতে ইচ্ছা হলো। কিন্তু নাহ, মেজাজটাকে নিয়ন্ত্রণে নিল। এই লোকটা প্রচণ্ড টাকালোভী। এটা তার স্বভাব নাকি অভাবের কারণে হয়েছে, কে জানে। জ্বর থাকার কারণে গত তিন দিন অফিসে যাওয়া হয়নি। দুদিনের বেশি অফিসে না গেলে আর্জেন্ট জমা পড়া ফাইলগুলো নিয়ে সোজা বাসায় চলে আসে লোকটি। খুবই চিকন বুদ্ধির মানুষ। ফাইলটাকে ভাঁজ করে বড়ো একটা চিঠির খামে ঢুকাবে। এরপর প্রেরকের জায়গায় নিজেই কোনো একটা নাম লিখে দেবে। তারপর খামগুলো সেই পুরোনো আমলের সাইড ব্যাগে ভরে সোজা বাসায় দিয়ে যাবে। বিনিময় মাত্র দুইশত টাকা। দুইশত টাকার জন্য লোকটা কেন যে এত রিস্ক নেয়? ধরা খেলে চাকরি টেকানো মুশকিল। কে জানে, এই দুইশত টাকার আপেক্ষিক গুরুত্ব হয়তো তার কাছে অনেক বেশি।

দরজার দিকে যেতে যেতে কথাগুলো চিন্তা করছিল অ্যান্টনি। লোকটা তাকে একা একা হাসতে দেখেছে। মনে মনে যে কী ভাবছে? যাই ভাবে ভাবুক। তবে ভাবনা পালটে দিতে বেশি কিছু করতে হলো না। দরজা খোলার আগেই বাম কানে একটা ব্লুটুথ ইয়ারফোন লাগিয়ে নিল। আর তাতেই যে কাজ হলো, সেটা দরজা খোলার পর বুঝতে পারল।

'হে হে হে। ও, আপনি ফোনে কথা কইতেছিলেন। কী অবাক কাণ্ড বলেন তো! আমি মনে করেছিলাম, আপনি একা একাই হাসতেছেন।'

'কয়টা ফাইল নিয়ে এসেছ?'

'স্যার, ফাইল তো একটা। কিন্তু এইটা নিয়া আসতেই কাঁধে ব্যাথা ধইরা গেছে। আচ্ছা স্যার, একটা কথা জিগাই?' ফাইলটি অ্যান্টনিকে দিতে দিতে বলল হারু মিয়া।

'হুম বলো। তবে সংক্ষেপে বলো। তুমি তো আবার শুরু করলে কথার শেষ খুঁজে পাও না।'

'সবই আপনাদের দুআ স্যার। এখন বেশি কথা কইতে পারি না, বয়স হইছে। আপনার ভাবি গালি দেয়, সেও আপনার মতো একই কথা কয়। বুঝেন না স্যার, মহিলা মানুষ তো, একটু বেশি কথা কয়। তয় আমি গুরুত্ব দিই না। এইটা তাগো স্বভাব। গুণী লোকে কয়, মরলেও নাকি স্বভাব যায় না। আচ্ছা আপনি কন তো, আমি কি বেশি কথা কই? এই তো সেদিন ডাক্তার কইল...'

'আহা, এই তো তুমি আবার শুরু করে দিলে। কী বলতে চাচ্ছ তাড়াতাড়ি বলো।'

'এই দেখছেন ভুলেই গেছিলাম। আচ্ছা স্যার, এই যে আপনার কানে ইয়ারফোন দিছেন। এল্লাইগা আমি বুঝলাম, আপনি কারও লগে কথা কইতাছেন। তয় বিজ্ঞানীরা যদি এমন কিছু বানায়া ফালায় যে, মোবাইল, ইয়ারফোন ছাড়াই কথা কওন যাইব, তাইলে কি আপনারে পাগল মনে করতাম না?'

'চুপ করো তো! বেশি কথা বলে। তোমার দেখি রোগটা আরও বেড়ে গেছে।' বলেই দুম করে দরজা বন্ধ করে দিলো অ্যান্টনি।

খামটা হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখছে। আজকের খামটা অনেক মোটা। এক মগ কফি হাতে না নিলে ফাইলে হাত দেওয়া যাবে না। ফাইলের আকার বড়ো হলে কফির পর সিগারেট ধরানোর অভ্যাস আছে। স্ত্রী জেনেফা গির্জায় গেছে। নিজে ধর্মে বিশ্বাস না থাকলেও খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী স্ত্রীকে নিয়ে সংসারে কোনো সমস্যা হচ্ছে না। জেনেফার আসতে প্রায় রাত হবে। কী আর করা! এক মগ কফি বানানো আহামরি কোনো কাজ না। বক্সখাটের সঙ্গে হেলান দিয়ে আরাম করে বসে কফিতে চুমুক দিয়েই খামটার ওপর মনোযোগ দিলো অ্যান্টনি।

হারু মিয়ার বহন করা খামের একটা মজার ব্যাপার আছে। তা হলো প্রাপকের নাম ঠিক থাকবে, কিন্তু প্রেরকের জায়গায় এমন একটি নাম দেবে, যার নাম অফিসের লোকজন তো দূরের কথা, কেউ কখনও শুনেছে কিনা সন্দেহ। কৌতূহলবশত আজকেও প্রেরকের নামে চোখ বোলালো। কী আশ্চর্য! অতীব আশ্চর্য! নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না অ্যান্টনি। তার চোখ কি ভুল দেখছে? মাথাটা ঝাঁকিয়ে দুহাত দিয়ে চোখ দুটো ভালোভাবে কচলিয়ে নিল। কিন্তু নাহ, আগে যা দেখেছিল এখনও ঠিক তাই দেখছে।

'বাট হাউ ইট'স পসিবল?' নিজেকে প্রশ্ন করল অ্যান্টনি।

সদা হাস্যোজ্জ্বল আর উচ্ছ্বাসে ভরা একটি মুখ। দেখলেই মায়া লাগে। যেখানেই যায় সবাইকে মাতিয়ে রাখে। ভদ্র ও মেধাবী হওয়ার কারণে সবাই আদর করে। ছোটোকাল থেকে নামাজ-রোজার প্রতি বেশ ঝোঁক, কিন্তু ইন্টারমিডিয়েট-এ ওঠার পর থেকেই ক্রমান্বয়ে মৌলবাদী ধারার দিকে ঝুঁকতে থাকে। একটা পর্যায়ে বিজ্ঞানবিরুদ্ধ আজগুবি সব কথাবার্তা বলা শুরু করে। অ্যান্টনি বুঝতে পারল তার আদরের ছোটো ভাই মুক্তমনা হওয়ার বিপরীতে বদ্ধমনা হয়ে গেছে। বিপদসীমার বাহিরে চলে যাওয়ার আগেই বাবার কাছে নালিশ করে। কিন্তু ফলাফল যা হওয়ার তাই হলো। অ্যান্টনি আগে থেকেই জানত, বাবা ছোটো ভাইয়ের পক্ষ নেবে। তারপরেও বলেছিল, যেন ভবিষ্যতে সে গোঁড়া না হয়ে যায়। মিরাজ অ্যান্টনির ছোটো ভাই। চার বছর আগে ধর্ম, স্রষ্টা নিয়ে কথা বলার এক পর্যায়ে আব্বা-আম্মার সঙ্গে প্রচণ্ড রাগারাগি করে বাড়ি ছাড়ে অ্যান্টনি। তারপর থেকে আর বাড়ি যায়নি।

আজ বহুদিন পর প্রেরকের ঠিকানায় মিরাজের নাম দেখে খানিকটা স্তব্ধ হয়ে গেল অ্যান্টনি। একবার ভাবল, হারু মিয়া তাকে চমকানোর জন্য এমন কাণ্ড করেনি তো? কিন্তু এই নাম তো হারু মিয়ার জানার কথা না! নাকি তাকে চমকে দেওয়ার জন্য কারও থেকে নাম জেনে নিয়েছে। সাতপাঁচ ভাবা বাদ দিয়ে তড়িঘড়ি করে খাম থেকে ফাইল বের করতেই কপালে ভাঁজ পড়ে গেল। আরে! এটা তো একটা চিঠি। কিন্তু সাইজ দেখে মনে হচ্ছে আস্ত একটা পাণ্ডুলিপি।

চিঠিটা যে মিরাজের হাতে লেখা, তা চিনতে ভুল হলো না। বহুদিন পর হৃদয়পটে মিরাজের সরল মুখখানা ভেসে উঠল। অনেক দিন হয়ে গেছে খোঁজখবর নেয়নি। মিরাজ এমন একটা কাজ করে চমকে দেবে, সে কল্পনাও করেনি। অবশ্য মিরাজ ছোটো থেকেই এমন। মাঝেমধ্যেই অদ্ভুত কিছু একটা করে সবাইকে চমকে দিত। কী লিখেছে জানার কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে চিঠি পড়ায় মন দিলো অ্যান্টনি। পাশে রাখা গরম কফির মগটা নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ল কিছুক্ষণের জন্য।

কারা বেশি সুখী, বিশ্বাসীরা নাকি অবিশ্বাসীরা

ভাইয়া,

কেমন আছ তুমি? আমাদেরকে ছেড়ে খুব সুখেই আছ নিশ্চয়ই, থাকারই তো কথা। সুখে থাকার জন্যই তো তুমি আজ তোমার মতো করে অনেক দূরে। যখন একসঙ্গে ছিলাম, তখন তোমার সুখে থাকার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল আমাদের বিশ্বাস। আমাদের আল্লাহতে বিশ্বাস, আস্থা, ভালোবাসা, ইবাদত, আল্লাহর বাণী আল-কুরআন, প্রাণপ্রিয় রাসূলুল্লাহ মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রতি ছিল তোমার যত বিদ্বেষ। ইসলামের বন্ধনে থাকলে নিজের মতো করে যাচ্ছেতাই করতে পার না। সবকিছুর জন্য আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে, এই বিশ্বাস তোমার অনৈতিক স্বাধীনতায় বাধ সাধে। আর এটাই হলো তোমার আল্লাহতে অবিশ্বাসের মূল কারণ। কিন্তু ভাইয়া, আমরা তো তা করতে পারি না। কারণ, আমরা পরকালের জীবনে বিশ্বাসী এবং আল্লাহর মনোনীত জীবনব্যবস্থা ইসলাম মেনে চলি। যার ফলে তুমি আমাদের সঙ্গে সুখে থাকতে পারছিলে না। এখন নিশ্চয় তুমি তোমার মতো করেই সুখে আছ!

তোমাকে এসব বলে কী লাভ? কারণ, তুমি তো মনে করো পরকাল বলতে কিছু নেই। কোনো ভালো বা মন্দ কাজের জন্য মৃত্যুর পর পুরস্কার বা শাস্তি পাবে বলে তুমি মনে করো না। এখন যা ইচ্ছা তাই করতে পারছ। কয়েকটি রাষ্ট্রীয় নীতি ছাড়া তোমার স্বাধীনতায় বাধা দেওয়ার মতো কেউ নেই। তা ছাড়া এখনকার সময়ে টাকা দিয়ে নীতিহীন কাজকে রীতিশীল করে সুশীল হওয়া খুব সহজ।

আর সুখ? হ্যাঁ, এই সুখ শব্দটাই তোমার কাছে অতি প্রিয়। এই সুখের জন্যই তুমি সকল বন্ধন, মমতা, সম্পর্ককেও ছেদ করতে পার। আচ্ছা, একটা কথা সত্যি করে বলো তো, কারা বেশি সুখী? তোমরা অবিশ্বাসীরা নাকি আমরা বিশ্বাসীরা?'

প্রশ্নটা পড়ে অবাক হলো অ্যান্টনি। তার সেই ছোটো ভাইটি আর ছোটো নেই; অনেক পাকা কথা শিখে গেছে। অবশ্য মৌলবাদী ধারায় এসব নতুন কিছু নয়। যারা ছোটো ছোটো বাচ্চাদের বুকে বোমা বেঁধে আত্মঘাতী হওয়া শেখায়, তাদের দ্বারা এমন পাকা পাকা কথা শেখানো কোনো ব্যাপার না।[১০]

বাড়ি থেকে চলে আসার সেই দিনটির কথা খুব করে মনে পড়ে গেলো অ্যান্টনির। মা বসে কাঁদছিলেন। বাবার রাগ তখনও থামেনি। অ্যান্টনিকে আটকাবেন নাকি চলে যেতে বলবেন; কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলেন না। উৎসুক মানুষের সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়ছিল। বাবা এক পর্যায়ে বলেই বসলেন,

'তুই কী করবি, সেই সিদ্ধান্ত তোকেই নিতে হবে। তুই যদি এমন উদ্ভট চিন্তাগুলোকে সুখ বলে মনে করে থাকিস, তাহলে এটা হবে তোর জীবনে সবচেয়ে বড়ো ভুল এবং অসুখের কারণ। আর মনে রাখিস, একদিন তোকে পস্তাতে হবে।'

'পস্তাতে হবে? আমার যুক্তিনির্ভর কথাগুলোকে তুমি বলছ উদ্ভট? বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত বিষয়গুলোকে তুমি বলছ উদ্ভট? তাহলে সত্যি কোনটা? তোমাদের মুহাম্মদের কোরান? যা কিনা বাইবেল থেকে নকল করে লেখা হয়েছে। আর যত্তসব কাল্পনিক তত্ত্ব এবং ভুলে ভরা।'

'তুই কি কুরআন কখনো পড়েছিস? তুই তো আরবিই পড়তে পারিস না। তাহলে ক্যামনে বুঝলি কুরআনে ভুল আছে?' নিজের ক্ষোভ নিয়ন্ত্রণ করে গুরুগম্ভীর গলায় বললেন অ্যান্টনির বাবা মহসিন মিয়া।

'ভুল ধরতে আবার কোরান পড়তে হয় নাকি? অনেক বড়ো বড়ো মুক্তমনা দার্শনিকদের কোরান সম্পর্কে রিভিউ পড়েছি। বিখ্যাত সব আর্টিকেল পড়েছি। এটাই যথেষ্ট।'

---

১০. এটি অবিশ্বাসী ও ইসলাম বিদ্বেষীদের অভিযোগ। ইসলাম আত্মহত্যাকে হারাম করেছে। কোনো মুসলিম নিজেকে দিয়ে বা অন্যকে দিয়ে এমন কাজ করাতে পারে না। (সম্পাদক)

'তোকে তো সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে পাঠিয়েছিলাম জ্ঞানী হওয়ার জন্য। অথচ হয়ে গেছিস জ্ঞানপাপী, অমানুষ।' নিজের আফসোসটাকে আর লুকিয়ে রাখতে পারলেন না মহসিন মিয়া।

'আমি অমানুষ হলে সে দায়টাও তোমার আল্লার। সেই তো আমার ভাগ্যে এসব লিখে রেখেছে। তোমরাই তো বলো, ভাগ্যের বাহিরে কিছু হয় না, আল্লা সবকিছু তাকদিরে লিখে রেখেছেন।'

পাশে দাঁড়িয়ে থাকা বয়সের ভারে নুয়ে পড়া অ্যান্টনির দাদি সালেহা বেগম নিজের মেজাজটাকে ঠিক রাখতে না পেরে কম্পিত গলায় বললেন, 'মহসিন রে, তোর পোলা তো দেখছি ফেরাউন হইয়া গেছে। ওর কি মরণের ভয়ডর নাই? এই শিমারের কি পরকালের ভয় নাই?'

'আবার সেই পরকাল? কে দেখেছে তোমাদের সেই পরকাল? না দেখা জিনিসকে শুধু মূর্খরাই বিশ্বাস করতে পারে।'

'ভারি শিক্ষিত হইয়া গেছে। ময়-মুরুব্বি কিছুই মানে না। এই আমি কয়ে দিলাম, এই পোলার কপালে কিন্তু সুখ জুটবে না, তুই দেখে নিস।' চাপা কণ্ঠে বললেও রাবেয়া চাচির কথায় ক্ষোভের মিশ্রণ থাকায় তা অ্যান্টনির কান পর্যন্ত পৌছে গেল।

এই কথায় যেন তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল অ্যান্টনি।

'সুখ? যেখানে কোনো মুক্তচিন্তা এবং যুক্তির স্থান নেই, যেখানে কুসংস্কার ও উদ্ভট কল্পকাহিনি মানতে বাধ্য করা হয়, সেখানে কোনো মানুষ সুখী হতে পারে না। এখানে থাকলে আমি পাগল হয়ে যাব। তোমরা থাকো তোমাদের আল্লা, রসূল, কোরান, ধর্ম নিয়ে। আমি গেলাম।'

চলে আসার সময় বাবার সেই অগ্নিশর্মা চেহারাটা তাকে যেন আরও ক্ষেপিয়ে তুলল। বারান্দার এক কোণে বসা মায়ের অঝোরে বর্ষিত অশ্রুর শব্দহীন চিৎকারটা একটিবারের জন্যও শুনতে পেল না। ঠিক মায়ের পাশে বসে মিরাজ কঞ্চি দিয়ে মাটিতে কী যেন আঁকছিল। সম্ভবত তার মনের ক্ষোভগুলো মাটির বুক চিরে প্রকাশ করার চেষ্টা করছিল। অ্যান্টনি বাড়ির সীমানা পার হতেই পেছন থেকে ফারিহার কান্নাভেজা কণ্ঠ ভেসে এলো 'ভাইয়া...'

...কিছুক্ষণের জন্য যেন চার বছর আগে ফিরে গিয়েছিল অ্যান্টনি। স্মৃতিকাতরতা সুখের নাকি দুঃখের সঞ্চার করে, এখনো সে ঠাহর করতে পারে না। অভ্যাসবশত কফির কাপে একটা চুমুক দিয়েই থু করে ফেলে দিলো।

'শালার কফি, এত তাড়াতাড়ি ঠান্ডা হয়ে গেল?' বলেই পাশের টেবিলে রাখা গ্যাস লাইটার দিয়ে সিগারেট ধরিয়ে জোরে একটা টান মেরে ধোঁয়া বের করে দিলো। জানালা দিয়ে আসা এক পশলা বাতাস যেন নিজ দায়িত্বে দ্রুত সেরে দিলো ব্যাপনের কাজটা। ফের চিঠি পড়ায় মন দিলো অ্যান্টনি।

'...আচ্ছা ভাইয়া, উত্তরটা আমিই দিই। সমস্যা নেই, তোমার বিজ্ঞানের বিপরীতে যাব না। তুমি তো প্রমাণ না দেখে কিছুই বিশ্বাস করতে চাও না। তাই অন্য দিকে না গিয়ে সরাসরি প্রমাণে যেতে চাই। দেখো তোমার বিজ্ঞান কী বলে।

কার্ল গুস্টাভ ইয়ং তাঁর বিখ্যাত বই *The Modern Man in Search of Soul*-এ দীর্ঘ আলোচনা করে দেখিয়েছেন, যারা স্রষ্টায় বিশ্বাসী, তারা অবিশ্বাসী লোকদের চেয়ে অনেক বেশি সুখী এবং বিশ্বাসীরা থাকে অনেক বেশি কৃতজ্ঞ।[১১]

সাম্প্রতিক কিছু গবেষণা দেখো... ২০০৩ সালে ২৬১৬ জন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের ওপরে গবেষণা করে দেখা গেছে, যারা অপেক্ষাকৃত বেশি কৃতজ্ঞ, তাদের মধ্যে মানসিক অবসাদ, দুশ্চিন্তা, অমূলক ভয়-ভীতি, অতিরিক্ত খাদ্যাভ্যাস এবং মদ, সিগারেট ও ড্রাগের প্রতি আসক্তির ঝুঁকি অনেক কম।[১২]

২০০৯ সালে ৪০১ জন মানুষের ওপর গবেষণা করা হয়, যাদের ৪০%-এর জটিল ঘুমের সমস্যা (ক্লিনিকাল স্লিপ ডিসঅর্ডার) আছে। তাদের মধ্যে যারা সবচেয়ে বেশি কৃতজ্ঞ, তারা একনাগাড়ে বেশি ঘুমাতে পারে। তাদের ঘুম নিয়মিত হয়। রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ে এবং দিনের বেলা ক্লান্তি, অবসাদ কম থাকে।[১৩]

হফস্ট্রা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিদ্যার সহকারী অধ্যাপক ড. জেফ্রি ফ্রহ ১৪-১৯ বছর বয়সী ১০৩৫ জন শিক্ষার্থীর ওপর গবেষণা করে দেখেছেন, যারা বেশি কৃতজ্ঞতা দেখায়, তাদের পরীক্ষার ফলাফল অপেক্ষাকৃত ভালো। যারা সামাজিকভাবে বেশি মেলামেশা করে, তারা হিংসা ও মানসিক অবসাদে কম ভোগে।[১৪]

---

১১. The Modern Man in Search of Soul by Freud & Jung, ch: The stage of life, P.127-142
১২. Positive psychology in practice. Linley, P. A., & Joseph, S. (2004).
১৩. Gratitude influences sleep through the mechanism of pre-sleep cognitions, Journal of Psychosomatic Research, 66(1), 43-48, by Wood, A. M., Joseph, S., Lloyd, J., & Atkins, S. (2009).
১৪. Thank You. No, Thank You. (n.d.). Retrieved January 28, 2016

এবার আমরা কেন বেশি সুখী তা বলি-
এক যুগেরও বেশি সময় ধরে চালানো গবেষণায় দেখা গেছে, কৃতজ্ঞ প্রাপ্তবয়স্কদের কাজের আগ্রহ ও শক্তি বেশি থাকে; তাদের সামাজিক সম্পর্ক বেশি হয়। তারা অকৃতজ্ঞদের চেয়ে অনেক বেশি সুখী। তারা অপেক্ষাকৃত কম হতাশা, হিংসা, লোভ বা অ্যালকোহলে আসক্ত হয়। তারা অপেক্ষাকৃত বেশি আয় করে, ভালোভাবে ঘুমায়, নিয়মিত ব্যায়াম করে, এমনকি ভাইরাসজনিত অসুখের ক্ষেত্রে তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি থাকে।[১৫]

আমরা কি আমাদের স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞ হব না? যে তার নিজের স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞ হয় না, সে কীভাবে অন্যের প্রতি কৃতজ্ঞ হতে পারে? সত্যিই আমরা বিশ্বাসীরা স্রষ্টার প্রতি অনেক কৃতজ্ঞ এবং তোমাদের থেকে অনেক বেশি সুখী আলহামদুলিল্লাহ।

আচ্ছা, তুমি আমাকে বেশ কয়েকটি প্রশ্ন করেছিলে। তখন কোনোটিরই উত্তর দিতে পারিনি। তুমি বলেছিলে, "মানুষ যদি এই প্রশ্নগুলো নিয়ে ভাবত তাহলে অন্ধ ধার্মিক হতো না, সবাই মুক্তমনা হতো। মোল্লাদের কথাবার্তা ছাড়, মুক্তচিন্তা চর্চা কর।"

তোমার কথায় আমি বেশ কয়েকদিন ঘুমাতেই পারিনি। সর্বক্ষণ তোমার প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজেছি। আলহামদুলিল্লাহ, পেয়েও গেছি। এখন আমি একজন মুক্তমনা, বিশ্বাসী এবং বিজ্ঞান দ্বারা প্রমাণিত সত্য ধর্মকেই মেনে চলছি; বিজ্ঞান ও যুক্তি দিয়েই খুঁজে পেয়েছি স্রষ্টাকে। স্রষ্টার পাঠানো আসমানি কিতাব, যাকে তুমি হাজার বছর আগের মূর্খ লোকের "আজগুবি কথা ও সেকেলে" বলো, সেই কিতাবের সত্যতাও পেয়েছি এই বিজ্ঞানের মাধ্যমে।

তুমি বলেছিলে, "মোল্লারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের কী বোঝে? যারা জ্ঞান-বিজ্ঞান বোঝে, তারা কখনই স্রষ্টায় বিশ্বাস করতে পারে না।"

কিন্তু কই, বিজ্ঞান তো স্রষ্টার অস্তিত্বকে অস্বীকার করে না! বিজ্ঞান শুধু একাধিক স্রষ্টার অস্তিত্বকে অস্বীকার করে। বিজ্ঞান সুস্পষ্টভাবে এটাই প্রমাণ করে, অবশ্যই সব সৃষ্টির একজন সৃষ্টিকর্তা আছে। তুমি বলবে, আমি বিজ্ঞানের কী-ই-বা বুঝি,

---

[১৫]. Thank You. No, Thank You. (n.d.). Retrieved January 28, 2016 (১২-১৫, ৬০) পড়ো, ওমর আল জাবির।

তাই তো? আমার কথা বলছি না; বরং নিউটন, আইনস্টাইন, পল ডিরাক, শ্রোডিঞ্জার, লুই পাস্তুর-এর মতো জগদ্‌বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের কথা বলছি, যারা সকলেই স্রষ্টায় বিশ্বাসী ছিলেন।

সব জেনেও যদি তুমি না জানার ভান করে থাক, সত্য উপস্থিত হওয়ার পরেও যদি চোখ বন্ধ করে তা উপেক্ষা করো, তাহলে ভাইয়া প্লিজ, এখন থেকেই ক্ষান্ত দাও। আর যদি তোমার মন সত্যকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকে, তাহলে চিঠির বাকি অংশ মন দিয়ে পড়তে থাক। তবে অনুরোধ একটাই, নিরপেক্ষ মনে চিন্তা করো। আমাদের দুজনের কথা ভুল হতে পারে, কিন্তু সত্য শুধুই সত্য। সত্য না ভুল,.না মিথ্যা। লেটস গো অ্যাহেড।’

যা দেখি না, তা বিশ্বাস করি না

ভাইয়া, তুমি আমাকে প্রথম কি প্রশ্ন করেছিলে মনে আছে? বলেছিলে, 'তুই কি কখনো তোর স্রষ্টাকে দেখেছিস?'

বলেছিলাম, 'না।'

আবারও বলেছিলে, 'আমিও দেখিনি, আর এ জন্যই বিশ্বাস করি না। Unseen is Nothing, (যা দেখি না, তা বিশ্বাস করি না)। কিন্তু তুই বিশ্বাস করিস কেন?'

তখন উত্তর দিতে পারিনি। কারণ, সেদিনই প্রথম এই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছিলাম। আজ বলছি, শোনো।

আমরা দুভাবে কথা বলতে পারি।

প্রথমত, যা দেখি না, তা বিশ্বাস করি না। তার মানে যা দেখি, তা বিশ্বাস করি। দ্বিতীয়ত, আমাদের দেখার পরিসীমা আসলে কতটুকু? অর্থাৎ আমরা কতটুকু দেখতে পাই?

প্রথম বিষয়টা একটু যাচাই করে দেখি। তুমি প্রত্যক্ষভাবে বললে, যা দেখো না, তা বিশ্বাস করো না। তার মানে, পরোক্ষভাবে যা দেখো, তা বিশ্বাস করো। এখন এই ছবিটার দিকে একটু তাকাও।
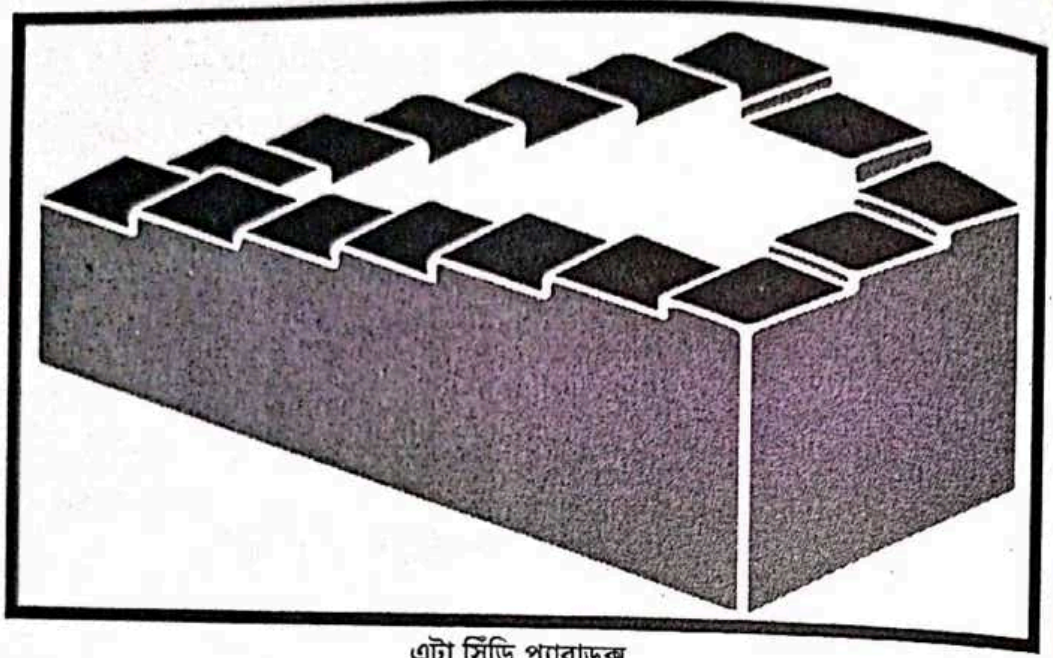
এটা সিঁড়ি প্যারাডক্স

একটি সিঁড়ি দেখতে পাচ্ছ। এই সিঁড়ির এক প্রান্ত থেকে তুমি ওপরের দিকে হাঁটা শুরু করলে আরেক প্রান্ত সিঁড়ির নিচের দিকে নেমে যাবে। আবার নিচের দিকে গেলে আরেক প্রান্ত ওপরের দিকে উঠে যাবে। এভাবে অনন্তকাল চলতে থাকবে, কিন্তু সিঁড়ি শেষ হবে না। আসলেই কি সিঁড়ি শেষ হবে না? একটু পর উত্তর দিচ্ছি।

এবার তুমি হরিণের মাথার দিকে ভালো করে খেয়াল করো।
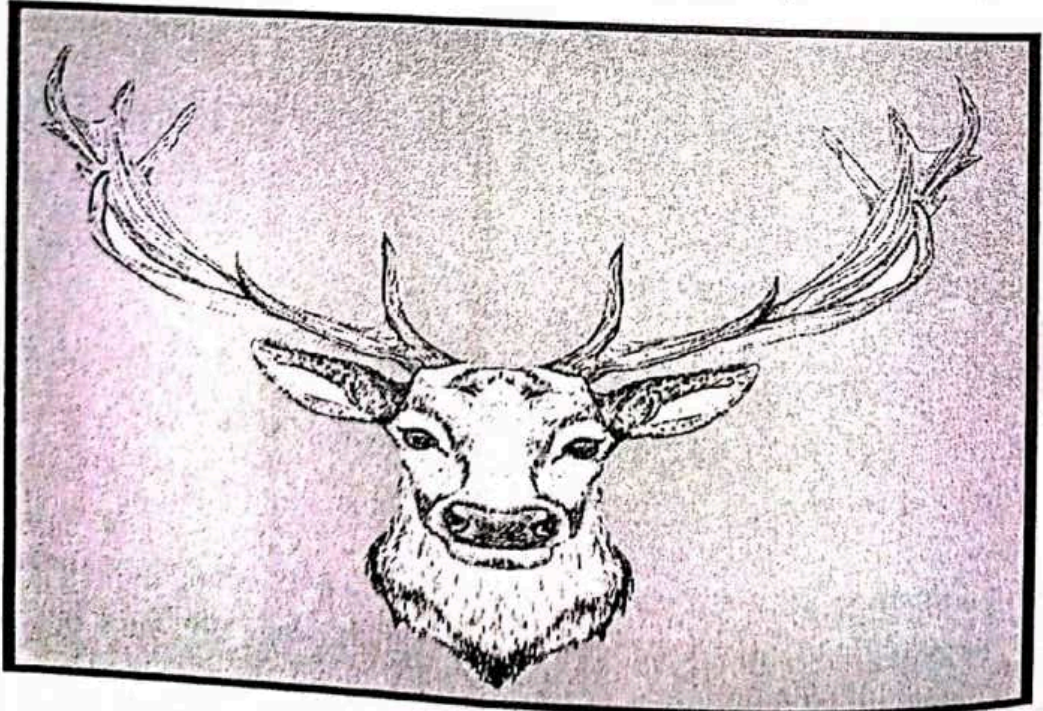
হরিণের মাথা

কী দেখতে পাচ্ছ? হরিণটি তোমার দিকে তাকিয়ে আছে; তাই না? হরিণটির দিকে যেকোনো অ্যাঙ্গেল থেকে তাকাও না কেন, মনে হবে সে তোমার দিকে তাকিয়ে আছে। এই ঘটনা ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে তোলা যেকোনো ছবির জন্যই প্রযোজ্য। কিন্তু বাস্তবে কি এমন কোনো স্ট্যান্ডার্ড মডেল সম্ভব, যাকে যেকোনো অ্যাঙ্গেল থেকে দেখো না কেন, তোমার দিকে সে একই ভিউতে থাকবে? না, সম্ভব নয়। কিন্তু আমরা তো ছবিতে সেই ভিউ দেখতে পাচ্ছি, তাহলে বাস্তবে কেন সম্ভব নয়? উত্তর দিতে পারবে?

উত্তরটা খুব সহজ। তোমার নিশ্চয় জানাই আছে, কোনো কিছুকে বাস্তবে পরিণত করার জন্য তিনটি মাত্রার প্রয়োজন হয়। দৈর্ঘ, প্রস্থ ও উচ্চতা। তুমি, আমি, আমাদের আশেপাশে দৃশ্যমান যা কিছু দেখতে পাই, তা সবই ত্রিমাত্রিক (থ্রি-ডি)। আমরা ত্রিমাত্রিক জগতের (Three Dimention) প্রাণী। কিন্তু কাগজে যে ছবিগুলো দেখতে পাও, সেগুলো দ্বিমাত্রিক। তার মানে কাগজের ছবির মাত্রা দুইটি। দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ আছে, কিন্তু উচ্চতা নেই। যার ফলে কাগজের দ্বিমাত্রিক ছবির দিকে তাকালে যেকোনো অ্যাঙ্গেল থেকে হরিণটি আমাদের দিকেই তাকিয়ে আছে বলে মনে হলেও বাস্তবের ত্রিমাত্রিক জগতে তা সম্ভব নয়। আবার বাস্তবে এমন একটি প্যারাডক্সিক্যাল সিঁড়িও কোনোভাবেই তৈরি করা সম্ভব নয়। এমন আরও বহু উদাহরণ ও যুক্তি দেওয়া যায়।

তাহলে এটা স্পষ্ট হলো, ত্রিমাত্রার নিচে আমরা অনেক কিছু দেখতে পাই, যার আদত অস্তিত্ব নেই; দৃষ্টিভ্রম। আবার ত্রিমাত্রার বাহিরে এমন অনেক কিছু আছে, যা অস্তিত্বশীল কিন্তু দেখতে পাওয়া যায় না। মূলকথা হলো, বিজ্ঞান এটাই দাবি করে যে, আমরা অনেক কিছু দেখতে পাই, কিন্তু সেসব আসলে বাস্তবে নেই। আবার পরোক্ষভাবে, অনেক কিছুই বাস্তবে আছে, কিন্তু সেসব আমরা দেখতে পাই না।

আরও পরিষ্কার করার জন্য তোমাকে দ্বিতীয় ব্যাপারটা বলতে চাই। তা হলো, আমাদের দেখার ক্ষমতা আসলে কতটুকু? আসলে যখনই আমরা দৃশ্যমান এবং অদৃশ্যমান বস্তুকে ত্রিমাত্রিক জগতের মধ্যে সীমাবদ্ধ করতে চাই, তখনই সমস্যায় পড়ে যাই। অথচ ত্রিমাত্রার বাহিরে আরও আটটি মাত্রা বিদ্যামান আছে, যা আমাদের উপলব্ধি ক্ষমতার বাহিরে।

মানুষের ক্ষমতার একটা বড়ো সীমাবদ্ধতা আবিষ্কার করেন জার্মান পদার্থবিদ হাইজেনবার্গ। এটি তাঁর বিখ্যাত 'অনিশ্চয়তা নীতি' নামে পরিচিত। এই নীতির মূলকথা হলো, কোনো একটি গতিশীল কণার (ইলেকট্রনের) অবস্থান ও গতিবেগ

একইসঙ্গে নির্ভুলভাবে মাপা সম্ভব নয়। অর্থাৎ, 'গতি' নির্ভুলভাবে মাপতে গেলে 'অবস্থান' পরিমাপে ত্রুটি থাকবে, আবার 'অবস্থান' নির্ভুলভাবে মাপতে গেলে 'গতি' পরিমাপে ত্রুটি থাকবে।

তিনি এই বিষয়টিকে গাণিতিকভাবে এক ধরনের ম্যাট্রিক্সের মাধ্যমে প্রকাশ এবং সূত্রবদ্ধ করেছিলেন। তাঁর এই আবিষ্কার পদার্থবিদ্যার যুগান্তকারী পালাবদল ঘটিয়ে কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিল। যা তাঁকে ১৯৩২ সালে নোবেল পুরস্কার এনে দিয়েছিল।

দৈনন্দিন জীবন থেকে এ ধরনের অনেক ঘটনা দেখানো যায়। অত্যন্ত সহজবোধ্য উদাহরণ হলো পরিপ্রেক্ষিত (Perspective)। ছবি আঁকতে গিয়েই এই ধারণাটিকে বেশি ব্যবহার করেছে এবং বহু আগে থেকেই এটি মানুষের জানা ছিল। পরিপ্রেক্ষিতের প্রথম সার্থক জ্যামিতিক আলোচনাও করেছিলেন চিরচেনা চিত্রকর লিওনার্দো দ্যা ভিঞ্চি। এই ধারণাটির বিশ্লেষণ পুরোপুরি জ্যামিতিনির্ভর। এর সঙ্গে পরিচিত না হলে কোনো ছবি আঁকাই সম্ভব নয়।

এর সহজ বর্ণনা হলো, তুমি কোনো একটা জিনিসকে স্পষ্টভাবে দেখতে চাইলে, তার পুরোটাকে দেখতে পারবে না, আবার তার পুরোটাকে দেখতে চাইলে, তাকে স্পষ্টভাবে দেখতে পারবে না। বুঝতে পারছ না? আচ্ছা, একটা উদাহরণ দিই। তাহলে বুঝতে সহজ হবে।

যদি তুমি একটি অট্টালিকাকে পূর্ণাঙ্গ দেখতে চাও, তাহলে অট্টালিকা থেকে অনেক দূরে সরে যেতে হবে। আর যখনই অট্টালিকা থেকে দূরে চলে যাবে, তখন তার খুঁটিনাটি বিষয়গুলো দেখতে পাবে না। আবার যদি তার কক্ষ, দরজা, জানালা, চিত্রকর্ম, কারুকাজ ইত্যাদি খুঁটিনাটি জিনিসগুলো দেখতে চাও, তাহলে তোমাকে অট্টালিকার খুব কাছাকাছি যেতে হবে। ফলে তোমার পক্ষে আর সমগ্র অট্টালিকাটি দেখা সম্ভব হবে না।

এই কারণে ছবিতে দূরের কোনো জিনিসকে ছোটো এবং কাছের জিনিসকে বড়ো করে দেখানো হয়। এক্ষেত্রে একটি চমৎকার বিষয় হলো, অট্টালিকাটি যত বড়ো হবে, তাকে পূর্ণাঙ্গভাবে দেখতে হলে ঠিক তত দূরে যেতে হবে। কোনো একটা অংশকে দেখতে হলে সব অট্টালিকার ক্ষেত্রে সমান দূরত্বই যথেষ্ট, অথচ পূর্ণাঙ্গকে দেখাই যত সমস্যা।[১৬]

---

১৬. সৃষ্টিকর্তা সত্যিই আছেন!-এস.এম.জাকির হুসাইন।

এই যদি হয় বাস্তবতা, তাহলে এই সৃষ্টিজগৎকে পূর্ণাঙ্গভাবে দেখতে গেলে কত দূরে যেতে হবে? কিন্তু আমরা কি সৃষ্টিজগৎ থেকে আদৌ বাইরে যেতে পারি?

এই মহাবিশ্ব মাত্র ৫% দৃশ্যমান বস্তু (ম্যাটার) দিয়ে গঠিত, বাকি ৯৫% অদৃশ্য (২৭% ডার্ক ম্যাটার, ৬৮% ডার্ক এনার্জি)। আচ্ছা ভাইয়া, তুমি একবার চিন্তা করে দেখো, আমাদের আশেপাশের সকল বস্তুসহ কোটি কোটি গ্রহ-নক্ষত্র সব এই ৫% দৃশ্যমান বস্তুর অন্তর্ভুক্ত। যার ফলে এসব দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু বাকি ৯৫% গুপ্ত পদার্থ আমাদের পক্ষে দেখা বা অনুভব করা সম্ভব নয়। এই অদৃশ্য বস্তু বা শক্তি এখনও পর্যন্ত মানুষের আবিষ্কৃত কোনো যন্ত্র দিয়ে দেখা সম্ভব হয়নি।[১৭]

কোয়ান্টাম মেকানিক্সের মাধ্যমে এই তথ্য আমরা জানতে পারলাম। আমাদের আশেপাশে এসবের অস্তিত্ব আছে জানার পরও শুধু ত্রিমাত্রার বাহিরে হওয়ার কারণে তা দেখতে পারি না। দৃশ্যমান এই ৫% পদার্থের অতি ক্ষুদ্র একটি বিন্দুতে বসবাস করে আমাদের তৈরি কোনো কিছুকেই একসঙ্গে পুরোটা পর্যবেক্ষণ করতে পারি না। তাহলে আমরা কীভাবে এই মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তাকে পর্যবেক্ষণ করতে পারি, যিনি দৃশ্যমান-অদৃশ্যমান সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি অসীম মাত্রার।

তোমার একটা কথা শুনতে শুনতে আমার কান ঝালাপালা হয়ে গেছে, তা হলো বিজ্ঞান। তুমি কথায় কথায় বিজ্ঞান বিজ্ঞান করো। আসলে তোমরা যা চিন্তা করো, শুধু তাকেই বিজ্ঞান মনে করো। এর বাহিরে অন্য কিছুকে বিজ্ঞান জ্ঞান করতে চাও না। মনে হয় বিজ্ঞান তোমাদের নিজস্ব সম্পত্তি। এটা আসলে তোমাদের চিন্তার দৈন্যতা ছাড়া কিছুই না। তবে ভাইয়া এতটুকু মনে রেখো, বিজ্ঞান শুধু তোমাদের নয়, আমাদেরও।

কাজের কথায় আসি। আমরা আমাদের আয়ত্তের সবকিছু বিজ্ঞান দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারব না। আর ব্যাখ্যা করতে না পারলেই তা ভুল কিংবা বাতিল হয়ে যাবে, এই ধারণাটাই ভুল। আমাদের জাফর ইকবাল স্যারও এই কথাটা বলেছেন। তিনি বলেন, যারা বিজ্ঞান চর্চা করে তারা ধরেই নিয়েছে, আমরা যখন বিজ্ঞান দিয়ে পুরো প্রকৃতিটাকে বুঝে ফেলব, তখন সব সময় সবকিছু সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারব। যদি কখনো দেখি কোনো একটা কিছু ব্যাখ্যা

---

১৭. http://science.nasa.gov/astrophysics/focus-areas/what-is-dark-energy

করতে পারছি না, তখন বুঝতে হবে এর পেছনের বিজ্ঞানটা তখনো জানা হয়নি। যখন জানা হবে, তখন সেটা চমৎকারভাবে ব্যাখ্যা করতে পারব। এককথায় বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা বা ভবিষ্যদ্বাণী সব সময়েই নিখুঁত এবং সুনিশ্চিত। কোয়ান্টাম মেকানিক্স বিজ্ঞানের এই ধারণাটাকে পুরোপুরি পালটে দিয়েছে। বিজ্ঞানীরা সবিস্ময়ে আবিষ্কার করেছেন, প্রকৃতি আসলে কখনোই সবকিছু জানতে দেবে না। সে তার ভেতরের কিছু কিছু জিনিস মানুষের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখে। মানুষ কখনোই সেটা জানতে পারবে না। সবচেয়ে চমকপ্রদ ব্যাপার হচ্ছে, এটা কিন্তু বিজ্ঞানের অক্ষমতা বা অসম্পূর্ণতা নয়; এটাই হচ্ছে বিজ্ঞান। বিজ্ঞানীরা একটা পর্যায়ে গিয়ে কখনোই আর জোর গলায় বলবে না 'হবে', তারা মাথা নেড়ে বলবে, 'হতে পারে'।[১৮]

এই সহজ কথাগুলো না বোঝার কিছু নেই। যদি বুঝে থাকো, তাহলে এবার তুমিই বলো; যা দেখো তা কি সবই সত্য? আবার যা দেখো না, তার সবই কি মিথ্যা? এখনও কি বলবে, যেহেতু আমরা সৃষ্টিকর্তা, জিন, ফেরেশতা, জান্নাত, জাহান্নাম দেখিনি, আমাদের আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতি দ্বারা প্রমাণ করতে পারিনি, সেহেতু বিশ্বাসও করি না। অর্থাৎ আনসিন ইজ নাথিং...'

...কপালে চিন্তার ভাজ পড়ল অ্যান্টনির। ডান হাতের বৃদ্ধা আঙুলের বাড়তি নখটুকু দাঁত দিয়ে খুটে চলছে। হেলান দেওয়া থেকে একটু সোজা হয়ে বসল। বাম হাত দিয়ে মাথার চুলগুলো মুঠি করে ধরে হালকা চাপ দিচ্ছে। জ্বরের সঙ্গে হালকা চিন্তা যুক্ত হওয়ায় মুখে পেরেশানির ভাবটা বেড়ে গেল। ছোট্টো একটা ছেলে এত কিছু শিখল কোথা থেকে? হঠাৎ কিছু একটা ভেবে উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার মুখটা। ঠোঁটের কোণায় দেখা গেল কিঞ্চিত হাসির রেখা। বেচারা মিরাজ! যুক্তি দিতে গিয়ে নিজের যুক্তির জালে নিজেই ফেঁসে গেল। আজ যদি বিজ্ঞান বলে ডার্ক মেটার বা অদৃশ্য বস্তু বলে কিছু নেই, তাহলে তার যুক্তি কোথায় যাবে?

'হা হা হা...' আনমনেই অট্টহাসিটা বেরিয়ে এলো। আত্মতৃপ্তিটা ধরে রেখে চিঠির পরের অংশে চোখ বুলাল অ্যান্টনি।

...ভাইয়া, আমি জানি না লজিকগুলো উড়িয়ে দেওয়ার জন্য তুমি কী চিন্তা করছ। যখনই কোনো কিছু তোমাদের বিরুদ্ধে চলে যায়, তখনই তা ভুল প্রমাণ করার

---

[১৮]. কোয়ান্টাম মেকানিক্স, মুহাম্মদ জাফর ইকবাল, পৃষ্ঠা: ১০

জন্য উঠেপড়ে লেগে যাও। বের করে নিয়ে আস বিজ্ঞানের নামে অজ্ঞতা। কিন্তু সত্যিই যদি তুমি একজন বিজ্ঞানমনস্ক এবং যুক্তিতে বিশ্বাসী মুক্তমনা হও, তাহলে ওপরের যুক্তিগুলোর পর আর কিছু বলার প্রয়োজন হয় না। তবুও তোমাকে খুব সুন্দর একটি পর্যবেক্ষণে নিয়ে যাব, যেখানে তুমি প্রমাণ পাবে, না দেখেও প্রমাণ করা যায় অনেক অদেখাকে।'

'...আশ্চর্য! এ ছেলে বুঝল কীভাবে, এই জায়গায় এসে আমি চিন্তা করব কী করব না!' একটু শকড হয়ে অনুচ্চস্বরে কথাগুলো উচ্চারণ করল অ্যান্টনি। এই প্রথম চিঠিটা পড়ার প্রতি একটু আগ্রহ জন্মাল। অ্যান্টনি আবার শুরু করল...

...ভাইয়া, তুমি জানো, আমরা অধিকাংশ মানুষ মাত্র তিনটি মৌলিক রং দেখতে পাই। লাল, নীল আর সবুজ। সারা পৃথিবীতে খুবই অল্প সংখ্যক মানুষ আছে, যারা চোখে চারটি মৌলিক রং দেখতে পায়। কিন্তু আমরা যদি একটি নতুন রং-ই কল্পনা করতে না পারি, কীভাবে নিশ্চিত করতে পারি পৃথিবীতে এমন কিছু রং আছে, যেগুলো আমরা দেখতে পাই না? এটা প্রমাণ করার পদ্ধতিকে বলা হয়, 'জিরো নলেজ প্রুফ' বা অদেখার প্রমাণ।[১৯] এই পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের MIT (Massachusetts Institute of Technology)-এর গণিত বিভাগের কয়েকজন প্রফেসর।

ধরো, আমার বন্ধু রমি একদিন দাবি করল, সে চারটি মৌলিক রং দেখতে পায়। কিন্তু আকবরের সঙ্গে তার দা-কুমড়া সম্পর্ক হওয়ায় সে কিছুতেই রমির দাবিটি মেনে নিতে পারল না। রমি বাজি ধরেছে, সে প্রমাণ করেই ছাড়বে তার দাবি সঠিক। কিন্তু কীভাবে প্রমাণ করবে?

এবার রমি একটা কাগজ আর একটা কয়েন নিয়েই ব্যাপারটা প্রমাণ করতে বসে গেল। কাগজটার ওপরের অংশ সাদা আর নিচের অংশটা রমির দেখা সেই চতুর্থ মৌলিক রঙের। লাল, নীল আর সবুজ মিলিয়ে রমি সেই নতুন রংয়ের নাম দিলো নীলাজ। যেহেতু আকবর আর আমি কেউ নীলাজ রংটি দেখতে পাচ্ছি না, সেহেতু আমরা সবাই কাগজটির পুরোটা সাদা দেখব।

---

[১৯]. বিজ্ঞান চিন্তা, ফেব্রুয়ারি ২০১৭, https://toc.csail.mit.edu/node/218
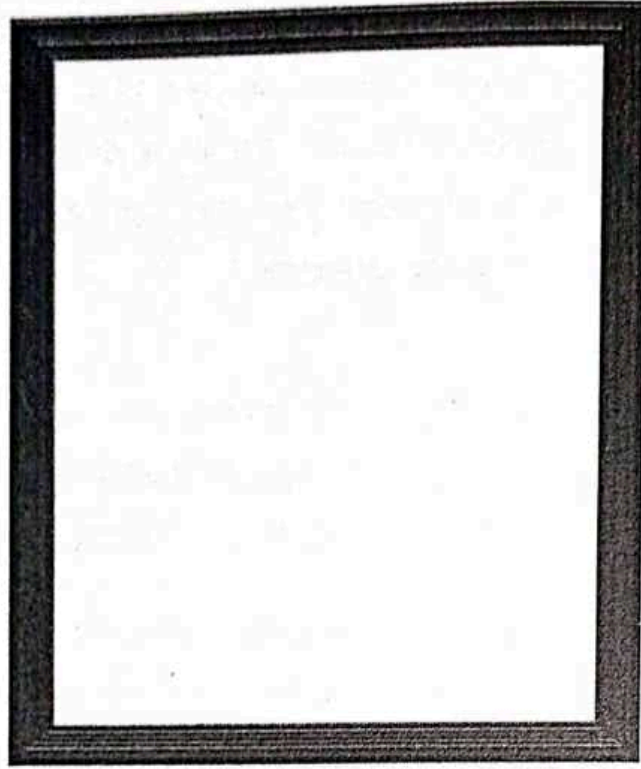
আমরা যেমন দেখব

যেহেতু রমি নতুন একটি মৌলিক রংটি দেখতে পায়, সেহেতু সে কাগজের যে অংশে নীলাজ আছে সে অংশকে আলাদা করতে পারবে। যেমন রমি এখানে বলতে পারবে কাগজের নিচের অংশ নীলাজ।
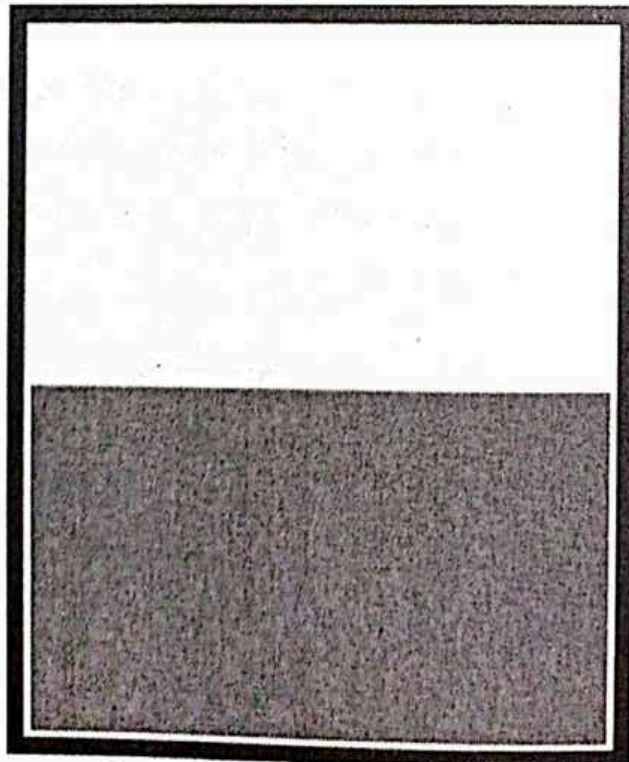
রমি কাগজের নিচের অংশ নীলাজ দেখছে

এবার রমিকে পরীক্ষা করব আমি আর আকবর। ওর চোখ বন্ধ করে একটি কয়েন টস করব। যদি হেড পড়ে, তাহলে আকবর কাগজটা উলটে দেবে। আর টেল পড়লে কাগজ যেভাবে আছে সেভাবেই থাকবে। কিন্তু কয়েনে হেড পড়ল নাকি টেল পড়ল; রমি তা দেখবে না। কারণ, তার চোখ আগে থেকেই বন্ধ। এখন ধরো, টসে হেড পড়ল। তাহলে আমি আর আকবর কাগজটাকে কেমন দেখব এবং রমি কেমন দেখবে। আর টেল পরলে কে কেমন দেখব?

কেমন দেখাবে কাগজটা, যদি হেড পড়ে?

কাগজ উলটানোর পর আমরা যেমন দেখব
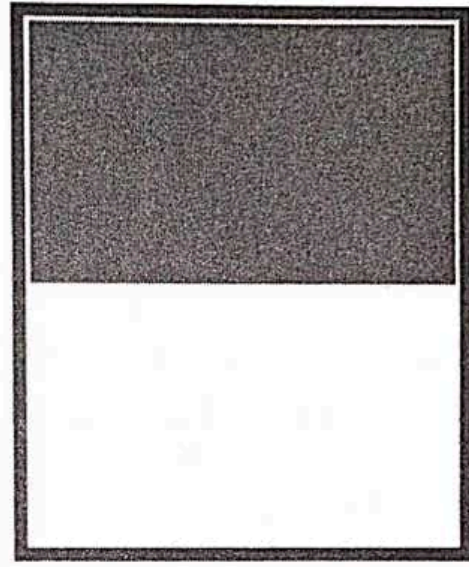
কাগজ উলটানোর পর রমি যেমন দেখবে

আর যদি টেল পড়ে কে, কেমন দেখব?
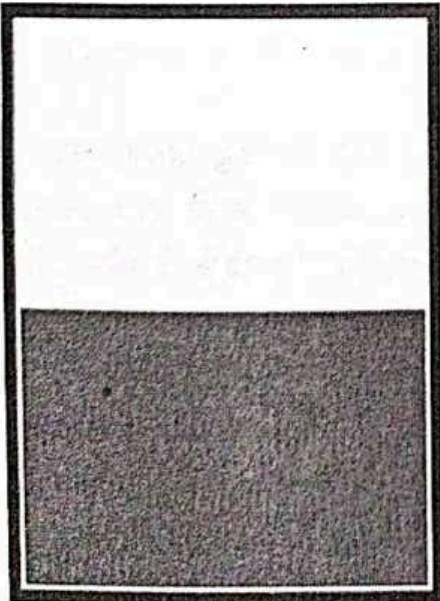
রমি যেমন দেখবে

আমরা যেমন দেখব

দেখতেই পাচ্ছ, কী হচ্ছে। আমরা যারা নীলাজ দেখতে পাই না, তারা টসের আগে এবং পরে কাগজের রং একই দেখব। কিন্তু রমির মতো যে নীলাজ দেখতে পায়, তার জন্য টসের ফলাফলের ওপর নির্ভর করে কাগজ উলটে গেছে, সে বুঝতে পারবে। তাই যে নীলাজ দেখতে পায়, সে কাগজ দেখেই বলে দিতে পারবে, টসে হেড না টেল উঠেছে। তাই রমি নীলাজ দেখতে পায় কিনা সেটা যাচাই করা একদম সোজা।

এবার রমিকে আকবর জিজ্ঞেস করবে, টসে হেড এসেছিল নাকি টেল। যদি উত্তর সঠিক হয়, তাহলে আমরা বুঝতে পারব, সে হয়তো নীলাজ দেখছে। আর ভুল হলে আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারব, সে নীলাজ দেখতে পায় না।

কিন্তু সে যদি সত্যিই নীলাজ দেখতে না পারে এবং শুধু আন্দাজেই সঠিক উত্তরটি বলে দিতে পারে, সেক্ষেত্রে কী হবে?

এখানে মাত্র দুটো সম্ভাব্য উত্তর আছে। দুটো হওয়ার সম্ভবনাই সমান। তাই রমি আনুমানিক একটা উত্তর দিলে সেটিও শতকরা ৫০ ভাগ মিলে যাবে। তাহলে সত্য যাচায় করার উপায়টা কী?

সেটিও খুব সহজ। একই পদ্ধতিতে কেবল আরও ১০ বার টস দিলেই হবে। যদি সে প্রতিবারেই সঠিক উত্তরে দিতে পারে, তাহলে আমাদেরকে বোকা বানানোর সম্ভাবনা এক হাজার (১০০০) ভাগের এক (১) ভাগের চেয়েও কম। আর যদি ২৫ বারের টসে ২৫ বারই সঠিক উত্তর দিতে পারে, তাহলে তার মিথ্যা বলার সম্ভাবনা প্রায় এক কোটি (১০০০০০০০) ভাগের এক (১) ভাগ। আর যদি শুধু একবার ভুল করে, তাহলে বুঝতেই পারবে, সে আসলে নীলাজ দেখছে না।

ভাইয়া, দেখতেই পেলে এই পৃথিবীতে এমন অনেক কিছু আছে, যা বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন কিছু মানুষ দেখতে পারে কিন্তু আমরা পারি না। তোমাদের মতো কোনো মুক্তমনা এই হাস্যকর দাবি করেনি, 'যেহেতু আমরা দেখি না সেহেতু বিশ্বাস করি না।' আমাদের মাত্রার ভেতরের বস্তু একটু ভিন্ন হওয়ার কারণে, তা বেশিরভাগ মানুষই দেখতে পারি না। তাহলে ক্ষমতার বাহিরে অসীম মাত্রার সেই মহান সত্তাকে আমরা কীভাবে দেখার আশা করতে পারি? যেখানে তিনি তার সমস্ত সৃষ্টিকেই দেখার ক্ষমতা দেননি। এখন নিশ্চয় বুঝতে পারলে তোমাদের 'আনসিন ইজ নাথিং' নীতি একটা হাস্যকর প্রলাপ ছাড়া আর কিছুই না।

আমার কী দোষ

কিছুদিন আগে তোমার বন্ধু জাকির ভাই-এর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তোমার কথা জানতে চাইল।

বলল, 'দেশের যা হাল, রাতে টেনশনে ঘুমাতে পারি না। অ্যান্টনিকে বলিস সাবধানে থাকতে।'

'আচ্ছা, আপনারা ভাইয়াকে অ্যান্টনি বলে ডাকেন কেন? তার সুন্দর একটা নাম আছে না?' খুব বিরক্ত হয়ে বললাম।

জবাবে বলল, 'আরে অ্যান্টনি ফ্লিওর নাম শুনেছিস? জানি, শুনিসনি। তোর মতো বদ্ধমনারা এসব নাম শুনবে কোত্থেকে?'

'আশ্চর্য! একজন ব্যক্তির নামের সঙ্গে বদ্ধমনা, মুক্তমনার কী সম্পর্ক?'

'ওনাকে না চেনা আর কুয়োর ব্যাঙ হয়ে থাকা একই কথা। শোন মিরাজ, উনি খুবই বড়ো মাপের বিজ্ঞানী। শুধু বিজ্ঞানীই নয়, মুক্তমনা! বুঝলি? যারা সকাল-বিকাল ঈশ্বর ঈশ্বর করে, তিনি তাদের এক হাত নিয়ে নেন। তিনি বলেছেন, আমাদের সৃষ্টির জন্য স্রষ্টার কোনো প্রয়োজন নেই। এমনকি তিনি ডারউইনের বিবর্তনবাদ থিওরি নিয়ে অনেক কাজ করেছেন, অনেক বইও লিখেছেন। আর তার নাম শুনবি কোথা থেকে? জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোনো খোঁজখবর আছে তোদের?

তোদের মোল্লারা শুধু খাবে, ঘুমাবে আর ধর্মের নামে বড়ো বড়ো ঢেকুর তুলবে। একটু চিন্তা-ভাবনা কর। সময় এখন পালটে গেছে। এখন চিন্তা না করলে পরে পস্তাতে হবে।'

'আচ্ছা, আমি কি একটিবারের জন্যেও বলেছি, তাকে চিনি না? আমি শুধু জানতে চেয়েছি, আপনারা ভাইয়াকে অ্যান্টনি ডাকেন কেন?'

'আরে সেটাই তো বলছি। তোর ভাইয়া অ্যান্টনি ফ্লিওর চরম ফলোয়ার। সে তার চিন্তাগুলো নিয়ে ব্লগে অনেক লেখালেখি করে। তোদের মতো মোল্লাদের বিভিন্ন প্রশ্ন করে থ বানিয়ে দেয়। তার যুক্তি খণ্ডানোর সাহস কেউ পায় না। অনলাইনে সে আমাদের গুরু। এজন্য সম্মান করে তাকে আমরা অ্যান্টনি বলে ডাকি। আর তারই ছোটো ভাই তুই। তোরও এগুলো নিয়ে একটু চিন্তা করা উচিত। ওইসব ধর্মের গণ্ডি থেকে বের হয়ে এসে জ্ঞান-বিজ্ঞান নিয়ে একটু ভাবা উচিত।'

'হ্যাঁ, আমি ভাবছি ঠিকই! তবে তা আপনাদের মতো করে না, একটু ভিন্নভাবে। আর আমরা ভাইয়াকে নিয়ে এত দুশ্চিন্তা করি না। ভাগ্যে কী আছে তা তো আল্লাহ ভালো জানেন।'

'হা হা হা, আবার সেই ভাগ্য। আচ্ছা, ভালো কথা মনে করেছিস! তুই বল তো, স্রষ্টা যদি ভাগ্যে আগেই সবকিছু লিখে রাখেন তাহলে আমরা ভালোমন্দ সব কাজই তার ইচ্ছা অনুযায়ী করছি, তাই না? তাহলে তার সিলেক্টেড কাজ করার জন্য মানুষ জাহান্নামে যাবে কেন?'

'শুনুন ভাইয়া, আপনারা ব্যাপারটি না বুঝেই নাক সিঁটকান। এটা কিন্তু ঠিক না। আচ্ছা, আপনি তকদির সম্পর্কে স্টাডি করেছেন? কোনো ইসলামিক স্কলারের বই পড়েছেন?'

'এই সহজ বিষয়টা বুঝতে কোনো বই পড়ার দরকার হয় নাকি?'

'এই নীতি ত্যাগ করুন, ভাইয়া। না জেনে, না বুঝে ইসলামের একটি সেনসিটিভ বিষয় নিয়ে সিরিয়াস মন্তব্য করেন। আর আল্লাহর দিকে অভিযোগ করে নিজেকে একেবারে মহাপণ্ডিত জারি করে ফেলেন? ইসলামিক স্কলাররা তকদির নিয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। এই বিষয়টা এতই সেনসিটিভ যে, স্কলারদেরও কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভুল হয়ে যায়। আমি আপনার এই অভিযোগের একটু সমাধান দিতে চেষ্টা করব মাত্র। ওয়া বিল্লাহে তাওফিক। খুব মন দিয়ে শুনুন। আর আমার কথা বলার সময় টকশো উপস্থাপকদের মতো বাধা দেবেন না প্লিজ।'

'হা হা হা। অযৌক্তিক এবং অবৈজ্ঞানিক কথা শুনলে তো চুপ করে থাকা মুশকিল। আচ্ছা তারপরেও বলতে থাক। চুপ থাকার চেষ্টা করব।'

'ঠিক আছে চেষ্টা করলেই হবে। শুনুন তাহলে; আল-কদর বা তকদিরের আভিধানিক অর্থ হলো কোনো কিছুর পরিধি, সীমা বা পরিমাণ।[২০] আর পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে, সবকিছু ঘটার আগেই সে সম্পর্কে আল্লাহর সম্যক জ্ঞান, সেগুলো লওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধকরণ, সেসব বিষয়ে আল্লাহর পূর্ণ ইচ্ছার সমন্বয় এবং অবশেষে সেগুলো সৃষ্টি করাকে তকদির বলে।[২১] সংজ্ঞা বুঝলেন?'

'হুম, কিন্তু...'

'প্লিজ, কিন্তুটা একটু পরে বলেন, আগে শুনুন। আপনারা তকদির বলতে যেমনটা বোঝেন, ব্যাপারটা আসলে সেই রকম নয়। তকদিরের চারটি স্তর রয়েছে,

১. সবকিছু সম্পর্কে আল্লাহর চিরন্তন জ্ঞানের প্রতি বিশ্বাস। অর্থাৎ যা ঘটেছে এবং যা ঘটবে সে সম্পর্কে তিনি জানেন। যা ঘটেনি তা যদি ঘটত, তাহলে কীভাবে ঘটত তাও তিনি জানেন।
২. আল্লাহ তাঁর ইলমুল গায়েব অনুযায়ী লওহে মাহফুজে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত যা কিছু হবে তার সবই লিপিবদ্ধ করেছেন, এই কথায় বিশ্বাস। তকদির লিপিবদ্ধের আবার পাঁচটি পর্যায় আছে। সেগুলো এখন বলছি না। কারণ, আপনি ততক্ষণ ধৈর্য ধরতে পারবেন না।
৩. আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত কোনো কিছুই হয় না, এই কথায় বিশ্বাস। অর্থাৎ আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা হয়, যা ইচ্ছা করেন না তা হয় না। আল্লাহর রাজ্যে কোনো কিছুর নড়াচড়া স্থির থাকাও তার ইচ্ছা ব্যতীত হয় না।
৪. আল্লাহর রাজ্যের সবকিছুই তিনি সৃষ্টি করেছেন এই কথায় বিশ্বাস। অর্থাৎ আল্লাহ যা কিছু করছেন সব কিছুতে তাঁর পূর্ণ ইচ্ছা আছে, সেই ইচ্ছা অনুযায়ী তিনি সবকিছু করে থাকেন।[২২]

জাহেলি যুগে কিংবা কুরআন নাজিলের পরও কেউ তকদিরকে অস্বীকার করত না। কিন্তু একটা সময় গ্রিক এবং ভারতীয় দর্শনের বইপুস্তক মুসলিম দেশগুলোতে প্রবেশ করে। এরপর কুরআন-সুন্নাহ থেকে দূরে সরে যাওয়া বিভ্রান্ত কিছু ফেরকার

---

২০. মু'জামুল্লাগাহ, ইবনে ফারেস ৪/১৭৪

২১. জামেউ শুরুহিল আকিদাতিত-তহাবিয়াহ, সালেহ ইবনে আব্দুল আজিজ আলুস শাইখ ১/৫৩৩

২২. আল ঈমান বিল কাযা ওয়াল কাদার, পৃ : ৫৯

মানুষও তকদির সম্পর্কে বিভিন্ন অপব্যাখ্যা এবং প্রশ্ন তোলা শুরু করে দিলো। কাদারিয়্যাহ, জাবারিয়্যাহ, চরমপন্থি সুফি, রাফেজাহ ইত্যাদি ভ্রান্ত ফেরকা তকদিরের মূল শিক্ষাকে বিকৃত করে প্রশ্ন ও যুক্তি উত্থাপন করা শুরু করে। সেই সবই এখন আপনাদের মুখে মুখে ঘুরে বেড়ায়। মানুষ কপি করে উত্তর, কিন্তু আপনারা করেছেন প্রশ্ন!

আসল ব্যাপার হলো, আল্লাহ সব লিপিবদ্ধ করেছেন, সব জানেন এবং সব তাঁর ইচ্ছাতেই হয়। কিন্তু ভালোমন্দ উভয় আল্লাহর সৃষ্টি হলেও মানুষকে তার স্বাধীন ইচ্ছা দ্বারা যেকোনোটি বেছে নেওয়ার সুযোগ দিয়েছেন।[২৩] তিনি তাঁর ইলমুল গায়েব দ্বারা জানেন, কে দুনিয়ার জীবনে কতদিন বাঁচবে, কোথায় মৃত্যু হবে, কী করবে, কতটুকু পাপ করবে, কতটুকু পুণ্য করবে, সে কী সৌভাগ্যবান নাকি দুর্ভাগ্যবান, সে কী জান্নাতে যাবে নাকি জাহান্নামে যাবে ইত্যাদি। এ থেকে প্রমাণ হয় না, আল্লাহ ভালোমন্দ বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে মানুষকে বাধ্য করেন।'[২৪]

'কেমন যেন আউলা-ঝাউলা লাগছে। কী সব ইলমুল গায়েব-টায়েব বলছিস মাথায় ঢুকছে না।'

'ওকে, ক্লিয়ার করছি। পরিচিত একটা তথ্য দিচ্ছি, ইউক্রেনের বিজ্ঞানীরা বলেছেন, আগামী ১৮ বছরের মধ্যে পৃথিবীতে আঘাত করতে পারে "2013TV135" নামের একটি গ্রহাণু। জানেন তো?'

'হুম জানি।'

'কী হতে পারে আঘাত করলে?'

'বিজ্ঞানীরা তো বলছেন, এই পৃথিবী ধ্বংস হয়ে হয়ে যেতে পারে। কারণ, নাসার গবেষণা থেকে জানা গেছে এই গ্রহাণু যদি পৃথিবীতে আঘাত করে তবে তা হবে দুই হাজার পাঁচ শত পারমাণবিক বোমার সমান এবং এটি ২০৩২ সালের ২৬ আগস্ট পৃথিবীর কক্ষপথের কাছে চলে আসবে।'[২৫]

---

[২৩]. মুখতাছারুছ ছওয়ায়েক্বিল মুরসালাহ আলাল জাহমিয়াতি ওয়াল মুয়াত্তেলাহ, ইবনুল কাইয়িম রহ., সংক্ষেপে; মুহাম্মদ ইবনু মাওছেলি, মাকতাবাতুর রিয়ায, ১/৩২৫

[২৪]. আল কাযা ওয়াল কাদার/৩৪৮

[২৫]. https://www.nasa.gov/mission_pages/asteroids/news/asteroid20131017.html

'দেখুন জাকির ভাই, এই গ্রহাণু এখনোও আঘাত করেনি এবং বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত নয় আঘাত করবে কি না। ধরুন, দুর্ভাগ্যক্রমে এই গ্রহাণু সত্যি সত্যি আঘাত করল এবং পৃথিবী প্রায় ধ্বংস হয়ে গেল। তখন পৃথিবীর এই অবস্থার জন্য কে দায়ী? নিশ্চিতভাবে নাসা এবং ইউক্রেনের বিজ্ঞানীরা? কারণ, তারা ২০১৪ সালে বলেছিল যে, এটি ভবিষ্যতে পৃথিবীতে আঘাত করতে পারে, যার ফলে সত্যি সত্যি আজ এটি পৃথিবীতে আঘাত করে বসল।'

'দেখ ভাই, তোমরা যারা ধর্ম মানো তাদের এই একটা বড়ো সমস্যা। তোমরা বিজ্ঞান বোঝ না। তোমরা মুসলমানরা পড়ে আছ সেই সাড়ে চোদ্দো শত বছর আগের একটা কিতাব নিয়ে। শুন, আসলে এই ব্যাপারে নাসা বা ইউক্রেনের বিজ্ঞানীদের তো কোনো দোষ নেই। তারা অত্যাধুনিক যন্ত্রের মাধ্যমে, স্যাটেলাইটের পাঠানো তথ্য বিশ্লেষণ করে গ্রহাণুর অবস্থান, গতিপথ ও বেগ, সেইসঙ্গে পৃথিবীর অবস্থান ইত্যাদি বিষয়গুলোর অতি জটিল হিসাব-নিকাশের মাধ্যমে জানতে পেরেছে, ভবিষ্যতে এই গ্রহাণু পৃথিবীতে আঘাত করতে পারে। তাই তারা পৃথিবীবাসীকে সতর্ক করেছে। তার মানে এই না যে তারাই এই গ্রহাণুকে পৃথিবীর দিকে নিয়ে আসছে। আসলে তারা আগেভাগে জানতে পেরেছে, গ্রহাণুর গতি পথে হয়তো পৃথিবীর সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটবে। এর জন্য কোনোভাবেই বিজ্ঞানীরা দায়ী না বুঝলে?'

'হুম, বুঝলাম। এবার শুনেন, মানুষ অনেক কিছু নিয়ে ভবিষ্যদ্‌বাণী করতে পারে তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান দিয়ে। যেমন ধরুন, এই গ্রহাণু আঘাত হানবে কিনা, তা কিন্তু নিশ্চিত নয়। ঘটতেও পারে আবার নাও ঘটতে পারে। কিন্তু স্রষ্টা হলেন আলিমুল গায়েব, তিনি ভবিষ্যতের সকল বিষয়ও নিশ্চিতভাবে জানেন।[২৬] আর তাঁর এই জানা সবকিছুই তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন। স্রষ্টা সবকিছু আগে থেকেই জানেন, তাঁর কোন বান্দা আসলে কেমন হবে, কে তাঁর নিদর্শনসমূহ বিশ্বাস করবে, তাঁকে মানবে, কে নিজের কর্ম দিয়ে তাঁর সন্তুষ্টি লাভ করবে, আর কে স্রষ্টাকে অস্বীকার করবে ইত্যাদি। আসলে লিপিবদ্ধ করার কারণে মানুষ খারাপ কাজ করে জাহান্নামে যাচ্ছেন ব্যাপারটা এমন না। বরং তিনি জানতেন এই লোক তাঁকে অস্বীকার করবে, খারাপ কাজ করবে এজন্যই তিনি লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। এই সহজ বিষয়টা আপনারা মেনে নিতে পারছেন না কেন?'

---

[২৬]. সূরা নাবা-৭৮ : ২৯

'কিন্তু ব্রো... তোদের কোরানেই তো বলা আছে, "আমরা ইচ্ছা করলে প্রত্যেককে সঠিক দিকনির্দেশ দিতাম; কিন্তু আমার পক্ষ থেকে এ কথা সাব্যস্ত যে, এ উক্তি অবধারিত সত্য, আমি জিন ও মানবের কতককে দিয়ে অবশ্যই জাহান্নাম পূর্ণ করব।"[২৭] তাহলে আল্লাহ ইচ্ছা করেই সব মানুষকে সঠিক নির্দেশ দেন না, তিনি নিজ ইচ্ছাতেই জাহান্নাম পূর্ণ করবেন বলেছেন। আবার অন্য জায়গায় বলেছেন, "আল্লাহ তাদের অন্তকরণ এবং তাদের শ্রবণশক্তির ওপর মোহর মেরে দিয়েছেন, আর তাদের দৃষ্টির ওপর রয়েছে আবরণ। আর তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।"[২৮] তাহলে তিনিই তো আগে থেকে অন্তর, চোখ, কান ঢেকে দিয়ে লিপিবদ্ধ করেছেন, আমাদের কী দোষ?'

'ওরে বাবা! কাবু করার জন্য দেখছি আপনি পুরো আয়াত মুখস্ত করে রেখেছেন! ভাইয়া, আপনারা সবাই দেখছি এই সিলেক্টিভ কিছু আয়াতকে মৌলিক সিলেবাস বানিয়ে নিয়েছেন। যাতে সুবিধাজনক জায়গায় প্রয়োগ করতে পারেন।'

'খুব বুঝিস দেখছি! কাজের কথা বল।'

'ঠিক আছে। এবার আপনার প্রশ্নে আসি। দেখুন, সূরা আল ইমরানে ৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে— "তিনিই আপনার প্রতি কিতাব নাজিল করেছেন। তাতে কিছু আয়াত রয়েছে মুহকামাত বা সুস্পষ্ট। সেগুলোই কিতাবের আসল অংশ। আর অন্যগুলো মুহতাশাবিহ বা রূপক। সুতরাং যাদের অন্তরে কুটিলতা রয়েছে, তারা তন্মধ্যেকার রূপকগুলোর অনুসরণ করে ফিৎনা বিস্তার এবং অপব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে।" এখন যেসব আয়াত সুস্পষ্ট আছে সেগুলোই তো আমরা বুঝি না। বুঝতে হলে হাদিসে যেতে হবে, আবার কোন আয়াত বা হাদিস সাহাবিরা কেমন বুঝেছেন, তাবেইন, তাবে-তাবেইন, জমহুর আলেমগণ কেমন বুঝেছেন সেভাবে বুঝতে হবে। দ্বারস্থ হতে হবে আলেমদের নিকট। নিজ থেকে একটা ব্যাখ্যা দিয়ে দিলে এমনই হবে।'

'কেমন?'

'এই যে আপনি যেমন দিলেন, মনগড়া অপব্যাখ্যা।'

'মাননীয় মিরাজ হুজুর! সঠিক ব্যাখ্যাটা তাহলে আপনিই বলেন।'

---

[২৭]. সূরা সাজদাহ-৩২ : ১৩

[২৮]. সূরা বাকারাহ-২ : ৭

'ভাইয়া ঠাট্টা করবেন না তো, প্লিজ। আয়াতের নিজস্ব কোনো ব্যাখ্যা দেওয়ার সুযোগ নেই। আচ্ছা কাজের কথায় আসি, ইমাম ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "এসব আয়াতের অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ বান্দা ও বান্দার ঈমান গ্রহণের মধ্যে অন্তরায় সৃষ্টি করেন; বরং এসব আয়াতের মর্মার্থ হলো, সত্য জানার পরেও যারা মুখ ফিরিয়ে রাখে এবং ঈমান আনে না, আল্লাহ তাদের কুফরির শাস্তিস্বরূপ ঈমান কবুলের মধ্যে অন্তরায় সৃষ্টি করে দিয়েছেন। আল্লাহ বারবার তাদেরকে সত্যের পথে আহ্বান করছেন, সঠিক পথ দেখিয়ে দিচ্ছেন, কিন্তু তারা শুধু বিরোধিতা করে যাচ্ছে। তাহলে আল্লাহ কেন তাদেরকে শাস্তি দেবেন না?"[২৯]

আসলে বান্দার কর্মের সঙ্গে আল্লাহর চিরন্তর জ্ঞান এবং ইচ্ছা থাকলেও তিনি তাদের কর্মে বাধ্য করেন না; বরং তিনি মানুষকে দিয়েছেন স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি। আর তাঁর প্রেরিত দূতের মাধ্যমে দিয়েছেন জীবনের জন্য গাইড লাইন। সে স্রষ্টাকে মানতেও পারে, আবার অস্বীকারও করতে পারে। স্রষ্টার আদেশ নিষেধ মানতে পারে আবার অমান্যও করতে পারে। জাহান্নামবাসী নিজের ইচ্ছাতেই জাহান্নামে যাওয়ার কাজ করবে, এটা আল্লাহ আগে থেকেই জানেন বলেই তিনি তাদেরকে জাহান্নামিদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তিনি লিখেছেন বলেই যে তারা করতে বাধ্য এমনটি নয়; বরং তারা করবে জেনেই তিনি লিখেছেন।[৩০] এটুকু ক্লিয়ার?'

'হুম কিন্তু কোরানে তো স্পষ্ট করে বলা আছে— "তোমরা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ইচ্ছার বাইরে অন্য কিছুই করতে পারো না।"[৩১] তাহলে আল্লাহ ইচ্ছা করলেই তো সবাই ঈমানদার হতো, তাই না? তার ইচ্ছাতেই তো মানুষ খারাপ কাজ করছে। কারণ, তিনি তো বলেই রেখেছেন তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ কিছু করতে পারে না।'

'এই যে আল্লাহর ইচ্ছা। এই ইচ্ছা আবার দুভাগে বিভক্ত। সেটা জানেন?'

'ইচ্ছার আবার বিভক্তি? জাস্ট ওয়ান মিনিট, তোর এ বিভক্তির প্যাঁচে পড়ে মাথাটাই কাজ করছে না। একটু রিফ্রেস করে নিই।' চকচকে বেনসনের প্যাকেটটা পকেট থেকে বের করে সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন জাকির ভাই।

---

২৯. তকদির : আল্লাহর এক গোপন রহস্য, পৃ : ৪২

৩০. জামে' শরহিল আকিদা আত তহাবিয়াহ, ২/৫২৭

৩১. সূরা আত-তাকভির ৮১ : ২৯

আমি বলতে শুরু করলাম, 'আল্লাহর ইচ্ছার দুটি ধরন,

(১) ইরাদাহ কাউনিইয়াহ (إرادة كونية) বা সৃষ্টি সম্পর্কিত ইচ্ছা।

(২) ইরাদাহ শারঈয়াহ (إرادة شرعية) বা শরঈ ইচ্ছা।

প্রথম প্রকারের ইচ্ছা আল্লাহর রাজ্যের সবকিছুকে শামিল করে। আল্লাহ যা কিছু করতে চান, সবকিছুর সঙ্গে এই প্রকার ইচ্ছার সম্পর্ক রয়েছে। এই প্রকার ইচ্ছার মাধ্যমে এমন কিছু ঘটতে পারে, যার প্রতি তিনি সন্তুষ্ট হন। আবার এমন কিছুও ঘটতে পারে, যাতে তিনি সন্তুষ্ট হন না।

যেমন : আল্লাহ জানতেন ইবলিস তাঁকে অমান্য করবে তবুও তিনি ইবলিসকে সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু তাকে তিনি ভালোবাসেন না। অপরপক্ষে ফেরেশতারা যখন বলেছিল, মানবজাতি তো দুনিয়াই ফ্যাসাদ সৃষ্টি করবে। আল্লাহ জানতেন সবাই ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী হবে না। তিনি মানবজাতি সৃষ্টি করলেন, যাদের মধ্যে ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী রয়েছে। কিন্তু আল্লাহ ফ্যাসাদকারীদের ভালোবাসেন না, তিনি শুধু মুমিনদেরকে ভালোবাসেন। বুঝলেন?'

'আমার বোঝার ব্যাপারটা পরে দেখা যাবে। এবার পরেরটা বল।' সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন জাকির ভাই।

'দ্বিতীয় প্রকারের ইচ্ছা হলো, আল্লাহ যে বিষয়টি তাঁর বান্দা কর্তৃক বাস্তবায়িত হওয়াকে কামনা করেন এবং ভালোবাসেন এমন বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত ইচ্ছাকে শরঈ ইচ্ছা বলে। এই প্রকার ইচ্ছা আল্লাহর ভালোবাসা এবং সন্তুষ্টির সঙ্গে নির্দিষ্ট হয়ে থাকে। অর্থাৎ তিনি তাঁর উদ্দিষ্ট বিষয়টিকে ভালোবাসেন, তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন, তার বাস্তবায়নকারীর প্রতি খুশি হন এবং তাকে উত্তম প্রতিদান দান করেন। আর অমান্যকারীকে শাস্তি দেন। কিন্তু কাউকেই আল্লাহ নিজের পছন্দনীয় বিষয় করতে বাধ্য করেন না।'

'এটা বুঝতে পারছি না। সহজ করে বল।'

'যেমন, আদম (আ.) এবং হাওয়া (আ.)-কে আল্লাহ যখন নিষিদ্ধ গাছের নিকট যেতে নিষেধ করেছিলেন, তখন তিনি জানতেন তারা শয়তানের প্ররোচনায় সেখানে যাবে। কিন্তু তিনি তাদেরকে সেখানে যেতে বাধা দেননি, অথচ সেখানে যাওয়া আল্লাহর অপছন্দ ছিল। আবার আদম (আ.) যখন নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে আল্লাহর কাছে তওবা করেছিলেন, আল্লাহ তওবা কবুল করেছেন। তিনি তওবা পছন্দ করেন কিন্তু আদম (আ.)-কে তাওবা করতে বাধ্য করেননি। ক্লিয়ার?'

'হুম, কিছুটা।'

'এই দুই প্রকার ইচ্ছার আবার পারস্পরিক চারটি সম্পর্ক এবং পার্থক্য রয়েছে। সেদিকে যাচ্ছি না। কিন্তু এরকম অভিযোগ মক্কার মুশরিকরাও করেছে, আল্লাহ চাইলে তো আমরা ঈমান আনতাম। আল্লাহ তাদেরকে জবাব দিয়ে বলেন, "যারা শিরক করেছে, অচিরেই তারা বলবে যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন, তবে না আমরা শিরক করতাম, না আমাদের বাপ-দাদারা এবং না আমরা কোনো বস্তুকে হারাম করতাম। এমনিভাবে তাদের পূর্বসূরিরা মিথ্যারোপ করেছে, অবশেষে তারা আমাদের শাস্তি ভোগ করেছে।"[৩২]

আল্লাহ বলছেন, এটা আসলে তাদের মিথ্যাচার। তারা সবসময় ঈমানের বিরোধিতাই করে আসতেছে। আল্লাহ মানুষকে সেই বিবেক এবং ক্ষমতা দিয়ে বলছেন— "এই দিবস (কিয়ামাত) সত্য। অতঃপর যার ইচ্ছা, সে তার পালনকর্তার কাছে ঠিকানা তৈরি করুক।"[৩৩]

এই যে আল্লাহ বললেন, "যার ইচ্ছা" মানে আমাদের এখতিয়ার দিয়েছেন, বাধ্য করেননি। কিন্তু মৃত্যুর পর প্রতিফল মেনে নিতে বাধ্য, "এ হলো তারই প্রতিফল, যা তোমরা ইতঃপূর্বে নিজের হাতে পাঠিয়েছ। বস্তুত আল্লাহ বান্দাদের প্রতি অত্যাচার করেন না।"[৩৪]

কেউ অন্যায় অপকর্ম করে তকদিরের দোহাই দিয়ে পার পাবে না। যেমন, এক চোর ধরা খাওয়ার পর উমর (রা.)-কে বললেন, এটা তো আমার তকদিরে লেখা ছিল। উমর (রা.) রাষ্ট্রীয় আইন অনুযায়ী চোরের হাত কেটে দিয়ে বললেন, এটাও তোমার তকদিরে লেখা ছিল। অতএব, তকদিরের দোহাই দিয়ে শিরক, কুফরি, অন্যায় অপকর্ম করে রক্ষা পাওয়া যাবে না।[৩৫] বুঝলেন?'

'হু...ম... মোটামুটি।'

'আপাতত এই মোটামুটি আপনার অভিযোগ দূর করতে যথেষ্ট। ভালোভাবে বুঝতে হলে গ্রন্থ পড়তে হবে, রাস্তা-ঘাটে দাঁড়িয়ে সব বুঝতে পারবেন না। তাহলে এইটুকু বুঝতে পারলেন যে, মানুষ জাহান্নামে যাওয়ার জন্য আল্লাহ কোনোভাবেই দায়ী নয়।'

---

[৩২]. সূরা আল-আনআম, ৬ : ১৪৮

[৩৩]. সূরা আন-নাবা, ৭৮ : ৩৯

[৩৪]. সূরা আল-ইমরান, ৩ : ১৮২

[৩৫]. তাকদ্বীরঃ আল্লাহর এক গোপন রহস্য, পৃ : ১০৫

'আসলে এভাবে তো আগে শুনিনি।' জাকির ভাই বেশ নরম গলায় বললেন।

'এখন তো শুনলেন। আশা করি ভবিষ্যতে আর এই অভিযোগ করবেন না। আরেকটি কথা হলো, আমরা দুনিয়াতে যা যা করছি সেই সবই আমাদের অদৃশ্যে লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে। মৃত্যুর পর তা দেখানো হবে, যাতে আমরা নিজেদের কৃতকর্মগুলোকে অস্বীকার করতে না পারি। এসব ব্যাপার মানবীয় যুক্তিতে অসম্ভব মনে হয়। কারণ, এসব আমাদের মাত্রার সম্পূর্ণ বাহিরে। যার কারণে আপনারা বিশ্বাস করতে চান না বা করেন না।'

'এটা কি আসলে যৌক্তিক? আমার তো মনে হয় না।'

'আপনার মনে না হলেই অযৌক্তিক হয়ে যাবে, এমন তো না। আচ্ছা, আপনি একটু ক্যামেরার কথা চিন্তা করুন তো। এখন থেকে কয়েক দশক আগের ধারণকৃত ঘটনাও অনায়াসে দেখতে পারবেন। কিন্তু আজ থেকে দুইশত বছর আগে কেউ এমন চিন্তা করেছে? এখনও যদি আপনি আফ্রিকান রেড ইন্ডিয়ানদেরকে বলেন, "সাবধান, তোমরা এখানে যা যা করো, আমরা কিন্তু বাংলাদেশ থেকে সব দেখব। এমনকি তোমরাও যদি দেখতে চাও, দেখতে পারবে," তাহলে তারা আপনার এই ইলজিক কথা বলার অপরাধে এমন দৌড়ের ওপর রাখবে, টিকেট ছাড়াই বাংলাদেশে চলে আসবেন!'

জাকির ভাই কোনো কথা না বলে চুপ করে থাকলেন। আমি আবারও বললাম,

'মাত্র কয়েক দশক আগেও যদি কেউ বলত, এমন এক সময় আসবে, মানুষ এক জায়গায় থেকে পৃথিবীর যেকোনো জায়গার মানুষের সঙ্গে কথা বলতে পারবে, তাকে দেখতে পাবে, সে কোথায় আছে সেটিও দেখা যাবে। তাহলে লোকজন তাকে বেঁধে সবচেয়ে ভালো মানসিক ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেত।

তাহলে আজ যা আমরা চিন্তা করতে পারছি না কিংবা অবাস্তব ভাবছি, কাল তা বাস্তব হচ্ছে। আবার বিজ্ঞান থেকে আমরা জানতে পেরেছি, যা দেখি না বা যা আমাদের বোধগম্য নয়, এমন কিছু যে প্রকৃতিতে নেই, তা কিন্তু নয়। বরং সেসব আমাদের ক্ষমতার বাহিরে। আমাদের ক্ষমতার বাহিরের সব অযৌক্তিক, এই বিশ্বাসটাই অযৌক্তিক।'

আল্লাহ সবার উদ্দেশ্য বলে দিয়েছেন— "সেদিন উপস্থিত করা হবে উন্মুক্ত গ্রন্থ এবং তাতে যা লিপিবদ্ধ আছে তার কারণে তুমি অপরাধীদেরকে দেখবে আতঙ্কগ্রস্থ

এবং তারা বলবে, হায়! দুর্ভোগ আমাদের! এটা কেমন গ্রন্থ! এটাতে তো ছোটো বড়ো কোনো কিছুই বাদ দেয়নি; বরং সমস্ত হিসেব রেখেছে। তারা তাদের কৃতকর্ম সম্মুখে উপস্থিত পাবে। তোমার রব কারও প্রতি অত্যাচার করেন না।"[৩৬] এখন বিশ্বাস করা, মানা, না মানা সব আপনার ইচ্ছা।

"ছায়াবাজি পুতুল রূপে বানাইয়া মানুষ
যেমনি নাচাও তেমনি নাচি পুতুলের কী দোষ।"

তখন এমন মারফতি মার্কা গান গেয়ে পার পাওয়া যাবে না।'

চন্দ্রগ্রহণ মুখে জাকির ভাই বললেন, 'আচ্ছা আমাকে এখন উঠতে হচ্ছে। তবে এখানেই শেষ নয়। পরে অবশ্যই কথা হবে। তৈরি থাকিস।' বলেই তিনি উত্তরের অপেক্ষা না করেই, তার হাতে থাকা সিগারেটের অবশিষ্টাংশটুকু মাটিতে নিক্ষেপ করে চলে গেলেন।

সিগারেটের নিক্ষিপ্ত অংশটুকু দিয়ে তখনও ধোঁয়া বের হচ্ছিল। পরিবেশ দূষণ রোধে আমি সেটাকে পা দিয়ে মাড়িয়ে নিভিয়ে দিলাম। মনে মনে বললাম এভাবেই আপনাদের দেওয়া কুযুক্তিগুলোও আমরা বিশ্বাসীরা যুক্তি দিয়ে মাড়িয়ে দেবো, ইনশাআল্লাহ।

আবারও চিঠি পড়া থামিয়ে দিলো অ্যান্টনি।

---

[৩৬]. সূরা কাহফ-১৮ : ৪৯ (বিস্তারিত জানতে পড়ুন : তাক্বদির : আল্লাহর এক গোপন রহস্য, আব্দুল আলীম ইবনে কাওসার, সম্পাদনা : ড. আবু বকর যাকারিয়া হাফি.)

স্রষ্টাকে সৃষ্টি করেছে কে

হাতের সিগারেটে মাত্র কয়েকটি টান দেওয়া হয়েছে। আগুন নিজ দায়িত্বে সিগারেট পুড়িয়ে দিতে দিতে আঙুলের ফাঁকে এসে পরাজিত হলো। চিঠির মধ্যে হারিয়ে গেছে অ্যান্টনি। চিঠিতে শব্দমালার স্তূপ দেখে অনেক বিষয় কল্পনা করে নেয়।

আচ্ছা মিরাজ কি তাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য এগুলো লিখেছে, নাকি যুক্তি দেখানোর জন্য? কিন্তু এতটুকু পড়ে তো তা মনে হলো না যে, সে কষ্ট দিতে চায়। চিন্তা করে অ্যান্টনি।

হাতের দিকে তাকিয়ে সিগারেটের শেষ পরিণতি দেখল। নুতুন করে সিগারেট ধরাবে কি না চিন্তা করতে করতেই আবার পড়ায় মনোযোগ দিলো–

...তারপর কয়েকদিন জাকির ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হয়নি। বেশ কয়েকদিন পর আবারও দেখা হলো। হাতে একটা বই নিয়ে ক্যাম্পাসের গেইটে দাঁড়িয়ে ঝালমুড়ি খাচ্ছিল। আমাকে দেখেই ডাক দিলো,

'এই পাকনা এদিকে আয়।'

আমি কাছে গিয়ে মুচকি হেসে বললাম, 'কী খবর জাকির ভাই, এই সময়ে আপনি বিশেষ জায়গায় দাঁড়িয়ে ঝালমুড়ি খাচ্ছেন? ঘটনাটা কী?'

'চুপ কর পিচ্চি কোথাকার। বড়োদের সব ব্যাপারে নাক গলাবি না খবরদার, এলাকার অনেকেই এখানে পড়ে। তাদেরকে দেখেশুনে রাখার একটা দায়িত্ব আছে না?'

'হুম... অনেককে দেখেশুনে রাখার মতো এমন মহৎ কর্ম কবে থেকে নিলেন? আসলে অনেককে দেখেশুনে রাখেন, নাকি একজনকে?'

'দেখ, আবারও বলছি বেশি পাকনামো করবি না। তোর সঙ্গে অসমাপ্ত কিছু কথা আছে চল পুকুর পাড়ে গিয়ে বসি।'

ক্যাম্পাসের পাশেই বিশাল পুকুর। সারিসারি নারিকেল গাছে ঘেরা চারপাশ। সান বাঁধানো ঘাট। স্বচ্ছ টলোমলো পানি। আড্ডা দেওয়ার মতো বেশ চমৎকার একটি পরিবেশ। ক্যাম্পাস চলাকালীন ছাত্র-ছাত্রীদের পদচারণায় মুখর থাকে এই পুকরপাড়টি। অনেকে ক্লাসের ফাঁকে এখানে এলেও, ক্লাস ফাঁকি দেওয়ার সংখ্যাও কম নয়। জাকির ভাই তার হাতের বইটি উলটাচ্ছেন আর বারবার আড় চোখে ক্যাম্পাসের দিকে তাকাচ্ছেন। চোখ দুটো যে বিশেষ কাউকে খুঁজছে, তা ওনার দিকে তাকালে যে কেউ বলে দিতে পারবে। খানিক পরে বললেন,

'আচ্ছা, সেদিন তোদের ভাগ্যের ব্যাপারটি বুঝলাম। কিন্তু আমার যে মূল প্রশ্ন তা তোকে এখনও করাই হয়নি। প্রশ্নটি হলো– সবকিছুর যদি স্রষ্টা থাকে, তাহলে স্রষ্টাকে সৃষ্টি করেছে কে?'

'ভাইয়া আপনার প্রশ্নটা যে কতটা অযৌক্তিক কিছুক্ষণ পরে তা নিজেই বিচার করতে পারবেন। প্রকৃতপক্ষে এই কথাটি এসেছে Laws of causality থেকে।'

'Laws of causality?'

'কেন ভাইয়া, আপনার জানা নেই? ঠিক আছে বলছি। জানেন তো গত শতাব্দীতেও বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করতেন, এই মহাবিশ্ব স্থির হয়ে আছে যার কোনো শুরু এবং শেষ নেই। ১৯২৯ সালে বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী এডুইন হাবল পরীক্ষা করে দেখলেন, আকাশগঙ্গা (milkyway) ছায়াপথের (galaxy) বাইরের সমস্ত ছায়াপথ ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে, তার মানে মহাবিশ্ব স্থির নয়। এটি প্রকৃতপক্ষে সম্প্রসারিত হচ্ছে।'

'জানিরে ভাই, মহাবিশ্বের এই সম্প্রসারণ সম্পর্কে স্টিফেন হকিং তাঁর *অ্যা ব্রিফ হিস্ট্রি অব টাইম* বইয়ে সুন্দর আলোচনা করেছেন। তিনি অধ্যায়ের নাম দিয়েছেন, The Expanding Universe অর্থাৎ প্রসারমান মহাবিশ্ব। এইসব অনেক আগে খেয়ে এসেছি। কী হইছে সেটা বল।'

'এখানেই তো নাটকের মোড় ঘুরে গেল। বিজ্ঞানীরা যখন জানলেন মহাবিশ্ব সম্প্রসারণশীল, আর তখনই তাঁরা বুঝে গেলেন, অতীতের কোনো একটা সময়ে বিশ্বজগতের এই সবকিছু একত্রিত অবস্থায় ছিল। তখন তা ছিল, চরম তাপমাত্রা ও অসীম ঘনত্বের অবস্থায়। সেখান থেকে শুরু হয়েছিল তার সম্প্রসারণ, যা আজ বিগ ব্যাং নামে পরিচিত।'

'এসব জ্ঞান আমাকে দিচ্ছিস কেন। স্টিফেন হকিং তাঁর ওয়েবসাইটে বলেছেন, "এই মহাবিশ্ব চিরকাল ধরে অস্তিত্বশীল নয়। নিশ্চয় এই মহাবিশ্ব এবং সময়, ১৫ বিলিয়ন বছর আগে একটি বৃহৎ বিস্ফোরণের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল।"[৩৭] এসব অনেক পুরোনো কথা, নতুন কিছু বল।'

'আচ্ছা, থার্মোডায়নামিক্সের দ্বিতীয় সূত্র কী বলেছে জানেন?'

'কী বলেছে?'

'থার্মোডায়নামিক্সের দ্বিতীয় সূত্র বলছে, মহাবিশ্ব ক্রমাগত ও নিরবচ্ছিন্নভাবে উত্তপ্ত অবস্থা থেকে তাপ বিকিরণ করতে করতে উত্তাপহীন অবস্থার দিকে পৌঁছে যাচ্ছে। ঠিক এক কাপ চা-এর ক্ষেত্রে আমরা যেমন দেখি। তাপ হারাতে হারাতে এক সময় শীতল হয়ে যায়। থার্মোডায়নামিক্সের সূত্র আরও বলে, এভাবে একদিন মহাবিশ্বের সব শক্তি শেষ হয়ে যাবে এবং একসময় তা ধ্বংস হয়ে যাবে। তাহলে আমরা জানলাম এই মহাবিশ্বের শুরু আছে এবং শেষও আছে।'

'আরে ভাইরে, আমি তো তোর কাছে ফিজিক্স শিখতে আসিনি। তুই কী বোঝাতে চাচ্ছিস? '

'আমি বোঝাতে চাচ্ছি, মহাবিশ্বে যা কিছুর শুরু আছে, তার পেছনে অবশ্যই একটা কারণ আছে। আর এটাই হলো Laws of causality কিন্তু আপনারা

---

৩৭. The Beginning of Time, Stephen Hawking http://www.hawking.org.uk/the-beginning of time.html

এই laws of causality-কে ভুলভাবে প্রয়োগ করে থাকেন। মূল কথাটি হলো Everything which has a beginning has a cause অর্থাৎ যেগুলোর শুরু আছে তাদের প্রত্যেকের পেছনে নির্দিষ্ট কারণ আছে।'

'তাতে হয়েছেটা কী?' জাকির ভাইয়ের গলায় বিরক্তির ভাব প্রকাশ পেল।

'কিছু তো একটা অবশ্যই হয়েছে। স্রষ্টা হলেন এমন সত্তা, যিনি সবকিছুই সৃষ্টি করেছেন। যার কোনো শুরু এবং শেষ নেই। অতএব, তাঁর কোনো cause থাকতে পারে না। সো তাকে Laws of causality দিয়ে মাপাটা কি বিজ্ঞানসম্মত? সুতরাং এটা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক এবং অবৈজ্ঞানিক। আচ্ছা হকিং তাঁর কোনো বইয়ে স্থান-কাল (space-time) সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন জানা আছে?'

'না জানার কী আছে, ব্রিফ হিস্ট্রিতে আরকি...'

'বেশ, তাহলে এখন আমার বলতে সুবিধা হবে। হকিং বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, স্থান (space) এবং কাল (time) ব্যতীত কোনো বস্তুর (matter) উৎপত্তি সম্ভব নয়। আবার স্পেস এবং টাইম আলাদা আলাদা কিছুও নয়। স্পেস এবং টাইম দুটো মিলেই একক স্পেসটাইম। দ্বিমত আছে?'

'না, এখানে দ্বিমত থাকার কিছু নেই।'

'ওকে, এবার সামনে যাই। আইনস্টাইনের থিওরি অব রিলেটিভিটিও প্রমাণ করে যে, স্পেসটাইম আবার ম্যাটারের সঙ্গে সম্পৃক্ত। আর Laws of Causality তখনই কার্যকর হয়, যখন স্পেস-টাইম-ম্যাটার-এর উৎপত্তি হয়। আমাদের চিন্তাজগৎও এই স্পেস-টাইম-ম্যাটার পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। এই মহাবিশ্বের সৃষ্টিই হয়েছে স্পেস-টাইম-ম্যাটারের মাধ্যমে। ঠিক?'

'হুম ঠিক।'

'কিন্তু তার আগে কী ছিল? একেবারে শূন্য থেকে তো কিছু সৃষ্টি সম্ভব না। আবার এই বিন্দুই বা কোথায় ছিল? শূন্য এবং সময় এক ধরনের সৃষ্টি, যা আগে ছিল না। এই ব্যাপারে একেকজন বিজ্ঞানী একেক মত দিয়ে যাচ্ছে। কেউই সঠিক কিছু প্রমাণ করতে পারেনি। একেবারে ১০০% বৈজ্ঞানিক প্রমাণভিত্তিক কোনো সমাধান নেই।'

'তা অবশ্য ঠিক। ১০০% বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই।'

'আসলে এই প্রশ্নের উত্তর আমরা ভাবতে পারছি না। কারণ, আমাদের ভাবনার জগৎ স্পেস-টাইম-ম্যাটার পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। তাহলে যিনি এই স্পেস-টাইম-ম্যাটারেরও পূর্বে থেকেই আছেন এবং যিনি এই স্পেস-টাইম-ম্যাটার সৃষ্টি করেছেন, তাঁর কোনোভাবেই Laws of Causality থাকতে পারে না। কারণ, আমাদের স্রষ্টা আল্লাহ্ যার কোনো শুরু এবং শেষ নেই। অতএব, তাঁর কোনো স্রষ্টা বা Cause নেই।[৩৮] বুঝতে পেরেছেন ডিয়ার ব্রাদার?'

'হয়েছে হয়েছে। এই বয়সে অনেক বুঝে গেছিস তুই। শুন অল্প বয়সে এতবেশি পাকলে পরে পস্তাবি বুঝলি।'

একথা বলেই তিনি তড়িঘড়ি করে উঠে চলে গেলেন। আমিও আমার গন্তব্যের উদ্দেশ্যে হাঁটা শুরু করলাম। পেছন থেকে একটি মিষ্টি কণ্ঠের ডাক শুনতে পেলাম, 'এই জাকির...' বুঝতে পারলাম কোন মায়ায় তিনি দ্রুত ছুটে গেলেন।

---

৩৮. প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ, আরিফ আজাদ, পৃষ্ঠা. ৫৪-৫৬

মুসলিম মানেই জঙ্গি

জঙ্গিরা দেখছি এখন বিজ্ঞান চর্চা করছে। বেশ স্মার্ট হওয়া শুরু করেছে। এটা অবশ্য ভালো লক্ষণ। বিজ্ঞান জানলে অজ্ঞতা কেটে যাবে, আর তখনই জঙ্গিবাদের উত্থান রোধ করা সম্ভব হবে। একটা পর্যায়ে বিভ্রান্ত তরুণসমাজ প্রগতিমনা হয়ে উঠবে। এতে করে দেশে মুক্তচিন্তার দ্বার উন্মোচিত হবে। এগুলো ভাবতে ভাবতে চিঠি পড়ায় মন দিলো অ্যান্টনি।

'...এবার তোমাকে বলি ভাইয়া, একটা প্রশ্নের উত্তর দাও তো। তোমরা আমাদের আলেম-ওলামা, ইমাম-খতিবদের ব্যঙ্গাত্মকভাবে মোল্লা মোল্লা করো কেন? আচ্ছা, মোল্লা বলো তাতে ক্ষতি নেই, কিন্তু তাদের প্রতি এত বিরূপ মনোভাব কেন?'

মুখের হাসিটা খুব চেষ্টা করেও আটকাতে পারল না অ্যান্টনি। কেনই বা বিরূপ মনোভাব হবে না? এই তো সেইদিন এক মোল্লাকে মিলাদ[৩৯] পড়ানের জন্য তার অফিসে ডাকা হয়। অফিসের বস নামাজ-রোজা না করলেও মিলাদের ব্যাপারে খুবই যত্নশীল। আর সেই মিলাদে অফিস স্টাফদের থাকা বাধ্যতামূলক। মোল্লা সাহেব মিলাদের ফাঁকে ওয়াজ করতে করতে একটা পর্যায়ে বলে উঠল,

---

৩৯. মিলাদ আরবি শব্দ। এর অর্থ জন্মসময় বা জন্মস্থান। বিশেষ পদ্ধতিতে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি সলাত ও সালাম পেশ করার জন্য এটি একটি নব আবিষ্কৃত পদ্ধতি। এই পদ্ধতি সুন্নাহসম্মত নয়। বরং বিদ'আত। অতএব, প্রচলিত মিলাদ বর্জনীয়। তবে সুন্নাহ মোতাবেক রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি সলাত ও সালাম পেশ করা অনেক ফযিলতের আমল। তা করতে হবে। (সম্পাদক)

'বাবারে, খালেস নিয়তে যদি একবার সুবহানআল্লাহ পড়া যায় তাইলে তামাম জীবনের বেশুমার গুণা মাফ হইয়া যায়। আসমান জমিনের যত ফাঁকা জায়গা আছে বেবাক সোয়াবে পূর্ণ হইয়া যায়।'

'সোবানাল্লা। এই যে একবার বললাম, তাহলে তো আমার তামাম গুনাহ মাফ হয়ে গেছে। এখন তো আমি জান্নাতি, কী বলেন হুজুর? সত্তরটা সুন্দরি হুর পাব, তাই না?' বক্তব্যের মাঝখানে রসিকতার সুরে জানতে চাইল অ্যান্টনি।

'বাবা, শরিয়ত নিয়া এমন মশকরা করে কথা কইলে দোজখে যাইবা।'

'কেন? দোজখে যাব কেন? একবার সোবানাল্লা বলছি না?' অ্যান্টনি কথা শুনে অফিসের কয়েকজন হেসে ফেলল।

'এমন জাহেলি জায়গায় মিলাদ পড়াব না।' বলেই হনহন করে বের হয়ে চলে গেলেন মোল্লা সাহেব।

হুজুরের এভাবে চলে যাওয়া দেখে অনেকের মুখে চাপা হাসির উদ্রেগ হলেও বসের চোখ রাঙানিতে কেউ তা প্রকাশ করতে পারল না।

আরেকদিন রাজধানীর জনপ্রিয় সিটিবাস 'বলাকা' করে সায়দাবাদে যাচ্ছিল অ্যান্টনি। কোন গুণে এত জনপ্রিয়তা, গাড়িতে ওঠার পরেই বুঝতে পারল সে। নির্দিষ্ট কোনো স্টপিজ নেই। পুরো রাস্তাই যেন স্টপিজ। অফিসের গাড়িটি হঠাৎ নষ্ট হয়ে যাওয়ায় বিকল্প কিছু না পাওয়াতে এই বাসে উঠেছিল। অফিসের কলিগেরা প্রায়ই বলেন, বলাকা বাসে না উঠলে জীবনের প্রকৃত অভিজ্ঞতা পাওয়া যায় না। তাঁরা কেন একথা বলে, তা আজ হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। সারা রাস্তায় যাত্রী সার্ভিস ফ্রি। যেখানে ইচ্ছা উঠতে পারে আবার যেখানে খুশি নামতে পারে।

গাড়ি তো নয় যেন সুপার শপের শো-রুম। বই বিক্রেতা, মলম বিক্রেতা, বুট, বাদাম, আমড়া, পপকর্ণ, ওষুধ কোনো কিছুর অভাব নেই। তার ওপর এক মোল্লা বাসে উঠে বেহেশতের টিকিট বিক্রি শুরু করে দিলো। পাশ থেকে একটি বিকট আওয়াজ শোনা গেল, 'আল্লাহর ঘর নির্মাণ করার জন্য একটি-দুটি করে টাকা দিয়া শরিক হয়ে যান, মাহরুম হবেন না। দানকারীরও পিতামাতা...' এই বিরক্তির সময়ও হেসে দিলো অ্যান্টনি। সর্বময় ক্ষমতাবান আল্লার ঘর বানানোর জন্য টাকা ভিক্ষা? হা হা... আল্লার এতই অভাব? এগুলোই কি মোমিনদের কোরান-হাদিসে লেখা আছে?

আরে বাবা আল্লার জন্য রাস্তাঘাটে ভিক্ষা করার দরকার কী? যারা নামাজ পড়বে তারা নিজেরাই টাকা দিয়ে মসজিদ বানিয়ে নামাজ পড়বে। এসব ভাবতে ভাবতেই টিকিটওয়ালা একটি হাত অ্যান্টনি মুখের সামনে চলে এলো। পরক্ষণে ভিড় ঠেলেই হাতটির মালিক হাজির। কথা বলার সুযোগ না দিয়েই বলতে শুরু করল,

'আল্লাহর ঘর নির্মাণের জন্য কিছু টাকা দিয়ে শরিক হয়ে যান।'

'এখানে আমার টাকা দিয়ে কী হবে?'

'বাবা, মসজিদের কাজ চলছে। তিন তলা কমপ্লিট। চার তলার ছাদ ঢালাই বাকি আছে।'

'এত মসজিদ বানিয়ে কী হবে। শুধু মসজিদ বানান নাকি এই টাকাগুলো বিশেষ কাজে অর্থায়ন করেন? এই মসজিদগুলোই জঙ্গি তৈরির কারখানা। এগুলোর কারণেই দেশে জঙ্গিদের উৎপাত বেড়ে গেছে।'

হুজুর টাকা না পেয়েও কোনো একটা দুআ পড়তে পড়তে চলে গেল। এ দুআ আমাকে বেহেশতে নিয়ে গেল নাকি দোজখে পাঠিয়ে দিলো কিছুই বুঝলাম না। মনে মনে কথাগুলো চিন্তা করল অ্যান্টনি।

সে যাই হোক, মিরাজ এখানে কী বলেছে সেটাই এখন দেখার বিষয়। অনিচ্ছা সত্ত্বেও পড়তে শুরু করল অ্যান্টনি।

...আচ্ছা একটিবার পরিচ্ছন্ন মনে চিন্তা করে বলো তো; কোনো মোল্লাকে কোনো দিন স্কুল কলেজ গেইটে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছ? ইভটিজিং করতে দেখেছ? কোনো দিন দেখেছ অন্যের বউ নিয়ে পালিয়ে যেতে? কোনো ধর্ষণ মামলায় ধরা খেতে? চুরি, ডাকাতি, খুন, রাহাজানিতে? দুর্নীতির অভিযোগে কোনো মোল্লাকে দুদক ধরেছে? কোনো মোল্লার অবৈধ প্লাজা ভেঙে শত শত মানুষ মরেছে? দেখনি। তাহলে কেন তাদের প্রতি তোমাদের এত বিদ্বেষ?

আচ্ছা যাহোক, তোমরা বলো মোল্লারা হচ্ছে মৌলবাদী, জঙ্গি, চরমপন্থি, সন্ত্রাসী ইত্যাদি। আচ্ছা, তোমাকে পৃথিবীর ইতিহাসের কয়েকজন শীর্ষ হত্যাকারীর তালিকা দিচ্ছি—

সি/নং	নাম	ধর্ম	হত্যার সংখ্যা (প্রায়)
১	মাও সে তুং	নাস্তিক	৪ কোটি ৫০ লক্ষ[৪০]
২	জোসেফ স্ট্যালিন	নাস্তিক	২০-৬০ মিলিয়ন[৪১]
৩	হিটলার	খ্রিষ্টান	১ কোটি ৭০ লক্ষ[৪২]
৪	লিওপল্ড	খ্রিষ্টান	১ কোটির বেশি[৪৩]
৫	পল পট	নাস্তিক	৩০ লক্ষ[৪৪]
৬	কিম ইল সাং	নাস্তিক	১৬ লক্ষ[৪৫]
৭	মেনপিস্টু হেইলি মারিয়াম	নাস্তিক	১০ লক্ষ[৪৬]
৮	জর্জ ডব্লু বুশ	খ্রিষ্টান	১০ লক্ষ[৪৭]

এবার তুমিই বলো, এই শীর্ষ হত্যাকারীদের মধ্যে কয়জন মোল্লা আছে? তুমি তো মুক্তমনা হিসেবে নিজেকে দাবি করো, সুতরাং বুঝতে কষ্ট হওয়ার কথা না। কিন্তু তুমি যদি চোখ খুলে ঘুমাও, তাহলে আমার কিছু বলার নেই। কারণ, এই চোখ খুলে ঘুমানোটা হচ্ছে ওয়ান কাইন্ড অফ টেরোরিজম।

এবার আসি জঙ্গি প্রসঙ্গে। আচ্ছা, তোমরা তো বলো, মোল্লারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের কিছু বুঝে না, শুধু তোমরাই বুঝো! তাহলে তোমাদের বুঝের সীমাটা এত নিচু কেন? যদি বুঝটা সঠিক মাত্রার হয় তাহলে তো জানার কথা; জঙ্গি ও জঙ্গিবাদ শব্দদ্বয় ইংরেজি (militant, militancy) শব্দদ্বয়ের অনুবাদ। ইদানিং এগুলো আমাদের মধ্যে অতি পরিচিত ও অতি ব্যবহৃত। শব্দগুলো কিছু দিন আগেও এত প্রচলিত ছিল না। আর ব্যবহারিকভাবে এগুলো নিন্দনীয় বা খারাপ অর্থেও ব্যবহৃত হতো না। শাব্দিক বা রূপকভাবে যোদ্ধা, সৈনিক বা যুদ্ধে ব্যবহৃত বস্তু বোঝাতে

---

৪০. http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/books/news/maos-great-leap-forward-killed-45-million-in-four-years-2081630.html

৪১. http://www.ibtimes.com/how-many-people-did-joseph-stalin-kill-1111789

৪২. http://www.bbc.co.uk/history/worldwars/genocide/holocaust_overview_01.shtml

৪৩. http://www.documentarytube.com/articles/king-leopold-iithe-man-who-killed-more-than-10-million-people-yet-is-not-not-seen-as-repulsive

৪৪. https://en.wikipedia.org/wiki/Pol_Pot

৪৫. https://www.hawaii.edu/powerkills/SOD.CHAP10.HTM

৪৬. http://www.independent.co.uk/news/world/africa/mengistu-found-guilty-of-ethiopian-genocide-428233.html

৪৭. http://web.mit.edu/humancostiraq/HOW%20MANY%20DIED,%20BUSH.html

এ শব্দগুলো ব্যবহার হতো। তুমি কি জানো, ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার কমান্ডার ইন চিফকে সম্মান করে 'জঙ্গিলাট' বলা হতো।[৪৮] অন্যদিকে শক্তিমত্তা বা উগ্র বোঝাতেও এ শব্দ ব্যবহার করা হয়।

এবার তোমার হাতের কাছে যদি অক্সফোর্ড ডিকশনারি থাকে তাহলে সেটাতে একটু চোখ বুলিয়ে নাও। সেখানে এই শব্দটির অর্থ দেওয়া আছে, 'যে ব্যক্তি তার উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য শক্তি বা জোরালো প্রভাব ব্যবহার করা সমর্থন করে।'[৪৯] ওয়েবস্টার ডিকশনারিতে বলা হয়েছে, 'যুদ্ধ বা সম্মুখসমরে লিপ্ত ব্যক্তি, উগ্রভাবে সক্রিয়।'

দ্বিতীয় অর্থটিকে আরও একটু ব্যাখ্যা করে মাইক্রোসফট এনকার্টা অভিধানে জঙ্গি শব্দের অর্থে বলা হয়েছে, 'আগ্রাসী, কোনো বিষয়ের পক্ষে বা সমর্থনে চরমভাবে সক্রিয়, যা প্রায়শ চরমপন্থা পর্যন্ত পৌছায়।'

এ সকল অর্থ কোনোটিই সরাসরি বেআইনি অপরাধ বোঝায় না। এসব অর্থ বিচার করলে দেখা যায়, গোটা পৃথিবীর সকল রাজনৈতিক, আদর্শিক, পেশাজীবী ও সামাজিক দলই মিলিট্যান্ট বা জঙ্গি।

কারণ, সকলেই উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য শক্তি বা প্রেসার প্রয়োগ পছন্দ করে এবং সকলেই তাদের নিজেদের আদর্শ ও স্বার্থ রক্ষায় বা প্রতিষ্ঠায় উগ্রভাবে সক্রিয়। তবে প্রয়োগক্ষেত্র অনুযায়ী অর্থ ভিন্ন। যেমন, কেউ হতে পারে শান্তিকামী জঙ্গি আবার কেউ অশান্তিকামী।

কিন্তু বর্তমানে জঙ্গি বলতে শুধু বেআইনি সহিংসতা ও খুনখারাপীকেই বোঝায়। অথচ তা নয়; বরং বেআইনি বা আইনসম্মত যেকোনো প্রকারের উগ্রতা বুঝাতে জঙ্গি ও জঙ্গিবাদ শব্দদ্বয় ব্যবহার করা হয়। চরমপন্থা ও চরমপন্থি শব্দদ্বয়ও সরাসরি বেআইনি কর্মকাণ্ড বোঝায় না।

তোমরা জঙ্গিবাদ শব্দটি কোনোরূপ ভাষাগত ভিত্তি ছাড়াই 'ইসলামের নামে সহিংসতা' অর্থে ব্যবহার করে যাচ্ছ। অথচ মূল ভাষাগত অর্থে ইসলামের নামে, অন্য কোনো ধর্মের নামে, তোমাদের ধর্মনিরপেক্ষতার নামে, গণতন্ত্রের নামে, সমাজতন্ত্রের নামে, অন্য যেকোনো মতবাদ, আদর্শ বা অধিকারের নামে

---

৪৮. সংসদ বাংলা-ইংরেজি অভিধান; শ্রী শৈলেন্দ বিশ্বাস, পৃ : ৪৬২

৪৯. A.S Hornby, Oxford Advenced Learner's Dictionery.

উগ্রতার আশ্রয় গ্রহণকারী মানুষকে জঙ্গি বলা চলে এবং তার মতামতকে জঙ্গিবাদ বলা চলে। ইংরেজি ব্যবহার এটিই প্রমাণ করে।[৫০]

আবার প্রয়োগক্ষেত্র সবার জন্য সমান হয় না। এবার তুমি বিভিন্ন স্বাধীনতা আন্দোলনের দিকে তাকালে এর মর্মার্থ বুঝতে পারবে।

যেমন : ফিলিস্তিনি যুবকগণ যখন সশস্ত্র ইসরায়েলি সৈন্যদের প্রতি ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে অথবা ফিলিস্তিনি মুক্তিযোদ্ধাগণ যখন সশস্ত্র ইসরায়েলিয় সৈন্যদেরকে হামলার জবাবে পালটা আক্রমণ করে, তখন তোমরা তাদেরকে সন্ত্রাসী-জঙ্গি বলে আখ্যায়িত করো। অথচ 'অযোদ্ধা' নিরস্ত্র ফিলিস্তিনি শিশু ও নারীপুরুষদের প্রতি ইসরায়েলি সৈন্যদের গুলি ছোড়া, বোমা নিক্ষেপ ইত্যাদি কর্মকাণ্ডকে তোমরা কিছুই মনে করো না; বরং আত্মরক্ষার স্বাভাবিক অধিকার বলে মনে করো।

নেপালে মাওবাদীদেরকে সন্ত্রাসী-জঙ্গিবাদী তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু জনগণ তাদেরকেই পছন্দ করেছে, জনগণের কাছে তারাই ছিলো মুক্তিকামী।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে পাকিস্তান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সর্বদা সন্ত্রাসী বা জঙ্গিবাদী বলে আখ্যায়িত করেছে কিন্তু আমাদের কাছে এই যোদ্ধারা হলো মুক্তিকামী এবং সম্মানিত।

নেলসন ম্যান্ডেলা যাদের কাছে শান্তিকামী, ঠিক তার বিপরীত মানুষের কাছে তিনি অশান্তিকামী। এ জন্য বলা হয়, 'One man's terrorist is another man's freedom fighter'। এখন বলো, এই শব্দগুলোকে ঢালাওভাবে তোমরা যেভাবে মুসলিমদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে চলছ, আসলে কি তা মুক্তমনার পরিচয়?

ভাইয়া, এই যদি হয় তোমাদের মুক্তমনা তবে দুঃখিত, মুক্তমনা হতে পারলাম না। তবে হ্যাঁ, একথা সত্য যে সব বর্ণে, গোত্রে, জাতিতে, ধর্মে, সংগঠনে কিছু না কিছু কুলাঙ্গার আছেই। কিছু লোক আছে যারা দাড়ি, টুপি পরে মোল্লা সেজে নিজ স্বার্থের জন্য কাজ করে যাচ্ছে আর তোমাদের সেক্যুলার মিডিয়াও প্রচার করে যাচ্ছে, এরা হলো মুসলিম জঙ্গি। কিন্তু কয়েকজন লোকের কারণে কোনো নির্দিষ্ট ধর্ম, বর্ণ বা সংগঠনকে ঢালাওভাবে নিন্দা করা কি মুক্তমনের পরিচয় হতে পারে? মসজিদ থেকে যদি জুতা চুরি হয়ে যায়, তার মানে এই না,

---

৫০. ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ', ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর। পৃ : ৯-১২

মুসল্লি চোর হয়ে জুতা চুরি করেছে; বরং চোরই মুসল্লি সেজে জুতা চুরি করেছে। একজন চোরের জন্য সব মুসল্লি চোর হয়ে গেল?

তোমাকে একটি কথা মনে করিয়ে দিই, তোমাদের শিরোমণি যিনি খুব মুক্তমনার পরিচয় বহন করেন, তসলিমা নাসরিন। তিনি বলেছেন, 'এখনও কোরানের জোরপূর্বক শিক্ষা হচ্ছে, সূর্য পৃথিবীর চারপাশে ঘুরছে। কীভাবে এই অবৈজ্ঞানিক শিক্ষা নিয়ে আমরা উন্নয়ন করতে পারি?'[৫১]

কিন্তু দেখো, এমন কথা কুরআনের কোথায় বলা হয়েছে? সে কিন্তু কোনো রেফারেন্স দেয়নি। এখন যারা কুরআন পড়েনি অথবা যারা কুরআন সম্পর্কে তেমন একটা জানে না, তারা কুরআনের ৬ হাজারেরও বেশি আয়াতের মধ্যে কীভাবে যাচাই করে দেখবে? এই কারণে অনেকেই যাচাই না করেই বিশ্বাস করে নেয়। তবে তার দ্বিতীয় কথার সঙ্গে আমরা সবাই একমত, কোনো ধর্মগ্রন্থে যদি অবৈজ্ঞানিক কিংবা ভুল কথা থাকে, তাহলে তা দিয়ে উন্নতি সম্ভব নয়। কারণ, স্রষ্টা তো ভুল করতে পারেন না। যদি ধর্মগ্রন্থে কোনো প্রকার ভুল থাকে, তাহলে তা স্রষ্টার বাণী হতেই পারে না।

এখন তুমি দেখবে, কুরআন অবৈজ্ঞানিক কথা বলেছে, নাকি তসলিমা নাসরিন কুরআনের নামে মিথ্যা বলেছে।

এটা সকলেরই জানা কথা, ১৫১২ সালে বিজ্ঞানী কোপার্নিকাস তাঁর 'সূর্য কেন্দ্রিক গ্রহসংক্রান্ত গতিতত্ত্ব' দিয়ে বলেছিলেন, সূর্য কেন্দ্রে স্থির। তারও অনেক পরে ১৬০৯ খ্রিষ্টাব্দে জার্মান বিজ্ঞানী কেপলার তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'অ্যাস্ট্রনোমিয়া নোভা'-তে গ্রহগুলোর নিজস্ব কক্ষপথে প্যারালাল (ডিম্বাকৃতিভাবে) অসম ঘূর্ণন গতি ব্যাখ্যা করে।

তখনও সূর্য স্থির বলেই সবার জানা ছিল। এমনকি আমরা বিজ্ঞান বইয়েও পড়েছি সূর্য স্থির এবং সূর্যের চারপাশে অন্যান্য গ্রহগুলো ঘুরছে। সূর্য স্থির এই কথা এখন ভুল প্রমাণিত হয়েছে। ডব্লু. কে. হার্টম্যান তাঁর *অ্যাস্ট্রনোমি দ্যা কসমিক জার্নি* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, আমাদের ছায়াপথ মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সিতে সূর্য তার নিজ কক্ষপথে ঘুরে। একবার গোটা কক্ষপথ ঘুরে আসতে সূর্যের সময় লাগে ২৫ কোটি বছর।

---

[৫১]. The Time Magazine, 31 January- 1994

অথচ সাড়ে চোদ্দোশো বছর আগে সূরা ইয়াসিনের ৩৮ নং আয়াতে কুরআন বলছে, 'সূর্য ভ্রমণ করে তার নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে। এটা মহাপরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী সত্তার নিয়ন্ত্রিত হিসেব।' এরপর সূরা আম্বিয়ার ৩৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে, 'তিনি (আল্লাহ) সৃষ্টি করেছেন দিন এবং রাত, সূর্য এবং চন্দ্র। আর প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণ করে।'

দেখো, কুরআন কোথাও বলছে না সূর্য পৃথিবীর চারপাশে ঘুরছে। কুরআন বলছে সবকিছুই ঘুরছে অর্থাৎ সূর্য, পৃথিবী, গ্রহ, নক্ষত্র সবকিছুই ঘুরছে। কুরআন সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক এবং অনেক বেশি এগিয়ে। এবার তুমিই বলো, কুরআন অবৈজ্ঞানিক নাকি তসলিমা নাসরিন কুরআনের নামে মিথ্যা অভিযোগ তুলেছে?

ক্লিয়ার কাট উত্তর ইতোমধ্যে পেয়ে গেছ। শুধু কি তাই? ওই একই সময়ে তসলিমা নাসরিন বলেছিল, ইসলামের কারণে প্রতি বছর বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণে মেয়ে শিশু হত্যা করা হয়। অথচ এই কথাটি একেবারেই ভিত্তিহীন। কারণ, ইসলামই মেয়ে শিশুকে নিরাপত্তা দিচ্ছে।

ভাইয়া আমি জানি, সম্ভবত ভুল ধরার জন্য একটা কুরআন তুমি নিজের কাছে রেখেছ। যদি কুরআনের কোনো কপি তোমার কাছে থাকে তাহলে আমার দেওয়া রেফারেন্সগুলো মিলিয়ে নিতে পারো। সূরা তাকভির, আয়াত ৮-৯ নং-এ বলা হয়েছে, 'যখন জীবন্ত পুতে ফেলা কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে, কী অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল?'

এ ছাড়াও কুরআনের সূরা নাহল-এর ৫৮ এবং ৫৯ আয়াতে সেসব লোকের কঠোরভাবে নিন্দা করা হয়েছে, যারা কন্যা সন্তানের সংবাদ পেয়ে অসন্তুষ্ট হয়। আবার নবি করিম ﷺ বলেছেন, 'যাকে কন্যা সন্তানের ব্যাপারে কোনোরূপ পরীক্ষা করা হয়, সে কন্যা সন্তান তার জন্য জাহান্নামের আগুন হতে প্রাচীর হয়ে দাঁড়াবে।'[৫২] তিনি আরও বলেছেন, 'তোমাদের ওপর হারাম করা হয়েছে মায়ের নাফরমানি করা, কন্যা সন্তান জীবন্ত কবর দেওয়া (হত্যা করা)।'[৫৩] ইসলাম কন্যা সন্তানের প্রতি দায়িত্ববান হতে আরও উৎসাহিত করছে, হত্যা করছে না। তবুও যদি বলো, ইসলাম কন্যা সন্তান হত্যার জন্য দায়ী! তাহলে একটি প্রশ্ন করি?

---

৫২. সহিহ বুখারি, হাদিস নং-১৪১৮ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স)
৫৩. সহিহ মুসলিম, হাদিস নং- ৪৩৩৪ (ইফা)

এমিলি বেকাননের নাম শুনেছ? একজন বিখ্যাত ব্রিটিশ রিপোর্টার। তাঁর দেওয়া রিপোর্ট অনুযায়ী প্রতি বছর আমাদের পাশের দেশ ইন্ডিয়াতে ন্যূনতম 'দশ লাখ' গর্ভপাত ঘটানো হয়; যখন জানতে পারে গর্ভের শিশুটি কন্যা।[৫৪] ডিন নেলসন বিখ্যাত পত্রিকা *দ্যা ডেইলি টেলিগ্রাফ*-এ কি বলেছেন জানো? তিনি বলেছেন, 'একটি মেয়ে শিশু জন্মের জন্য, সারা বিশ্বের মধ্যে ইন্ডিয়া খুবই বিপজ্জনক একটি রাষ্ট্র।'[৫৫]

এবার বলো ইন্ডিয়া তো হিন্দুপ্রধান দেশ এবং সে দেশের শাসকও হিন্দু, তাহলে সেই দেশের কেন এই অবস্থা?

উত্তর দিতে পারবে? নাহ, পারবে না। কারণ, তোমাদের মতো মুক্তমনাদের উত্তর মনের ভেতরই যুক্ত থাকে, বেরিয়ে আসতে পারে না। আচ্ছা যাক, আসল কথা বলি। তুমি দেখতেই পেলে কুরআন বা ইসলামের নামে দেওয়া তসলিমা নাসরিনের অভিযোগগুলো একেবারেই ভিত্তিহীন, মিথ্যা অপপ্রচার।

এবার আমি যদি তসলিমা নাসরিনের উপমা দিয়ে তোমাদের সবাইকে একযোগে মিথ্যুক, ভণ্ড ইত্যাদি খারাপ সম্বোধন করি, আর মাও সেতুং, জোসেফ স্ট্যালিন, হেইলি মারিয়াম-এর বরাতে সবাইকে খুনি বলি তাহলে সেটা তুমি অবশ্যই মুক্তচিন্তা বলে মেনে নেবে না। তাহলে মোল্লাদের প্রতি তোমাদের দেওয়া ঢালাও অভিযোগগুলোও নিশ্চয় মুক্তমনা ও মুক্তচিন্তার শর্ত মেনে চলে না। আশা করি যথেষ্ট হয়েছে। এবার তুমি চরমপন্থি মুক্তমনা হতে যথাসাধ্য চেষ্টা করো ভাইয়া।'

---

[৫৪]. Toon Peter D. Daughters, doctors, and death: BBC 2 Assignment "Let Her Die," 28 Sep 1993, BMJ. 1993

[৫৫]. The Daily Telegraph, 25 June 2015

স্রষ্টায় বিশ্বাসীরা সত্যিই মানসিক রোগী

জেনেফা এখনও গির্জা থেকে আসেনি। এর মধ্যে অ্যান্টনির খানিকটা অস্থিরতা বেড়ে গেছে। অথচ এমনটি হওয়ার কথা ছিল না। আজকের এই অস্থিরতা তাকে ভাবিয়ে তুলল। মৌলবাদীদের কোনো যুক্তি কখনোই তার মনে বিন্দুমাত্র প্রভাব ফেলতে পারেনি। সে যে যুক্তি এবং বিজ্ঞান অন্তরে লালন করে তাকে কেউ কখনোই প্রশ্নবিদ্ধ করতে পারেনি। অ্যান্টনি বুঝতে পারল, তার এখন অস্থিরতা কমানো দরকার। তাই প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করে দুই ঠোঁটের মধ্যে গুঁজে দিলো।

...সোমবার। দেখা করতে গিয়েছিলাম জাকির ভাইয়ের সঙ্গে। আমি যাওয়ার আগে থেকেই তিনি এক ভদ্রলোকসহ বসে ছিলেন। বুঝতে পারলাম, তারা আমাকে দূর থেকে দেখেই মুচকি মুচকি হাসছিলেন। কাছে যাওয়া মাত্রই জাকির ভাই সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। বুঝলাম তিনি তার খুব কাছের বন্ধু। ভদ্রলোককে আমি আগে কখনো দেখিনি, তুমিও হয়তো চিনবে না। উনার নাম মহিউদ্দিন, সাবের মহিউদ্দিন। জাকির ভাইয়ের নব্য ফিলোসোফার বন্ধু। এখানে উনি তার নানার বাড়ি বেড়াতে এসেছেন। একই মতাদর্শ লালন করায় জাকির ভাইয়ের সঙ্গে খুব দ্রুতই খাতির জমে উঠেছে। প্রাথমিক আলোচনার পরে মনে হলো ফিলোসোফার সাহেব আমাকে নিয়ে বেশ ভালোই গবেষণা করেছেন। সবই জাকির ভাইয়ের অবদান। যাক সেসব কথা। তোমার জ্ঞাতার্থে আমাদের সেই দিনের কনর্ভাসেশনটা তুলে ধরলাম...

'ইয়াংম্যান, হাউ আর ইউ?'

'আলহামদুলিল্লাহ ভালো। তবে সর্বদাই যদি আল্লাহর দেওয়া বিধি-নিষেধ মেনে চলতে পারি, তাহলে সামনের দিনগুলো আরও ভালো কাটবে ইনশাআল্লাহ।'

'হা...হা... আল্লা। শুনেছি তুমি ধর্মান্ধ হয়ে গেছ, কিন্তু এতটা হয়ে গেছ তা বুঝতে পারিনি। কথায় কথায় আল্লা আল্লা, বিরক্তিকর। আচ্ছা, তোমাদের এই আল্লাটা কে?'

'আল্লা নয়, আল্লাহ বলুন ভাইয়া। নামের বিকৃতি ঘটানো তো কোনো ভালো কাজ নয়। ও হ্যাঁ, আল্লাহ হলেন সেই সর্বশক্তিমান মহান সত্তা, যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন। শুধু আমাদের নয়, এই বিশ্বজগতের সবকিছুই তিনি সৃষ্টি করেছেন এবং রক্ষণাবেক্ষণও করছেন।'

'সর্বশক্তিমান? আর ইউ শিওর?' বেশ অবাক হয়ে বললেন মহিউদ্দিন ভাই।

'অফকোর্স। কোনো সন্দেহ নেই।'

'আচ্ছা, বেশ। যদিও স্রষ্টায় বা ধর্মে বিশ্বাস একটি মানসিক রোগ ছাড়া কিছুই না, তবুও আমি সেদিকে যেতে চাচ্ছি না।'

'এক্সকিউজ মি ভাইয়া, কী বললেন আপনি? স্রষ্টায় বিশ্বাস একটি মানসিক রোগ? জানতে পারি কি, আপনার কেন এমনটা মনে হচ্ছে?'

'এইটা শুধু আমার কাছে মনে হয়নি, বৈজ্ঞানিকভাবেও প্রমাণিত। ঊনবিংশ শতাব্দীর সাড়া জাগানো অস্ট্রিয়ান সাইক্রিয়াটিস্ট সিগমন্ড ফ্রয়েড, নাম শুনেছ কখনো। তিনি একটি থিওরি প্রস্তাব করেছিলেন। এ থিওরি অনুযায়ী তিনি আত্মার অস্তিত্বকে অস্বীকার করেন এবং বলেন, স্রষ্টায় বিশ্বাস করা একটা মানসিক রোগ ছাড়া কিছুই নয়।'

'ও... এই কথা? আপনার ফ্রয়েডতত্ত্বে একটু পরে আসছি। তার আগে একটা প্রশ্ন করি। আচ্ছা আপনি কি জানেন, ধর্মে বিশ্বাস ছাড়া পৃথিবীতে কোনো মানুষ নেই। এমনকি আপনারা যারা স্বঘোষিত অবিশ্বাসীদের তালিকায়, তারাও নন।'

'কীভাবে?' বেশ আশ্চর্য হয়ে বললেন জাকির ভাই। মনে হলো তাদের বদ্ধমূল চিন্তায় একটা কুঠারাঘাত পড়ল।

'এই যে হিন্দুরা পূজা করার মাধ্যমে তাদের দেবতাদের সম্মান করে। তাদের মতে এটা ঈশ্বরের নির্দেশ, সেভাবেই সম্মান জানাতে হবে। খ্রিষ্টানরাও তাদের ধর্মীয় রীতি-নীতি মেনেই যিশুকে সম্মান করে। আর আমরা যারা মুসলিম, তারা এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহকে বিশ্বাস করি। আর সেই বিশ্বাসের দাবি অনুযায়ী তাঁর নির্দেশ মেনে তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করি। এটাই আমাদের ইবাদত। ঠিক বলছি কি না?'

'হুম।' মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিলেন দুজনই।

'আপনারাই বলেন এসব অযৌক্তিক কর্মকাণ্ড। আবার আপনারাই গ্রিক মূর্তিকে ন্যায়বিচারের প্রতীক মনে করে সম্মান করেন? সেই আপনারাই ইট-পাথরে নির্মিত ভাস্কর্যের সামনে ফুল দিয়ে দেশের কল্যাণ কামনা করেন। সেই নির্জীব বেদিগুলোকে পবিত্র বলে বিশ্বাসও করেন। আবার কোর্ট প্রাঙ্গণ থেকে মূর্তি সরানোর সময় অনশন করে নাকের পানি, চোখের পানি একাকার করে ফেলেন। কেন একটা দেবীর জন্য এত মায়া, এত আবেগ, এত সম্মান?'

'এটা তো আসলে শিল্পের প্রতি অবচেতন মন থেকে একটা সম্মান মাত্র।'

'যদিও আপনাদের শিল্পগুলো অধিকাংশ সময় নারী অঙ্গের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে তবুও সেই প্রসঙ্গে যাচ্ছি না। এই অবচেতন সম্মানটাই আপনাদের ধর্ম। মসজিদে অবমাননা করলে আমরা মুসলিমদের যেমন লাগে, গ্রিক দেবীর মূর্তি সরানোর বেলায়ও আপনাদের তেমন কষ্ট লেগেছে। এটাই ধর্ম। ধর্ম ছাড়া কোনো মানুষ নেই, বুঝলেন ভাইয়া? প্রত্যেকের একটা ব্যক্তিগত বিশ্বাস আছে, সেই বিশ্বাসটাই তার ধর্ম।'

'তোর এই কথা আমি মানতে পারলাম না। বাদ দে তো এসব।' বিরক্তি সহকারে বললেন জাকির ভাই।

'কোনো কথাই তো মানতে দেখলাম না। আচ্ছা বাদ দিলাম, এবার মহিউদ্দিন ভাইয়ের মানসিক রোগের ব্যাপারে আসি।'

আমি কথাটি বলেই জিহ্বায় কামড় দিলাম। জাকির ভাই আমার কথা শুনে হাসতে লাগলেন। মহিউদ্দিন ভাই কিছুটা উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'আমার মানসিক রোগ নয়; বলো, তোমাদের মতো ধার্মিকদের মানসিক রোগ।'

'আমি দুঃখিত ভাইয়া। যাহোক, ওই মানসিক রোগের ব্যাপারেই এবার বলি। আপনি কি জানেন, অধিকাংশ মনোবিজ্ঞানী, যারা ফ্রয়েডের ধারণাকে সত্য বলে মনে করেছিলেন, তারা পরবর্তী সময়ে নিজেদের কৃত গবেষণা দ্বারাই ভুল বুঝতে পেরেছেন।'

'তাই নাকি!' বামপাশের ভ্রূটি কুচকিয়ে ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে জানতে চাইলেন ফিলোসোফার ভাইয়া।

'হ্যাঁ, তাই। তারা আরও বুঝতে পেরেছেন যে, ফ্রয়েড সাহেবের তত্ত্বের কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তিই নেই! যারা এ সত্য বুঝতে পেরেছেন তাদের মধ্যে একজন হলো মার্কিন নাগরিক প্যাট্রিক গ্লাইন। তিনি কি বলেছেন জানেন?'

'মহিউদ্দিন ভাই পুনরায় ভেংচি কেটে বললেন, 'তুমিই বলে দাও বাবু।'

'গ্লাইন বলেছেন, "বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসে মনে হয়েছে, আধুনিক মনোবিজ্ঞান ধর্মের সঙ্গে নতুন প্রেক্ষাপটে, নতুন করে বোঝাপড়া করছে। এতে প্রমাণিত হয়েছে, মানুষের মানসিক স্বাস্থ্যের ব্যাপারে নিখাদ বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি শুধু তাত্ত্বিকভাবে নয়, ব্যবহারিকভাবেও ব্যর্থ।"[৫৬] এই উক্তিটি আজকের আগে কখনো শুনেছেন কি?'

হ্যাঁ–না কিছুই না বলে ঝিম ধরে আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকাকেই শ্রেয় মনে করলেন বন্ধুযুগল। আমি কথা চালিয়ে গেলাম...

'আচ্ছা, "ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর হেলথ কেয়ার রিসার্চ" সম্পর্কে জানেন?'

'হুম, জানব না কেন? বিশাল কারবার। স্বাস্থ্য বিষয়ক জটিল সব গবেষণা এখানেই করা হয়।' বেশ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গেই উত্তর দিলেন জাকির ভাই।

'এই ইনস্টিটিউটেরই গবেষক ও বিজ্ঞানী ড. ডেভিড লারসন ও তাঁর সঙ্গীদের দ্বারা পরিচালিত একটি জরিপ থেকে বের হয়ে এসেছে যে, "যারা নিয়মিত প্রার্থনা করে তাদের হৃদরোগ হওয়ার সম্ভাবনা, যারা প্রার্থনা করে না, তাদের তুলনায় মাত্র ষাট শতাংশ।"

---

[৫৬]. God: The Evidence, The Reconciliation of Faith and Reason in a Post-secular World. (patrick Glyn)

অন্যদিকে নিয়মিত প্রার্থনাকারী নারীদের আত্মহত্যার প্রবণতা, যারা নিয়মিত প্রার্থনা করে না, তাদের তুলনায় অর্ধেক। ওই জরিপ থেকে আরও জানা যায়, যেসব ধূমপায়ী নিজেদের জীবনে ধর্মকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে না, তাদের সুস্থ থাকার সম্ভাবনা, যারা নিজেদের জীবনে ধর্মকে গুরুত্ব দেয়, সেসব ধূমপায়ী তুলনায় সাত গুণেরও কম।[৫৭] এখন কথা হলো, এরকম কেন হয়, বলতে পারেন?'

এবারও ওনারা আগের মতোই নিশ্চুপ থাকার ধারাবাহিকতা বজায় রাখলেন।

আমি বলেই চললাম, 'বস্তুবাদী মনোবিজ্ঞানীরা এগুলোকে ব্যাখ্যা করেন এক প্রকার সাইকোলজিক্যাল কারণ হিসেবে। এ ব্যাখ্যানুযায়ী; স্রষ্টায় বিশ্বাস মানুষের মনোবল বৃদ্ধি করে এবং এ কারণে সে শান্তি লাভ করে। তিনি ধর্মীয় বিশ্বাস ও স্বাস্থ্যের মধ্যে সম্পর্ক নিরূপণের জন্য ভিন্ন একটি গবেষণা করেছিলেন। অথচ তিনি নিজেই ধর্মবিশ্বাসী ছিলেন না।'

'তো তাঁর গবেষণায় কী তথ্য এসেছে, এত ভনিতা না করে বলে ফেল।' জানতে চাইলেন জাকির ভাই।

'তিনি তাঁর গবেষণায় দেখতে পান যে, স্রষ্টায় বিশ্বাস মানুষের ওপর যতটা ইতিবাচক প্রভাব ফেলে অন্য কোনো বিশ্বাস তা পারে না। তিনি বলেছেন, "আমি গবেষণা করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি, স্রষ্টায় বিশ্বাস মানুষের মনকে যতটা প্রশান্ত করতে পারে, অন্য কোনো ধরনের বিশ্বাস ততটা প্রশান্ত করতে পারে না।"'[৫৮]

'তো হয়েছেটো কী!' নিজের বাম হাতটাকে তার মুখের সামনে এনে একটা মোচড় দিয়ে বললেন মহিউদ্দিন ভাই।

'দেখুন, আমি কিন্তু আগেই বলেছি তিনি বস্তুবাদী গবেষক ছিলেন। আবার তিনি নিজেই আরেক জায়গায় বলেছেন, "মানুষের মন ও দেহকে স্রষ্টার জন্য একই সূত্রে বাঁধা হয়েছে।"[৫৯] সুতরাং ধর্মবিশ্বাস যে মানসিক অসুস্থতা আপনার এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।'

---

৫৭. God: The Evidence, The Reconciliation of Faith and Reason in a Post-secular World. patrick Glyn ; page-80-81

৫৮. Timeless Healing, Herbert Benson and Mark Stark; page-203

৫৯. Timeless Healing, Herbert Benson and Mark Stark; page-193

আমার কথা শুনে তারা খুশি হতে পারলেন না। কথা বলার সুযোগ না দিয়ে পুনরায় জিজ্ঞাস করলাম, 'গ্লাইন আরও কি বলেছেন জানেন?'

'বলতে থাকো।' বেশ গুরুগম্ভীর গলায় বললেন মহিউদ্দিন ভাই।

'তিনি বলেছেন, "বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে মনোবিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি বিজ্ঞানীরা খুব একটা সদয় ছিলেন না।" এ সময় প্রমাণিত হয়ে যায়, ধর্ম সম্পর্কে ফ্রয়েডের যে দৃষ্টিভঙ্গি তা ছিল সম্পূর্ণ প্রতারণাপূর্ণ। অর্থাৎ বিগত পঁচিশ বছর ধরে মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে গবেষণা হয়েছে, তা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে, ধর্ম মানসিক রোগ বা মানসিক রোগের উৎস নয়। বরং ধর্ম মানুষের সুখ ও মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য অন্যতম প্রয়োজনীয় উপাদান।

ক্রমাগত গবেষণায় স্পষ্ট হয়েছে, যারা ধর্মে বিশ্বাস করে এবং ধর্মচর্চায় অভ্যস্ত তারা আত্মহত্যা, পানাভ্যাস, মাদকাসক্তি, ডিভোর্স, বিষণ্নতা ইত্যাদি সামাজিক সমস্যাগুলো থেকে মোটামুটি মুক্ত। তারা সামাজিক সমস্যাগুলোর মোকাবিলায় অধিকতর গ্রহণযোগ্য ও স্বাস্থ্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। আর সহজে তা বাস্তবায়নও করতে পারে। দাম্পত্য জীবনে তৃপ্তি পাওয়ার প্রধান শর্তও যে ধর্মবিশ্বাস এবং ধর্মচর্চা, এ বিষয়টিও বের হয়ে এসেছে ওইসকল গবেষণা থেকে;[৬০] গবেষণায় দেখা যায় যে, স্রষ্টায় অবিশ্বাসীরাই মানসিকভাবে অসুস্থ।' কথাগুলো বলে ভাইয়ার দিকে তাকালাম।

'তুমি কি আমাদেরকে হ্যারেজমেন্ট করতে চাচ্ছ? কৌশলে অসুস্থ বলে অপমান করছ কিন্তু!' ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন মহিউদ্দিন ভাই। জাকির ভাইকে মনে হলো আমার কথাগুলো মনোযোগ সহকারে শুনছেন।

'কিছু মনে করবেন না ভাইয়া। একটু আগেই তো আপনি সকল ধর্ম বিশ্বাসীদের মানসিক রোগী বললেন। সেটাও কিন্তু এক প্রকার হ্যারেজমেন্ট।'

'আমার কাছে তো ডকুমেন্ট ছিল।'

'ভাইয়া, আমিও কিন্তু ডকুমেন্ট দিয়েই কথা বলছি। আর আপনার ডকুমেন্টের গ্রহণযোগ্যতা যে কতটুকু সেটা তো দেখলেনই।'

---

৬০. God: The Evidence, The Reconciliation of Faith and Reason in a Post-secular World. (patrick Glyn)

'তোমার আবার ডকুমেন্ট! এগুলোকে কি ডকুমেন্ট বলে? তোমার ডকুমেন্টের কোথায় স্পষ্ট করে বলা আছে যে, অ্যাথিস্টরা সাইকো (মানসিক রোগী)? নাকি মুহাম্মদের কোরান হাদিস থেকে বয়ান শুরু করে দিবা আর বলবা যে, এটাই অরজিনাল ডকুমেন্ট হা হা হা...'

আমি মহিউদ্দিন ভাইয়ের হাসি দেখতে লাগলাম। হাসি থামার পর ধীরস্থিরভাবে বললাম, 'আপাতত আপনার কুরআন, হাদিস বোঝার ক্যাপাসিটি নিয়ে প্রশ্ন তুলব না। তবে ছোটো একটা ডকুমেন্ট দিই। ডেইলি মেইলে একটি বড়ো আর্টিকেল ছাপিয়েছে। আর্টিকেলের শিরোনাম দিয়েছে– "Are you an atheist? Then you're probably a PSYCHOPATH অর্থাৎ আপনি নাস্তিক? তাহলে আপনি সম্পূর্ণ মানসিক বিকারগ্রস্থ।"[৬১] সেই আর্টিকেলে বলা হয়েছে, স্রষ্টায় অবিশ্বাসীরা সাধারণত ধর্মে বিশ্বাসীদের থেকে অনেক বেশি মানসিক অসুস্থতায় ভোগে। রিচার্ড ডকিন্স এবং সিগমন্ড ফ্রোয়েড স্রষ্টা এবং ধর্মে বিশ্বাসীদের হ্যারেজমেন্ট করে কি বলেছে জানেন?' বলে ওনার মুখের দিকে তাকালাম।

জাকির ভাই মুচকি হেসে বললেন, 'জানি তো Less intelligent-মানে ধার্মিকদের বুদ্ধি কম।'

'ভাইয়া দেখি বেশ ভালোই খবর রাখেন। তবে মজার কথা হলো, তাদের দাবির পক্ষে তারা কোনো প্রকার মেডিক্যাল রিপোর্ট কিংবা বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দেখাতে পারেনি। অপরদিকে, ১৯০১-২০০০ সাল পর্যন্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যতজন নোবেল প্রাইজ জিতেছে তাদের নব্বই ভাগই হচ্ছে স্রষ্টা এবং ধর্মে বিশ্বাসী। আচ্ছা একটা কথা বলি, রিসার্চার অ্যাট কেইস ওয়েস্টার্ন রিজার্ভ, ইউনিভার্সিটি ইন অহিও এবং ব্যবসন কলেজ ইন ম্যাসাচুসেটসের গবেষকদের মান কেমন?'

'তুমি কী বলতে চাও বলে যাও। তাদের গবেষণার মান নিয়ে প্রশ্ন তোলার কোনো অবকাশই নেই।' জাকির ভাইয়ের চোখে আত্মবিশ্বাসের ছাপ।

'তাহলে তো আর কথা না বাড়ানোই ভালো, এখানেই শেষ করা যাবে। এই দুই ইনস্টিটিউটের গবেষকরা একমত হয়েছেন যে, স্রষ্টা এবং ধর্মে বিশ্বাস জন্মগতভাবেই মানুষের ব্রেনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। Brain scans এবং বিভিন্ন experiments-এর মাধ্যমে তাঁরা দেখান, আমাদের ব্রেনের ২টি ফাংশনাল

---

[৬১]. http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3506294/Are-atheist-probably-PSYCHOPATH-Non-believers-lack-empathy-religious-people-intelligent-claims study.html

নেটওয়ার্ক সিস্টেম আছে। একটি অ্যাকটিভ হয় যখন আমরা চিন্তা করি। আরেকটি অ্যাকটিভ হয়, যখন আমরা বিভিন্ন সামাজিক এবং ইমোশনাল কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করি।

যারা স্রষ্টা এবং ধর্মে বিশ্বাসী তাদের নেটওয়ার্ক অ্যাকটিভিটি অবিশ্বাসীদের চেয়ে অনেক বেশি কার্যকর এবং সুশৃঙ্খল। Dr. Tony Jack বলেন, "পুরুষদের তুলনায় নারীরা অনেক বেশি ধার্মিক। কারণ, নারীরা অনেক বেশি সহনশীল।" পরোক্ষভাবে ধার্মিকরা আসলেই অনেক বেশি সহনশীল হয়।

আপনাদের জন্য আরেকটি চমকপ্রদ তথ্য বলি, প্রত্যেকটি মানুষই এক সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের স্বাভাবিক অনুভূতি নিয়ে জন্মায়। জন্ম থেকেই মানুষ জানে, স্রষ্টা এক এবং স্রষ্টা চান আমরা তার আদেশ-নিষেধ মেনে চলি। ইসলামের ভাষায় এই অনুভূতিকে ফিতরাত বলে।'

জাকির ভাই কিছু বলতে চাইলে আমি হাত ইশারা দিয়ে থামতে বলে আমার কথা চালিয়ে গেলাম।

'অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির Centre for Anthropology and Mind বিভাগের সিনিয়র রিসার্চার Dr. Justin Berrett দীর্ঘ ১০ বছর শিশুদের ওপর বৈজ্ঞানিক গবেষণা করেছেন। সম্প্রতি *দ্যা টেলিগ্রাফ নিউজ* তাঁকে নিয়ে একটি আর্টিকেল প্রকাশ করেছে। সেখানে তিনি বলেছেন, "শিশুদের মধ্যে একজন অতিপ্রাকৃতিক সত্তায় বিশ্বাসের প্রবল প্রবণতা আছে। কারণ, তারা বিশ্বাস করে যে, বিশ্বের সবকিছু কোনো না কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। আমরা যদি কিছু শিশুকে কোনো দ্বীপে রেখে আসি, তারা একজন স্রষ্টায় বিশ্বাসী হয়ে বেড়ে উঠবে।"[৬২]

অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির মনোবিজ্ঞানী ড. অলিভেরা প্যাট্রোভিচ তাঁর দীর্ঘ গবেষণার পর জানান, "কিছু ধর্মীয় বিশ্বাস যে সার্বজনীন হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে (যেমন কোনো বিমূর্ত সত্তাকে বিশ্বজগতের স্রষ্টা হিসেবে মৌলিক বিশ্বাস), এর শক্তিশালী প্রমাণ ধর্মগ্রন্থের বাণীর চেয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা থেকেই বেশি বেরিয়ে আসছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে।"[৬৩]

---

[৬২]. http://www.telegraph.co.uk/news/religion/3512686/Children-are-born-believers-in-God-academic-claims.html

[৬৩] Key psychological issues in the study of religion, Olivera Petrovich, Psihologija (2007), Volume 40, Issue 3, p.360

সাম্প্রতিককালের অনেক সেক্যুলার গবেষকদের গবেষণায় প্রতীয়মান হচ্ছে, ধর্ম বিশ্বাস প্রাথমিকভাবেই ব্যক্তির ভেতর থেকে উৎপত্তি হয়, যা মৌলিকভাবে মানব মনের একাংশ। Strong Naturalness Theory-এর বক্তব্য হলো, "ধর্মবিশ্বাসের উদ্ভব স্বয়ংক্রিয় ও অভ্যন্তরীণ এবং তা প্রকৃতপক্ষে স্বতঃস্ফূর্তভাবে শিশুদের মধ্যে উদ্ভব হয়।"[৬৪]

শুধু তাই নয়, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির দুজন গবেষকের নেতৃত্বে পরিচালিত তিন বছরব্যাপী এক আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রকল্পে ৫৭ জন গবেষক ২০টি দেশে ৪০টি ভিন্ন ভিন্ন গবেষণা পরিচালনা করে। তাদের এই গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল স্রষ্টা ও পরকালের ধারণা কি পিতা-মাতা বা সমাজ কর্তৃক চাপিয়ে দেওয়ার ফল নাকি মানব প্রকৃতির মৌলিক অভিব্যক্তি, তা খুঁজে বের করা। দীর্ঘ গবেষণার পর তাঁরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন, শুধু স্রষ্টা নয়, এমনকি মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে বিশ্বাসও মানুষের সহজাত প্রবণতার অন্তর্গত।[৬৫]

অতএব, স্রষ্টায় বিশ্বাস জন্মগতভাবে প্রাপ্ত স্বাভাবিক একটি বিষয়। অন্যদিকে নাস্তিকতাই হলো মানসিক অসুস্থতা। আপনার দ্বিতীয় প্রশ্ন কী, বলুন ভাইয়া।'

---

৬৪. Science and the World's Religions; Patrick McNamara Ph.D, Wesley J. Wildman (etd), vol. 02 (Persons & Groups), p. 206, 209, 210

৬৫. University of Oxford. "Humans 'predisposed' to belive in gods and the afterlife." ScienceDaily, 14 July 2011. (৬৩-৬৫, বিশ্বাসের যৌক্তিকতা, রাফান আহমেদ, পৃ: ২৫-২৬)

স্রষ্টার শক্তি কি সীমাবদ্ধ

অবিশ্বাসীরা ধার্মিকদের প্রতিনিয়ত মানসিক রোগী বলেছে এবং বিভিন্ন ডকুমেন্ট পেশ করে তৃপ্তির ঢেকুরও তুলেছে। আজ পালটা কিছু ডকুমেন্ট দেখে কিছুটা হোঁচট খেলেন মহিউদ্দিন ভাই। শুধু এতটুকু হলেও যথেষ্ট ছিল। উপরোক্ত নাস্তিকরা যে মানসিকভাবে অসুস্থ, এমন প্রমাণ পাওয়ার পর, তারা কোনোভাবেই হজম করতে পারছিল না। অন্তরের গুমট ভাবটা গোপন করার শত চেষ্টা করলেও চোখেমুখে তা ঠিকই ফুটে উঠল। সম্ভবত আমার মতো জুনিয়র ছেলের কাছ থেকে এমন ধকলটা আশা করেনি। আমি মনে মনে উপভোগ করলেও বাহিরে বেশ স্বাভাবিক থাকলাম। প্রসঙ্গ পালটাতে কপাল কুঁচকে বললেন,

'আচ্ছা, তুমি বলেছিলে স্রষ্টা সর্বশক্তিমান, রাইট?

'অব কোর্স রাইট। উই হ্যাভ নো ডাউট...'

'কিন্তু যদি প্রমাণ করে দিতে পারি তোমাদের স্রষ্টা সর্বশক্তিমান নয়, তার ক্ষমতায় সীমাবদ্ধতা আছে?'

'গুড। প্রমাণ করে দিন। আমরাও অকাট্য প্রমাণে বিশ্বাসী।'

'আচ্ছা, তোমার স্রষ্টা কি এমন ভারি কিছু বানাতে পারবেন, যেটা তিনি নিজেই তুলতে পারবেন না?'

মহিউদ্দিন ভাইয়ের মতলব বুঝতে পারলাম। আমি একটু মজা নেওয়ার জন্য বললাম, 'যদি বলি হ্যাঁ, পারেন!'

'তাহলে তিনি এমন কিছু বানালেন, যেটা তিনি নিজেই তুলতে পারবেন না। দ্যাট মিনস্ হি ইজ নট পাওয়ার ওভার অল। হে...হে...হে...'

'যদি বলি না, পারেন না!'

'তাহলে তিনি সবকিছু বানাতে সক্ষম নন, মানে সর্বশক্তিমান নন।'

ভাইয়ার হাসির ভঙ্গিমা দেখে মনে হচ্ছে উনি আমাকে মারপ্যাচের মধ্যে ফেলে, তামাশা দেখার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এবার আমি বললাম, 'আচ্ছা, আচ্ছা! হ্যাঁ-না উত্তর পরে। কিন্তু তার আগে আপনি কি একবারও ভেবে দেখেছেন যে, আপনার প্রশ্নটাই কতখানি অবাস্তব?'

'অবাস্তব মানে? অসম্ভব, তুমি পাশ কাটিয়ে যাওয়ার জন্য এমন ধারণা করছ।'

'আচ্ছা ঠিক আছে। আমি পাশ কাটিয়ে যাব না। আপনি বললেন, ভারি কিছু একটা বানাতে হবে। এবার বলুন তো, আমরা ভারি বলতে কী বুঝি? সাধারণভাবে আমাদের কাছে ভারি মানে আমরা বুঝি, যার ওজন বেশি হয়। কিন্তু ভাইয়া, আপনি কি বলতে পারবেন যে, ওজন বলতে আমরা কী বুঝি?'

মাথা ওপর-নিচ করলেন মহিউদ্দিন ভাই। এরপর বলা শুরু করলেন, 'অভিকর্ষজ বলের ফলে কোনো বস্তু যে টান অনুভব করে সেটিই ওজন। যেমন : পৃথিবী কোনো বস্তুকে যে বল দিয়ে টানে, সেটাকে ওজন বলে। আমরা যখন বলি, কোনো একটা বস্তু অনেক ভারি। তখন তার অর্থ হচ্ছে, পৃথিবী সেটাকে অনেক অভিকর্ষ বল দিয়ে টানছে। আমরা কোনো কিছুকে ওপরে তোলা মানে এই অভিকর্ষজ বলের বিরুদ্ধে বিপরীতমুখী বল প্রয়োগ করা। ইটস ভেরি সিম্পল, যা তোমার জানা উচিত ছিল।'

'মোটেও সিম্পল নয় ভাইয়া। যেকোনো কিছুর ওজন (weight) দুটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে, বস্তুর ভর (mass) এবং অভিকর্ষজ বল (gravity)। আমরা জানি, $W=mg$। এখানে m হচ্ছে বস্তুর অন্তর্নিহিত পদার্থের ভর এবং g হচ্ছে অভিকর্ষজ বল। তাহলে ওজন হচ্ছে ভর এবং অভিকর্ষজ বলের গুণফল। দেখা যাচ্ছে m (ভর) যত বেশি হবে w (ওজন) তত বেশি হবে।'

'আহা! তুমি এসব শেখাবে আন্ডার জে.এস.সি লেভেলের স্টুডেন্টদেরকে, আমাদেরকে না।'

'ওকে ভাইয়া, আপনাকে শেখাচ্ছি না। জাস্ট একটু ঝালাই করে নিলাম আরকি। তাহলে এই m আবার সম্পর্কিত g-এর সঙ্গে। বস্তুর ভর যেকোনো অবস্থানে এক হলেও, অবস্থানভেদে অভিকর্ষজ বল ভিন্ন হয়। একারণে একই ভরের বস্তুর বিভিন্ন অবস্থানে ওজন বিভিন্ন হয়। ভাইয়া, আমি ঠিক বলেছি কি না?'

'হ্যাঁ ঠিক বলেছ। g অর্থাৎ অভিকর্ষজ বলের মান অবস্থানভেদে ভিন্ন। যেমন, পৃথিবীর তুলনায় চাঁদে g-এর মান ৬ ভাগের এক ভাগ। তার মানে হচ্ছে ১০ কেজি ভরের কোনো বস্তুকে পৃথিবীতে তুলে ধরতে যত বল প্রয়োগ করতে হয়, চাঁদে প্রয়োগ করতে হবে তার ৬ ভাগের এক ভাগ। অর্থাৎ পৃথিবীতে যে বস্তুর ওজন ১০ কেজি, চাঁদে তার ওজন ১.৬ (প্রায়) কেজি।'

'ধন্যবাদ ভাইয়া। তাহলে এটা ক্লিয়ার যে, কোনো বস্তুকে ওপরে তোলাটা শুধু তার ভরের ওপর নির্ভর করে না। বরং অভিকর্ষজ বলের সঙ্গে তা সম্পর্কিত। এই অভিকর্ষজ বল গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান অনুযায়ী পরিবর্তিত হতে থাকে। যেখানে অভিকর্ষজ বলের মান যত বেশি, সেখানে ভরও তত বেশি। এবার আপনি বলুন, স্রষ্টা কীসের সাপেক্ষে কাজটি করবে?'

'কেন? মহাবিশ্বের যেকোনো কিছুর সাপেক্ষে।'

'এই মহাবিশ্বের কোনো কিছুর সাপেক্ষে স্রষ্টার জন্য প্রশ্নটি রাখা কি হাস্যকর নয়?'

'কেন, কেন? হাস্যকর হবে কেন?'

'বলছি ভাইয়া, বলছি। কারণ, এই তুলে ধরার ব্যাপারটি বুঝতে হলে আরও একটি বিষয় মাথায় রাখতে হচ্ছে, তা হলো স্পেসটাইম। এখন আপনার প্রশ্ন অনুযায়ী স্রষ্টাকে এমন কিছু বানাতে হবে, যা সসীম কিন্তু ভর অসীম, রাইট?'

'ইয়েস, অ্যাভসুলেটলি রাইট। আমি ঠিক এটাই জানতে চেয়েছি।'

'কিন্তু আমরা হকিং-এর *ব্রিফ হিস্ট্রি* থেকে জানি যে, কোনো কিছুর ভর একটা সীমা অতিক্রম করলেই, সেটা নিজের মধ্যে কলাপ্স করে ব্ল্যাকহোল[৬৬] হয়ে যায়। আর ব্লাকহোল সৃষ্টি হলেই, তা আশেপাশের সবকিছু খেয়ে ফেলে এবং সঙ্গে সঙ্গে স্পেসটাইম গুঁড়িয়ে দেয়।'

---

৬৬. অতিকায় ভরবিশিষ্ট নক্ষত্র দিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়। সহজ করার জন্য আমরা কাল্পনিক বস্তু ধরে নিলাম।

'সো হোয়াট? তাতে কী হয়েছে?' এবার একটু উত্তেজিত হলেন মহিউদ্দিন ভাই।

'ভাইয়া, রেগে যাবেন না প্লিজ। আমরা একটা সমাধানে পৌছার চেষ্টা করছি। এটা আপনার, আমার সবার জন্য ভালো হবে। আচ্ছা এবার দেখুন, অসীম ভরে যাবার অনেক আগেই সেই বস্তুটা কিন্তু ব্ল্যাকহোল হয়ে যাবে। বলুন তো, স্রষ্টা যদি কোনো বস্তুর ভর বাড়াতে বাড়াতে একটা সীমা অতিক্রম করে ফেলে, তাহলে কয়টি ঘটনা ঘটতে পারে?'

অপর প্রান্ত থেকে কোনো উত্তর না আসায় আমিই বলতে থাকলাম, 'এখানে দুটি ঘটনা ঘটতে পারে। এক, সেটা ব্ল্যাকহোল হয়ে স্পেসটাইম গুঁড়িয়ে দিয়ে আপনার দেওয়া সাপেক্ষকেই খেয়ে ফেলবে। দুই, যদি নিজের কেন্দ্রের দিকে কলাপ্স হতে হতে অতি ক্ষুদ্র কিন্তু অত্যাধিক ভর সম্পন্ন হয়ে যায়, তাহলে তা আপনার সাপেক্ষের ভেতর প্রবেশ করবে। এরপর সেখানে দোলকের মতো যাতায়াত করবে এবং শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রে গিয়ে স্থির হবে।'

'সিউর?' কনফিউসড হয়ে প্রশ্ন করলেন মহিউদ্দিন ভাই।

'হকিং বলেছেন, আমি না। এবার বলুন মহাবিশ্ব অসীম না সসীম?'

'অবশ্যই অসীম।'

'ঠিক বলেছেন। এই মহাবিশ্ব অসীম কিন্তু তা শুধু আমাদের জন্য। কিন্তু যিনি স্রষ্টা মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন এবং রক্ষণাবেক্ষণ করছেন তাঁর কাছে অসীম তো নয়ই; বরং সসীম এবং অতি নগণ্য। আর যার কাছে এই মহাবিশ্ব অতি নগণ্য, তাঁর জন্য মহাবিশ্বের মধ্যে অবস্থিত যেকোনো কিছুকে সাপেক্ষ হিসেবে দেওয়া কি হাস্যকর নয়?'

'হু...ম। ধরে নাও, সমগ্র মহাবিশ্ব তার জন্য সাপেক্ষ।'

'তার মানে আপনি বলছেন, স্রষ্টাকে এমন কিছু তৈরি করতে হবে, যেটা সমগ্র মহাবিশ্বের ভরের চেয়েও অনেক ভারি এবং সেটাকে এই মহাবিশ্ব থেকে আলাদা করে তুলে ধরতে হবে?'

'তো আর বলছি কী? স্রষ্টা হলে নিশ্চয়ই তা পারার কথা।'

স্মিত হেসে বললাম, 'আরে ভাইয়া, মহাবিশ্বের বাহিরে ভরের যত কিছুই তৈরি করা হোক না কেন, সেটাকে তো মহাবিশ্ব থেকে তুলে ধরার প্রশ্ন আসবে না।

কারণ, সেই বস্তুটির সঙ্গে এই মহাবিশ্বের গ্রাভিটি, টাইমস্পেস কোনো কিছুর সম্পর্ক থাকবে না। আচ্ছা, আমাদের মহাবিশ্ব ছাড়া কি আর কোনো মহাবিশ্ব আছে?'

জাকির ভাই বললেন, 'মাল্টিভার্স থিওরি বলছে, মহাবিশ্ব একক নয়, অসংখ্য মহাবিশ্ব আছে। সেগুলোর মধ্যে অনেকগুলোই এই মহাবিশ্বের চেয়েও অনেক বড়ো।'

'ওকে ভাইয়া। ধরুন, আপনি এমন ক্ষমতাপ্রাপ্ত হলেন যে, এই মহাবিশ্বের বাহিরে আপনি একজন পর্যবেক্ষক। আর আপনি সেইসব মহাবিশ্বকে দেখছেন। আপনি কি বলবেন, একটি মহাবিশ্বকে আরেকটি মহাবিশ্ব থেকে তুলে ধরা হয়েছে?'

জাকির ভাই বললেন, 'তা অযৌক্তিক বুঝলাম, কিন্তু স্রষ্টা কি মহাবিশ্বের নিয়মের বাহিরে কিছু করতে পারেন না?'

'এই মহাবিশ্বের কোনো কিছুর সাপেক্ষে কিছু একটা তুলতে হবে, কিন্তু মহাবিশ্বের নিয়ম ভেঙে... তাহলে সেটা কি আর আপনার দেওয়া শর্তের তুলে ধরা হলো? আপনার কথাটি এরকম হয়ে গেল না যে, এক মিটার দৈর্ঘ্যের এমন কিছু একটা বানাতে হবে, যার পরিমাপ করা যাবে না। আবার চার বাহুর একটি ত্রিভুজ বানাতে হবে কিংবা তিন বাহুর একটা চতুর্ভুজ? ইত্যাদি ইত্যাদি।'

'তাহলে সমাধান কী?' বেশ গম্ভীর স্বরেই বললেন মহিউদ্দিন সাহেব। ওনাকে একটু হতাশ দেখালো। আমি বললাম, 'আপনি শুধু এরকম প্রশ্নই বানাতে পারবেন কিন্তু কোনো সমাধান বের করতে পারবেন না। কারণ, আপনি আপনার সীমাবদ্ধতাকে এখনও বুঝতেই পারেননি। এসব অবৈজ্ঞানিক অচল দর্শনের কারণেই স্টিফেন হকিং তাঁর *গ্র্যান্ড ডিজাইন* বইয়ে বলেছেন, "দর্শনশাস্ত্রের মৃত্যু হয়েছে। দর্শনশাস্ত্র আধুনিক বিজ্ঞান, বিশেষ করে পদার্থবিজ্ঞানের নানাবিধ উৎকর্ষতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে নিজেকে হালনাগাদ করতে পারেনি।"'

'আরে ধুর... বাদ দাও তো। হকিং-এর সব কথা কি সত্য নাকি?' চেহারায় ফুটে ওঠা পরাজয়ের গ্লানিটা আবারও গোপন করার ব্যর্থ চেষ্টা করে বললেন মহিউদ্দিন ভাই।

'ভাইয়া, আপনারা কেন যে এত অবস্থান বদল করেন, বুঝি না। অথচ হকিং যখন অবৈজ্ঞানিকভাবে বলেছিল, মহাবিশ্ব শূন্য থেকে নিজে নিজেই সৃষ্টি হয়েছে, কেউ সৃষ্টি করেনি। তখন তো সেটা নিয়ে তো মাতামাতির শেষ ছিল না।'

'তুমিও তো বলেছিলে, তোমাদের স্রষ্টা সর্বশক্তিমান, তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন এবং করতেও পারেন।'

'অবশ্যই আমি তা বলেছিলাম। স্রষ্টা তাই করেন, যা স্রষ্টার ইচ্ছা হয়[৬৭] এবং সেই কাজটিও হতে হবে স্রষ্টাসুলভ। এমন না যে, আমরা একটা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেই তিনি তা করে দেখাবেন।'

'আশ্চর্য! স্রষ্টা দাবি করলে দেখাতে হবে না?'

'না, হবে না। কারণ, স্রষ্টা আমাদের মুখাপেক্ষী নন। স্রষ্টা যদি কোনো কিছুর মুখাপেক্ষী হন, তাহলে তো তিনি স্রষ্টা হতে পারেন না। স্রষ্টা সবকিছু করেন না, করবেনও না। যেমন, তিনি মিথ্যা বলেন না, কখনই বলবেনও না। তিনি ওয়াদা ভঙ্গ করেন না এবং করবেনও না। এখন আপনি যদি বলেন, স্রষ্টা সবকিছু করতে পারলে তো তিনি মিথ্যা বলতে পারেন, তাই না? ইত্যাদি ইত্যাদি।'

'হুম, এটাও একটা গুড পয়েন্ট। স্রষ্টা; অথচ কিছু কাজ করবেন আর কিছু কাজ করবেন না, তা তো হতে পারে না।'

'না ভাইয়া, এটা কোনো পয়েন্টই নয়, হতেও পারে না। কেননা, এখানে আপনার প্রশ্নটিই অপ্রাসঙ্গিক। কারণ, আমরা তো সেই সত্তাকে স্রষ্টা বলে মেনে চলব না, যিনি মিথ্যা বলবেন। আর আমরা মিথ্যা বলতে বললেই যে তিনি মিথ্যা বলে দেবেন, ব্যাপারটা এমনও না। সত্যি বলতে, স্রষ্টার ক্ষমতা যদি বুঝতে চাই, তাহলে আমাদের আশেপাশে তাকালেই তা বুঝতে পারব। এরপর চাইলে আমরা তাকে মানতে পারি অথবা অস্বীকার করতে পারি। কেননা, পার্থিব জীবনে তিনি আমাদেরকে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দিয়েছেন। চূড়ান্ত ফয়সালা তো বিচার দিবসেই হবে।'

জাকির ভাই মহিউদ্দিন ভাইকে বললেন, 'কিরে চুপ করে আছিস কেন? কিছু বলবি না?'

'কী আর কওনের আছে? এইডা কোনো লজিক অইল? কোথ্যাইকা কী ব্ল্যাক হোল, স্পেস-টাইম, আউল-ফাউল ঘোড়ার ডিমের কাহিনি কইরা রাখছে। আগা-মাথা তুই কিছু বুঝচস?'

---

[৬৭]. সূরা বুরুজ-৮৫ : ১৬

'কী বলিস তুই, এগুলো তো আমরা ইন্টারমেডিয়েটে পড়ছি। এখনকার পোলাপাইন আরও বেশি আপডেট। এগুলো নাইন টেন থেকেই জানে।'

'হ হ... বুঝবার পারছি। অর কথায় তোর মাথা আউলায়া গেছে। আমার মাথা আউলানো অত সহজ না, হুহ... এসব আজাইরা কথা বলার সময় আমার নাই। তোরা থাক, আমি গেলাম।'

এতটুকু বলেই তড়িঘড়ি করে চলে গেলেন ফিলোসোফার ওরফে মহিউদ্দিন ভাই। মনে হলো জীবনে এই প্রথম একটা ধাক্কা খেলেন। আমরা ওনার যাওয়ার পানে তাকিয়ে থাকলাম। হঠাৎ জাকির ভাইয়ের কথায় সজ্ঞান ফিরে পেলাম।

'ও এরকমই বুঝেছিস, একটু মাথাগরম টাইপের ছেলে। আর মাথা গরম হলেই ওর ভাষাজ্ঞান ঠিক থাকে না। আচ্ছা যাক, সে আরও কয়েকদিন এখানে আছে, আবারও কথা বলা যাবে।'

ফলসিফিকেশন টেস্ট

ঘড়ির দিকে তাকালো অ্যান্টনি। নাহ, জেনেফার তো এত দেরি করার কথা নয়। কোনো সমস্যা হলো কিনা? জ্বরের কারণে মাথাটা যে পরিমাণ ভার ছিল তার অনেকটাই এখন কেটে গেছে। কিন্তু ভিন্ন এক চিন্তায় মাথাটা ভারি হয়ে আছে। জেনেফারকে ফোন দেওয়ার উদ্দেশ্যে মোবাইলটা হাতে নিয়ে বেলকনিতে দাঁড়াল অ্যান্টনি। এক পশলা বাতাস তাকে ছুঁয়ে গেল। ঢাকা শহরে সাধারণত তারাযুক্ত রাতের আকাশ দেখতে পাওয়াটা মিরাকল ব্যাপার। সেদিক থেকে বলতে গেলে অ্যান্টনি বেশ ভালো জায়গায় আছে। তার ব্যালকনি থেকে আকাশের অনেকাংশই দেখা যায়। হঠাৎ একটি উল্কা চোখে ঝলক লাগিয়ে নিমিষেই দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল।

অ্যান্টনি ভাবতে লাগল; 'এই আকাশ, এই সৃষ্টি নিয়ে কত কথা! কত মত! কত চিন্তা! কুরআনে একরকম, বাইবেলে আরেক রকম। প্রত্যেকেই ধর্মান্ধ। কারণ, সবাই তার নিজের ধর্মগ্রন্থকে ঠিক বলে দাবি করে।'

এসব ভাবতে ভাবতে মিরাজের চিঠির কথা মনে পড়ল অ্যান্টনি। চিঠিটা অনেকগুলো প্রশ্নের অবতরণা করেছে। সেগুলোর জবাব দিতে হবে। এই চিঠিটাকে প্রথমে তথাকথিত মোল্লাদের ধ্যান ধারণা মনে হলেও এখন আর সেটা মনে হচ্ছে না। বরং আলোচনা বেশ গভীরে চলে গেছে। কী যেন ভেবে ব্যালকনি থেকে আবার বেডে চলে আসল অ্যান্টনি। জেনেফারকে ফোন দেওয়ার কথা ভুলে গিয়ে আবার চিঠিতে ডুবে গেল...

...জাকির ভাই বললেন, 'আচ্ছা আমার কিছু প্রশ্ন আছে, করব? নাকি তুইও চলে যাবি?'

'সমস্যা নেই ভাইয়া, আমি আছি। বলুন কী বলবেন?'

'আচ্ছা, বিজ্ঞান বলছে মহাবিশ্বের সবকিছু সৃষ্টি হয়েছে বিগ ব্যাং-এর মাধ্যমে। এর জন্য কোনো স্রষ্টার প্রয়োজন নেই। আর বিবর্তনের মাধ্যমে প্রাণীজগতের সবকিছু সৃষ্টি হয়ে এই পর্যন্ত এসেছে। তাহলে কি এটা প্রমাণ হয় না, স্রষ্টার ধারণাটাই হলো মানুষের তৈরি। আচ্ছা যদি মেনেও নেই, একজন স্রষ্টা আছে এবং তাঁর দেওয়া একটা কিতাব আছে, যা আমাদের গাইড লাইন। সেই কিতাবটা মেনে চলতে হবে। অর্থাৎ একটা ধর্মের অনুসরণ করতে হবে। কিন্তু স্রষ্টা একজন হলে ধর্মও একটি হতে হবে, এটাই তো যৌক্তিক তাই না?'

'হুম.. অবশ্যই।' মাথা ঝাঁকিয়ে সমর্থন দিলাম। জাকির ভাইয়ের কথা শুনেই বুঝতে পারলাম উনি কী বলতে চান। কারণ, কথিত মুক্তমনা গ্রুপের প্রায় সবাই নির্দিষ্ট কিছু প্রশ্নের মধ্যেই ঘুরপাক খায়। এদেশে যারা নিজেদের নাস্তিক বলে পরিচয় দেয়, তাদের অধিকাংশই যুক্তির বিপরীতে খিস্তি চর্চা করে। আবার কিছু বিশ্বাসী লোকজন আছে, তারাও অবিশ্বাসীদের জবাব একই ভাষায় দেয়। এমন কিছু ভাই আছে, যারা নিজের মতের বিরুদ্ধে গেলে মুসলিমদেরকেই কাফির, মুনাফিক ফতোয়া দিয়ে বসে। মুসলিমদের মধ্যে ইখতেলাফ (মতভিন্নতা) আগেও ছিল, কিন্তু ইফতিরাক (মতভিন্নতাকে কেন্দ্র করে দলে দলে বিভক্ত হয়ে যাওয়া) ছিল না। অথচ এখন ইখতিলাফকে নিয়ে গেছে ইফতিরাকে, ফিরকাকে নিয়ে গেছে জামাতে। সহনশীলতা এবং পারস্পরিক মোআমালাতের চর্চা একেবারেই কমে যাচ্ছে... জাকির ভাইয়ের কথায় সংবিৎ ফিরে পেলাম...

'কিন্তু আমার প্রশ্ন হলো সব ধর্মের মানুষই তো বলে, তাদের ধর্মই সঠিক এবং তাদের ধর্মগ্রন্থই স্রষ্টার আসল বাণী। আর তোরা মুসলিমরাও এর ব্যতিক্রম না। এখন কথা হলো; তুই কি প্রমাণ করতে পারবি, কোরানই হচ্ছে আল্লাহর বাণী আর ইসলাম ধর্মই সঠিক ধর্ম?'

'মুচকি হেসে বললাম, আপনি চমৎকার কিছু প্রশ্ন করেছেন। কিন্তু ভাইয়া, আপনার প্রশ্নগুলো ছোটো হলেও উত্তর দিতে কিন্তু বেশ সময় লাগবে। এখন তো সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারব না।'

'কবে দিতে পারবি? নাকি পালানোর ধান্ধা?' বলেই জোরে একটা অট্টহাসি দিলেন জাকির ভাই।

'পালানোর ধান্ধা, গোজামিল দেওয়া, প্রতারণার আশ্রয় নেওয়া ইত্যাদি আমাদের নীতিবিরুদ্ধ। পারলে উত্তর দেবো, আর না পারলে বলব, এখন পারছি না। তা ছাড়া পালিয়ে যাব কেন? এখন শুধু এইটা প্রমাণ করব যে, কুরআনই আল্লাহর বাণী, আর যদি সময় হয় অন্য ধর্মগ্রন্থ নিয়ে কথা বলব। না হলে বাকিগুলো পরে সময় করে উত্তর দেবো। বলুন এতে চলবে কিনা?'

'ওকে চলবে, শুরু কর।'

'শুরু তো করবই, কিন্তু... আচ্ছা ভাইয়া, আপনার কাছে কিছু টাকা হবে?'

জাকির ভাই পকেট থেকে মানিব্যাগটা বের করে সম্ভবত টাকা চেক করলেন। এরপর কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে কিছু একটা ভেবে বললেন, 'হুম হবে। আচ্ছা তুই এই ভর দুপুরে টাকা দিয়ে কী করবি?'

'অনেকক্ষণ ধরে তো শুধু আমিই কথা বললাম, বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। এখন দুজনে দুই কাপ চা খাব। আর ফারিহার জন্য একটা ডেইরি মিল্ক চকলেট নেবো। এই চকলেটটা তার অনেক পছন্দ। একটা সময় এই চকলেট না পেলেই আমার সঙ্গে ঝগড়া শুরু করে দিত কিন্তু ইদানিং সে আর এইটা নিয়ে বায়না ধরে না।'

'কেন কেন?'

'কারণ সে জানে, আমার কাছে এখন টাকা থাকে না।'

'ওকে, চল বাজারের দিকে যাই। আচ্ছা তুই তো এর আগে কখনো টাকা চাসনি, তা হঠাৎ এত অভাব দেখা দিলো যে?'

'আপনার বন্ধু আমাদের এখন আর টাকা পাঠায় না। বাড়ি থেকে চলে যাওয়ার পর প্রথম কিছুদিন টাকা পাঠালেও পরে বন্ধ করে দিয়েছে। একদিন শুনতে পেলাম ভাইয়া নাকি বিয়ের কাজটাও নিজ দায়িত্বে সেরে ফেলেছে। আচ্ছা আপনি বিয়ে করবেন না?'

'তা তো করবই, তবে আরও কিছুদিন পর।'

বিয়ের কথা চলে আসাতে জাকির ভাইকে একটা প্রশ্ন করার লোভ সামলাতে পারলাম না। তাই সরাসরি জানতে চাইলাম, 'ভাইয়া, বিয়ে নিয়ে আমার একটা প্রশ্ন ছিল, করব?'

'হুম, করে ফেল।'

'আচ্ছা, বিয়ে তো ধর্মের ব্যাপার। যারা স্রষ্টায় বিশ্বাসী তারা ধর্মীয় রীতি-নীতি মেনে বিয়ে করেন। কিন্তু আপনারা অবিশ্বাসীরাও এভাবে বিয়ে করেন কেন? আবার দেখি আপনাদের কেউ মারা গেলে মোল্লা ডেকে জানাজা পড়ান? অন্যদিকে অনেক নাস্তিক দুআ করে বলে, ওপারে ভালো থাকুন। আচ্ছা ভাইয়া, তারা কার কাছে কীসের দুআ করে?'

আমার কথা শুনে জাকির ভাই আমতা আমতা শুরু করে দিলেন। মনে হচ্ছে, কী বলবেন বুঝে উঠতে পারছেন না। সেই সুযোগে আমি আবার বলতে শুরু করলাম, 'আরও একটা ইন্টারেস্টিং কথা বলছি। জাস্ট কথার কথা আর কী। আচ্ছা, আপনাদের গুরু সালমান রুশদি কুরআনকে কটাক্ষ করে একটি বই লিখেছে, জানেন?'

'হুম, *স্যাটানিক ভার্সেস*।'

জাকির ভাইয়ের গলার সাউন্ড শুনে মনে হলো আগের প্রশ্নের ধকল এখনও সামলিয়ে উঠতে পারেননি। 'আচ্ছা ভাইয়া এই স্যাটানিক ভার্সেস শব্দের অর্থ কী?'

'শয়তানের কথা।'

'আচ্ছা রুশদিসহ আপনারা কেউ তো কুরআন কিংবা জিনকে বিশ্বাস করেন না। কিন্তু আল্লাহ কুরআনে বলেছেন, শয়তান হচ্ছে জিনদের একজন।[৬৮] সে হচ্ছে আল্লাহকে অমান্যকারী, যে মানুষকে সর্বদাই ভুল পথে পরিচালিত করার চেষ্টা করে। নবি মুহাম্মদ ﷺ অনেক হাদিসে শয়তানের কথা বলেছেন। যেমন : "তোমাদের কারো নিকট শয়তান আসতে পারে এবং সে বলতে পারে, এ বস্তু কে সৃষ্টি করেছে? ওই বস্তু কে সৃষ্টি করেছে? এরূপ প্রশ্ন করতে করতে শেষ পর্যন্ত বলে বসবে, আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছে?"[৬৯] আপনি আল্লাহ বা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথাগুলো বিশ্বাস করেন?'

---

[৬৮]. সূরা কাহফ- ১৮ : ৫০

[৬৯]. সহিহ আল বুখারি, হাদিস নং- ৩২৭৬

'প্রশ্নই আসে না। এগুলো সব বানানো কথা।'

'ওকে। তাহলে আপনারা কুরআন বা হাদিস কোনো কিছুর ওপর ঈমান আনেননি। কিন্তু রুশদি সাহেবের স্যাটানিক ভার্সেস তথা শয়তানের কথার ওপর ঠিকই ঈমান এনেছেন। আচ্ছা সালমান রুশদি কি কখনো শয়তানকে দেখেছে? আপনারা দেখেছেন? তাহলে *শয়তানের কথা* নামক বই লেখার মানে কী? এইটা একটা লেজে গোবরে অবস্থার মতো হলো না?'

একথা বলেই আমি একটা মুচকি হাসি দিতে চাইলাম কিন্তু সেটা শব্দযুক্ত হাসিতে পরিণত হলো। আমি কষ্ট করে হাসিটাকে কন্ট্রোলে নিলাম।

'গোপাল ভাঁড়ের মতো হাসবি না। তুই একসঙ্গে এত কথা কীভাবে বলতে পারিস? আর স্টুপিডের মতো সব ব্যাপারে নাক গলাতে যাস কেন?'

এতক্ষণে আমরা করিম চাচার দোকানে চলে এসেছি। বাজারের সেরা চায়ের দোকান। পোলাপান মজা করে বলে, 'করিম চাচার চা, ফুঁ দিয়া খা।' ছোটো একটা দোকান, ভেতরে দুটো টেবিল, আর বাহিরে একটা মাত্র বেঞ্চ। কিন্তু কাস্টমারের অভাব হয় না। সময়টা দুপুর হওয়ায়, চা খোরদের আনাগোনা কম ছিল। আমরা ভেতরের একটা টেবিলে আরাম করে বসলাম। পাশের টেবিলে আগে থেকেই বসা ছিলেন জমির চাচা। যথারীতি নিজস্ব ভঙ্গিতে বাম পায়ের ওপর ডান পা'টা তুলে দিয়ে, ডান হাতে চায়ের কাপটা ধরে অত্যন্ত শৈল্পিকভাবে ফুঁ দিয়ে, বিশেষ একটা শব্দ সৃষ্টি করে গলাধঃকরণ করছিলেন। তার বিশেষ একটা বৈশিষ্ট্য হলো, চায়ের দোকানে ঝড় তোলা। যেকোনো আলোচনায় তিনি পদাধিকারবলে অংশগ্রহণ করেন।

সালাম দিয়ে চায়ের অর্ডার দিলাম। এরপর জাকির ভাই আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'তুই কি মূল প্রশ্নের উত্তর দিবি? নাকি শুধু আমার পকেটের ওজন কমাবি?'

'হুম দিচ্ছি। আগে আমার কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শোনেন, তারপর প্রশ্ন থাকলে করবেন, ওকে?'

'সে দেখা যাবে, তুই শুরু কর।'

জমির চাচাকে দেখলাম, আমাদের কথাগুলোকে আমলে না নিয়ে নিজের চায়ের কাপে মনোনিবেশ করে আছেন। তবে কতক্ষণ এভাবে থাকতে পারবেন সেটাই প্রশ্ন।

বুঝুক না বুঝুক সকল আলোচনায় তিনি পারটিসিপেট করবেন। সে যাইহোক, আপাতত আমি জাকির ভাইয়ের দিকে ফিরে বললাম,

'কোনো ধর্মকে যাচাই করার কষ্টি পাথর হলো, সেই ধর্মের ধর্মগ্রন্থ। ধর্মগ্রন্থে যদি কোনো ভুল বা অসংগতি পাওয়া যায় তাহলে প্রমাণ হবে, এগুলো স্রষ্টার কথা নয়। কারণ, স্রষ্টা নির্ভুল।'

'ঠিক। কিন্তু এখন আমরা কীভাবে ধর্মগ্রন্থ যাচাই করতে পারি?'

'আপনি জানেন? স্যার আইনস্টাইন যখন *থিওরি অব রিলেটিভিটি* প্রকাশ করেছিলেন, তখন অনেক বিজ্ঞানী তাঁর থিওরি ভুল প্রমাণ করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল?'

'হুম, জানি। ১৯৩১ সালে একটি বইও বের হয়েছিল *A Hundred Author Against Einstein* অর্থাৎ আইনস্টাইনের বিরুদ্ধে শত লেখক।'

'রাইট, তখন তিনি বলেছিলেন, তাঁর থিওরি ভুল প্রমাণের জন্য প্রমাণ সহকারে একটি বই-ই যথেষ্ট।'

'তা তো বটেই। তবে মজার ব্যাপার হলো, তিনি নিজেই কয়েকটি পদ্ধতি বাতলে দিয়েছিলেন যেগুলো দিয়ে পরীক্ষা করা যাবে, তাঁর থিওরি ঠিক না ভুল। অর্থাৎ ফলসিফিকেশন টেস্ট। এরপর বিজ্ঞানীদের অনেক গবেষণার পরেও আইস্টাইনের থিওরিকে ভুল প্রমাণ করা যায়নি। ব্যাপারটা মজার না?'

'যারা খেয়ে দেখেছে তাদেরকে জিজ্ঞেস করতে হবে মজার কিনা।' বলেই একটা মুচকি হাসি দিলাম।

'দেখ, সিরিয়াস আলোচনার সময় একদম ফাজলামি করবি না।'

'ঠিক আছে, করব না। তো এখন তাহলে আমরাও কুরআনের ফলসিফিকেশন টেস্ট করতে পারি। কী বলেন?'

'বলিস কী, ধর্মগ্রন্থের ফলসিফিকেশন টেস্ট করা যায়?' বাম ভ্রু কুচকিয়ে জানতে চাইলেন জাকির ভাই।

'অবশ্যই যায়। তবে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হলো কুরআন নিজেই তার সত্যতার ব্যাপারে আমাদের কাছে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে। আবার ফলসিফিকেশন টেস্টের নিয়মও বলে দিয়েছে।'

'বেশ ইন্টারেস্টিং তো... সেটা কী রকম?'

'যেমন, কুরআনের একেবারে প্রথম দিকেই সূরা বাকারার ২নং আয়াতে বলা হয়েছে, "এটা সেই গ্রন্থ যার মধ্যে কোনো সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই।" আচ্ছা, পৃথিবীতে কি এমন কোনো বই আছে? যার লেখক এমনটা দাবি করতে পেরেছেন?'

'তা অবশ্য নেই। বইয়ে তো কিছু-না-কিছু ভুল ভ্রান্তি থাকেই, এটাই স্বাভাবিক ব্যাপার। এজন্যই তো প্রকাশকরা অথবা লেখকরা বলে দেন, বইয়ের কোথাও ভুল দেখতে পেলে জানিয়ে দিতে, পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে।'

'আবার দেখেন, সূরা নিসার ৮২ নং আয়াতে বলা হয়েছে– "তারা কি কুরআন সম্বন্ধে গবেষণা করে না? যদি এটা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও নিকট হতে আসত, তাহলে তারা এতে অনেক অসঙ্গতি পেত।" অর্থাৎ মানুষ যদি এতে যেকোনো ধরনের অসংগতি দেখাতে পারে, তাহলে প্রমাণ হয়ে যাবে কুরআন আল্লাহর বাণী নয়। আর আল্লাহর এই চ্যালেঞ্জ কুরআন নাজিলের শুরু থেকেই বলবৎ আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। এই ধরনের চ্যালেঞ্জ কিন্তু কুরআন অনেকবার ছুঁড়ে দিয়েছে।'

'হ হ। মিরাজ কিন্তু একেবারেই ঠিক কথা কইছে।'

এতক্ষণে পাওয়া কথা বলার সুযোগটা হাতছাড়া করলেন না জমির চাচা। আমরা দুজনই চাচার দিতে তাকালাম। অবশেষে কথা বলতে পেরে চাচা তার চিরচেনা স্বভাবের প্রতিফলন ঘটালেন। তার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে জাকির ভাই আবার প্রশ্ন করলেন,

'কীরকম?'

'যেমন ধরুন, সেই সময়ে মক্কার মুশরিকরা মুহাম্মদ ﷺ-কে নিরক্ষর বলেই জানত। তারপরেও তারা বিশ্বাস করত না, এটা আল্লাহর পাঠানো কিতাব। বরং তারা বলত, এটা মুহাম্মদের নিজের বানানো। তখন কুরআন তাদেরকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেছে, এটা যদি আল্লাহর বাণী না হয়, তাহলে তারা কি পারবে এরকম একটা কিতাব বানাতে? যদি পারে লিখে দেখাক। প্রথম চ্যালেঞ্জ দেওয়া হয়েছে সূরা বনি ইসরাইল-এর ৮৮নং আয়াতে, "বলো; যদি মানুষ এবং জিন একত্রিত হয়ে কুরআনের মতো একটা কিতাব রচনা করতে চেষ্টা করে, এমনকি একে অপরকে সাহায্য করে তবুও তারা এরূপ রচনা করতে পারবে না।"'

'এটা তো বিশাল চ্যালেঞ্জ। কে বসে বসে এত বড়ো বই লিখবে, বেকার পড়ে আছে নাকি মানুষ?'

'কিন্তু ভাইয়া, পরে চ্যালেঞ্জকে আরও সহজ করে দেওয়া হয়েছে। সূরা হুদের ১৩ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, "তারা কি বলে এটা মুহাম্মদের নিজের রচনা করা? তুমি বলে দাও, তাহলে তোমরাও অনুরূপ দশটি সূরা আনয়ন করো এবং নিজেদের সাহায্যার্থে আল্লাহ ব্যতীত যাকে ইচ্ছা তাকে ডেকে আনতে পারো।" কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী, তারা এই চ্যালেঞ্জের সামনেও টিকতে পারেনি।'

'কোরানে সূরাগুলোর সাইজ যা বড়ো, দশটি সূরা লেখা কি চাট্টিখানি ব্যাপার? মানুষের কী খেয়ে দেয়ে আর কাজ নেই যে, একটা ইউজলেস কাজের পেছনে আনলিমিটেড সময় দেবে? এত সময় নিয়ে কে লেখতে যাবে?'

'হা হা হা। কথায় আছে না, নাচতে না জানলে উঠোন বাঁকা। আপনাদেরও একই দশা, ওজুহাতের যেন শেষ নেই। সম্ভবত আপনাদের এই মানসিকতার দিকে লক্ষ করেই পরবর্তী সময়ে এই চ্যালেঞ্জকে একেবারেই সহজ করে দেওয়া হয়েছে। সূরা বাকারার ২৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে, "আমি আমার বান্দা মুহাম্মদের প্রতি যা নাজিল করেছি তাতে যদি তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকে, তাহলে অনুরূপ একটি সূরা তৈরি করে আনো।" কিন্তু তারা এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে পারেনি, অথচ কুরআনে মাত্র ৩ থেকে ৪ আয়াতবিশিষ্ট ছোটো সূরাও আছে।'

'হয়তো কেউ সেভাবে চেষ্টা করেনি।'

'মুচকি হেসে বললাম, আপনি তাহলে জানেন না। তখনকার শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতেরা সবাই একত্রিত হয়ে এমন একটি ছোটো সূরা বানানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সম্পূর্ণ সূরা তো দূরের কথা একটা লাইন পর্যন্ত বানাতে পারেনি। এক সাহাবি সূরা কাউসার-এর প্রথম দুই আয়াত কাবা শরিফে লিখে আসেন, "ইন্না আতাইনা কাল কাউসার, ফাসাল্লি লি-রাব্বিকা ওয়ান-হার।" তখন মক্কার শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণ একত্রিত হয়ে দিনের পর দিন চেষ্টা করেও এর মতো ছন্দ রচনা করতে পারেনি। অবশেষে তারা লিখে নিয়ে এলো, "লাইসা হাজা কালামিল বাশার অর্থাৎ এইটা কোনো মানুষের কথা নয়।"[৭০] তখনকার বিদ্যানরা কেউ চ্যালেঞ্জে টিকতে পারেনি। এই চ্যালেঞ্জ অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের

---

৭০. রহমাতুল্লিল আলামিন, আল্লামা কাযি মুহাম্মদ সুলাইমান রহ., ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা : ২৯৮

জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। এখনও প্রায় ২ লক্ষ খ্রিষ্টান আছে যারা জন্মগতভাবেই আরবিভাষী। তাদের অনেক পণ্ডিতই কুরআনের বিরোধিতায় উঠে পড়ে লেগেছিল কিন্তু এই চ্যালেঞ্জের সামনে বিন্দুমাত্র টিকতে পারেনি। আর কুরআন সেটা আগেই বলে দিয়েছিল এবং "তোমরা তা কখনোই করতে পারবে না।"'[৭১]

'সাবাশ বাপের বেটা। ঠিক কথা কইছিস। এই করিম ভাই, ভাতিজারে একটা বিস্কুট দে। প্রয়োজনে বিল আমি দিমু।'

জমির চাচার চোখে মুখে উচ্ছাসের ভাব ফুটে উঠল। কিন্তু আমি বুঝতে পারলাম না, দুজন মানুষের জন্য একটা বিস্কুট কেন? জাকির ভাই ওনার কথায় অনেকটা বিব্রত হয়ে আমার দিকে চেয়ে বললেন,

'এই চ্যালেঞ্জ সরাসরি আছে?'

'অবশ্যই। এখনও যদি কেউ এই চ্যালেঞ্জে সফল হতে পারে, তাহলে খুব সহজেই প্রমাণিত হয়ে যাবে কুরআন আল্লাহর বাণী নয়। শুধু তাই নয়, সেই সময়ের জন্য কুরআনের তাৎক্ষণিক ভবিষ্যদ্‌বাণীর চ্যালেঞ্জ ছিল। যাতে তারা (মুশরিকরা) খুব সহজে কুরআনকে ভুল প্রমাণিত করতে পারে। ধরুন, আপনাকে চ্যালেঞ্জ করলাম, আপনি ১-২০ পর্যন্ত গুণতে পারবেন না। তখন আপনি কী করবেন?'

'কী আর করব, তোকে ভুল প্রমাণ করার জন্য দ্রুতই গুনে দেখাব। এটাই তো স্বাভাবিক।'

'ঠিক বলেছেন, চ্যালেঞ্জ ভুল প্রমাণ করতে ১-২০ পর্যন্ত গুনে দেবেন। এবার দেখুন, সূরা লাহাবে বলা হয়েছে, "আবু লাহাব ও তার স্ত্রী জাহান্নামে ধ্বংস হবে অর্থাৎ তারা কখনো ঈমান আনবে না।" এটা ছিল আপনার ১-২০ গণনার মতো সহজ একটা চ্যালেঞ্জ।'

'কেমন করে?' বেশ আশ্চর্য হয়ে জানতে চাইলেন জাকির ভাই। আগ্রহী চোখে আমার দিকে চেয়ে থাকলেন জমির চাচা।

'এই চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়ার পর যদি তারা ঈমান আনত, তাহলে কুরআন তখনই ভুল প্রমাণিত হয়ে যেত। সূরাটি অবতীর্ণ হওয়ার পরবর্তী দশ বছর পর্যন্ত

---

[৭১]. সূরা বাকারা-০২ : ২৪

তারা বেঁচে ছিল। কিন্তু এই দীর্ঘ সময় বেঁচে থাকার পরও তারা ঈমান আনেনি। অথচ তার অনেক বন্ধু, যারা কিনা ইসলামের ঘোরতর শত্রু ছিল, তারাও ঈমান এনেছিল।'

'কোরানে বলা হলো, আর তারা ঈমান আনেনি, ব্যাস তাতেই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা হয়ে গেল? এটা তো কাকতালীয়ও হতে পারে।'

'এটা না হয় আপনার কাছে কাকতালীয় মনে হলো। আরও একটি প্রমাণ দিচ্ছি। সূরা বাকারার ৯৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে– "তাদেরকে বলো, তোমরা মৃত্যু কামনা করো।' পরের আয়াতে আবার বলা হয়েছে– "কিন্তু তারা কখনো মৃত্যু কামনা করবে না।"

চিন্তা করুন, তাদের জন্য কাজটি কিন্তু খুব সহজ ছিল। তারা বলতে পারত কুরআন মিথ্যা। দেখো, আমরা মৃত্যু কামনা করছি। কিন্তু তারা সেটিও করতে পারেনি।'

'এখানে কিছু সাইকোলজিক্যাল ব্যাপার আছে। যেমন ধর, আমি জানি তুই একটা গোঁড়া টাইপের ছেলে, কখনো ধর্মে অবিশ্বাস করবি না। এখন যদি চ্যালেঞ্জ দিই, মিরাজ কখনো ধর্মে অবিশ্বাস করবে না। আসলেও তাই হলো। এটা কি আমার চ্যালেঞ্জজয় বলা হবে? না। কারণ, আমি তোকে রিড করে কথাটা বলেছি। নবি মুহাম্মদও খুব চালাক ছিল। সে আবু লাহাবকে জন্ম থেকে চেনে। তাই তাকে রিড করেই কথাটা বলেছে, এতে অলৌকিকত্বের কী আছে?'

'ভাইয়া, আপনি মানবেন না সেটা বলেন। আচ্ছা, কুরআন শুধু সামসময়িক বিষয়ের ব্যাপারে চ্যালেঞ্জ করেছে এমন তো না; বরং সেই সময় থেকে অনেক দূরবর্তী সময়ের বিষয়েও ভবিষ্যদ্বাণী করেছে। যা ছিল এক একটা প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ, সে সম্পর্কে কী বলবেন?'

'যেমন?'

'যেমন, সূরা রুম-এ রোমানদের সম্পর্কে বলা হয়েছে– "তারা (রোমানরা) শীঘ্রই বিজয়ী হবে।" ভবিষ্যদ্বাণীর মাত্র ১০ বছর পর সত্যি সত্যিই পারস্যরা রোমানদের কাছে অকল্পনীয়ভাবেই পরাজিত হলো। এরকম অনেক ভবিষ্যদ্বাণী পূরণ হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ।'

'এখানে আলহামদুলিল্লাহ বলার কিছু নেই। রাজনৈতিক অবস্থা, দূরদর্শিতা এবং পরিস্থিতির ওপর ডিপেন্ড করে এসব বলা যায়। যেমন, পরিস্থিতির ওপর

ডিপেন্ড করে এখন অনেকেই বলছে, আর কয়েক বছর পর হয়তো বিশ্বের সার্বিক ক্ষমতা থাকবে রাশিয়া, চীন কিংবা জাপানের হাতে।[৭২] কয়েক বছর পর তাদের হাতে ক্ষমতা গেলে, এটা কারও ভবিষ্যদ্‌বাণী পূরণ হয়েছে বলে ক্রেডিট নেওয়ার কিছু নেই।'

'ঠিক আছে। কিন্তু আমি যদি বলি মায়ানমার থেকে আসা রোহিঙ্গারা আমেরিকা বিজয় করবে? আপনি কি একথা বিশ্বাস করবেন?'

জাকির ভাই আমার প্রশ্ন শুনে হেসে ওঠে বললেন, 'পাগল হয়েছিস? চিন্তা করা যায় এসব? রোহিঙ্গাদের আমেরিকা বিজয়! হা হা হা ...'

'রোমানদের বিজয় নিয়ে কুরআনের আয়াত নাজিল হওয়ার পরে মক্কার মুশরিকরাও এরকম ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে অট্টহাসিতে ভেঙে পড়েছিল। কারণ, তখন এটা এতটাই অসম্ভব ছিল যে, এই ভবিষ্যদ্‌বাণীর সত্যতাকে চ্যালেঞ্জ করে উবাই ইবনে খালফ ১০০ উটের বাজি ধরেছিল। চিন্তা করতে পারেন? কতটা নিশ্চিত থাকলে সেই যুগে ১০০ উটের বাজি ধরতে পারে! বিখ্যাত ঐতিহাসিক Gilbon তাঁর *Decline and Fall of the Roman Empire* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, সে সময় রোমানদের অবস্থা এমন ছিল, পারস্যদের সঙ্গে তাদের বিজয়ের কথা কেউ কল্পনাও করতে পারত না।[৭৩]

'শোন, রাজনীতির খেলা বেশ জটিল। যেকোনো সময়, যে কেউ, যে কারও ওপর বিজয় লাভ করতে পারে। তুই এসবের কী বুঝবি? অন্য কোনো যুক্তি থাকলে বলতে পারিস।'

'ক্যান? অন্য কোনো যুক্তি ক্যান? এটাই তো লিগ্যাল যুক্তি। তুই মানবি না সেইটা বল। আমার দিকে তাকিয়ে, "বাবা তুমি বিস্কুট খাও তো।" বেশ উত্তেজিত হয়ে বললেন জমির চাচা। আমি চাচাকে শান্ত করে জাকির ভাইয়ের দিকে ফিরলাম।

'দেখুন, আমি শুধু আপনাকে বলে যাব, না মানলে তর্ক করার অভ্যেস আমার নেই। অন্য একটা ভবিষ্যদ্‌বাণীর কথা বলি। অবশ্য আমরা তা মিডিয়ার কল্যাণে নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছি। তা হলো খ্রিষ্টপূর্ব ১০০০ অব্দের কাছাকাছি সময়ে,

---

[৭২]. সার্বিক ক্ষমতা শুধু আল্লাহ সুবহানু ওয়া তাআলার।

[৭৩]. Decline and Fall of the Roman Empire, Gilbon, vol-11, page-788, Modern Library, New York

আজ থেকে প্রায় ৩০০০ বছর পূর্বে, ইসলামের আরেকজন নবি মূসা (আ.) যখন ফেরাউনকে[৭৪] ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলেন, তখন সে অহংকার করে তা প্রত্যাখ্যান করেছিল। মূসা (আ.)-এর সঙ্গে তার সংঘাতও হয়েছিল। পরবর্তীকালে মূসা (আ.) ও তাঁর অনুসারীদের ধাওয়া করতে গিয়ে সেই ফেরাউন তার দলবলসহ সাগরে নিমজ্জিত হয়ে প্রাণ হারায়। ফারাওদের মৃতদেহ কোথায় ছিল বলতে পারেন?'

'ঐতিহাসিকরা তো বলছে, মিশরের রাজধানী কায়রো থেকে ৭/৮ কিলোমিটার দক্ষিণে থেবিসের সমাধি ক্ষেত্রে।' বললেন জাকির ভাই।

'হ্যাঁ, একদম ঠিক বলেছেন। ফেরাউনের এই মৃতদেহ প্রত্নতাত্ত্বিক লরেট আবিষ্কার করেন ১৮৯৮ সালে। তার আগ পর্যন্ত আরববাসী তো দূরে থাক, বিশ্বের কেউই এই সম্পর্কে কিছুই জানত না। পরবর্তীকালে ১৯৭৫ সালের জুন মাসে এই মমি নিয়ে গবেষণা করার অনুমতি দেওয়া হয়।[৭৫] যেনতেন লোককে কিন্তু গবেষণা করতে দেওয়া হয়নি। বিশ্বের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রত্নতাত্ত্বিক মমি গবেষককে দেওয়া হয়েছিল।'

'জানি জানি, ফ্রান্সের বিজ্ঞানী ড. মরিস বুকাইলিকে দেওয়া হয়েছিল।'

'ভাইয়া দেখছি বেশ ভালোই খবর রাখেন।' বলেই একবার চাচার দিকে তাকালাম। চাচা একদৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছেন। এসব জটিল আলোচনা চাচা বুঝছেন কি না আল্লাহই ভালো জানেন। জাকির ভাইয়ের কথায় আবার আলোচনায় ফিরে এলাম।

'তুই কি শুধু নিজেকেই সবজান্তা সমশের মনে করিস?'

'তা আর কই মনে করলাম। আপনার পিচ্চি ডাকের গণ্ডি থেকে বের হয়ে আসার চেষ্টা করছি মাত্র।'

'তাই নাকি? যাক, তোকে তাহলে তো আর পিচ্চি বলা যাচ্ছে না রে। আচ্ছা থাক সে কথা, তারপর কী হলো বল।'

---

৭৪. ফেরাউন কোনো একজন ব্যক্তির নাম নয়। এটি রাজবংশের 'Dynasty' নাম। মূসা (আ.)-এর সময়ের রাজার নাম কুরআনে উল্লেখ করা হয়নি। ঐতিহাসিক ও গবেষকগণ তাঁর নাম স্থির করেছেন 'মরনেপতাহ' যিনি ছিলেন সম্রাট ২য় রামেসিসের পুত্র।

৭৫. The Bible, the Quran and Science. Dr. Maurrice Bucaille, p-156

'ড. মরিস বুকাইলি বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আশ্চর্য হলেন এই ভেবে যে, এই লাশ তো তার সঙ্গের অন্যান্য লাশগুলোর মতো পঁচে যাওয়ার কথা। কিন্তু এখনও টিকে আছে কীভাবে? তিনি জানতে পারলেন কুরআনে ফারাওর কথা বলা আছে। নিশ্চিত হওয়ার জন্য ফারাও সম্পর্কে বলা কুরআনের বক্তব্য নিয়ে গবেষণা শুরু করে দিলেন। পেয়েও গেলেন সূরা ইউনুসের ৯০-৯২নং আয়াত।'

'তোরা সব সময় শুধু সবকিছুতেই কোরানে টেনে নিয়ে আসিস। আচ্ছা বল, তোদের কোরানে এ ব্যাপারে কী বলা আছে?' বেশ বিরক্তির সঙ্গে বললেন জাকির ভাই।

'এই আয়াতে বলা হয়েছে– "আমি (আল্লাহ) বনি ইসরাইলকে সমুদ্র পার করে দিলাম। অতঃপর ফেরাউন তার সৈন্যদলসহ অন্যায় ও বিদ্বেষবশত তাদেরকে ধাওয়া করল। অবশেষে যখন সে ডুবতে লাগল, তখন বলতে লাগল, যে কথায় বনি ইসরাইল বিশ্বাস করেছে, আমিও তাতে বিশ্বাস করলাম যে, তিনি ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই এবং আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত। (তখন আমি বললাম) এখন (ঈমান আনছ)? অথচ ইতঃপূর্বেই তুমি অবাধ্য ছিলে এবং অশান্তি সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে। অতএব, আজ আমি তোমার দেহকে রক্ষা করব, যেন তুমি তোমার পরবর্তীদের জন্য নিদর্শন হয়ে থাকো। আর নিঃসন্দেহে অনেক লোকই আমার নিদর্শনাবলি হতে উদাসীন।" মমি নিয়ে গবেষণা করে এবং কুরআনের বর্ণনা দেখে ড. বুকাইলি খুব অভিভূত হয়ে কুরআন সম্পর্কে আরো গবেষণা করেন, পরবর্তীকালে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।'

'সুবহান আল্লাহ। এত বড়ো বৈজ্ঞানিক কুরআনের কথা বুঝল কিন্তু তুই বুঝলি না। তুই তো শুধু খাই খাই লম্বা হইছিস। এই জন্য বুদ্ধি হাঁটুর নিচে। এই করিম, আরও এক কাপ চা দে তো। এবার জমছে খেলা। চালাও বাবা...'

আমি চিন্তা করলাম, চা তো এখনই খেলাম। আবার কী দরকার? কিন্তু পরক্ষণে লক্ষ করলাম, চা আমার দিকে না এসে চলে গেল চাচার হাতে। হাত থেকে সোজা মুখে। জাকির ভাই চাচার কথায় কিছুটা অপমানবোধ করলেও পরিস্থিতির চাপে তা প্রকাশ করলেন না। আমি আবারও শুরু করলাম,

'প্রাচীন মিশর সম্পর্কে আরও চমকপ্রদ তথ্য আছে কুরআনে। আচ্ছা বলেন তো, বর্তমান মিশরের পিরামিডকেন্দ্রিক যে অঞ্চল আছে সেটা কেমন?'

'পুরোটাই তো মরুভূমি।'

'এটা তো জানেন যে, ইতিহাসবিদরা সকলে একমত; বর্তমানে আমরা যে পিরামিড দেখি, তা প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার শাসক ফারাওদের হাতেই নির্মিত।'

'হুম...'

'আচ্ছা, সে সময় মিশরের অবস্থা কেমন ছিল?'

'কেমন আর থাকবে! এখন যা আছে, তখনও তা ছিল। ওই মরুভূমিই তো...'

'আমি আগেই অনুমান করেছিলাম যে, এটাই বলবেন। অবশ্য আমিও এটাই জানতাম। আমরা তো দূরের কথা, এমনকি প্রত্নতত্ত্ববিদরাও বিশ্বাস করতেন যে, বর্তমান মিশরের পিরামিড অঞ্চলকে আমরা যেরকম দেখছি, আজ থেকে ৫০০০ বছর আগে ফেরাউনদের সময়টাতেও ঠিক এরকমই ছিল।'

'সবাই তো এটাই জানে। এতে এত আশ্চর্য হওয়ার কী আছে বুঝলাম না?'

'কিন্তু প্রত্নতত্ত্ববিদদের খুব সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা যায় যে, আজকের মিশরের পিরামিড অঞ্চলকে আমরা যেরকম মরুভূমিময় দেখছি, প্রাচীনকালে এই অঞ্চল এমন ছিল না। অর্থাৎ আজ থেকে ৫০০০ বছর আগে যখন পিরামিডের মতো এসব স্থাপত্যশিল্প নির্মিত হচ্ছিল, তখন সে অঞ্চল মরুভূমি বা বালুময় ছিল না।'

'কী উলটা-পালটা বলছিস তুই? মরুভূমি ছিল না তো কি মহাসমুদ্র ছিল?'

'আরে ভাইয়া, এবার দেখছি আপনি ব্যাকডেটেড হয়ে গেলেন?'

'শোন পিচ্চি, একবার বলেছি না শমসের হওয়ার চেষ্টা করবি না।'

'দেখুন ভাইয়া আপনি কিন্তু...'

'আচ্ছা বাদ দে। তোর কাল্পনিক গল্প শুরু কর।'

'ভাইয়া, আপনার কাছে এসব কাল্পনিক গল্প মনে হলেও এ ঘটনাগুলো পৃথিবীর বুকেই ঘটেছিল। যাহোক, আমরা যেন কোথায় ছিলাম?'

'ফারাও আমলের মরুভূমিতে। তোমরা মনে করেছ আমি ভুলে গেছি? হা হা হা, বয়স হইবার পারে, কিন্তু স্মরণশক্তি জোয়ান আছে।' রসিকতার ছলে আবারও চাচার স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ।

'হা হা হা। না চাচা, আমরা মরুভূমিতে যাইনি। করিম চাচার চায়ের দোকানেই ছিলাম।' এই প্রথম জাকির ভাই চাচার কথায় উত্তর দিলেন।

'হ হ। জীবন-যৌবন সবই তো কাটল করিমের দোকানে। এখান ছাড়া আর যাইব কই? তা বাবা তুমি শুরু করো তো। ফালতু কথা কইয়া কাম নাই।'

জমির চাচার কথা শুনে একটা মুচকি হাসি দিয়ে মূল আলোচনায় আবার ফিরে এলাম।

'ওকে, মূল পয়েন্টে আসি। ব্রিটিশ পত্রিকা *ডেইলি মেইল* ২০১২ সালে Great civilizations more than 4000 years ago নামে একটি সংবাদ কাভার করে। সেখানে প্রত্নতত্ত্ববিদরা তাদের গবেষণার ফসল হিসেবে জানিয়েছেন, আজ থেকে ৪৫০০-৫০০০ বছর আগে মিশরের এই অঞ্চলগুলো ছিল সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা। এখানে নদী ছিল, ঝরনা ছিল, পাহাড় ছিল। এই নদী, পাহাড়, ঝরনার পাশেই গড়ে উঠেছে তখনকার সেই সভ্যতা। কিন্তু জলবায়ুর পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খেতে না পেরে ধ্বংস হয়ে বর্তমান মরুভূমির বালুকাময় অবস্থায় পরিণত হয়েছে মিশর।'[৭৬]

'আসলেই চমৎকার ইতিহাস। ঠিক যেন আরব্য উপন্যাস। বলে যা...'

'শুধু ইতিহাস নয়, ইতিহাসের ইতিহাস। *ডেইলি মেইল*-এর আরেকটি সংবাদ কাভারে US Geological Survey-এর Marcia McNutt বলেন, "যদিও বৃহৎ ক্ষমতাশীল নির্মাতারা ৪০০০ বছর আগে প্রাচীন মিশরে পিরামিড নির্মাণ করে তাদের ক্ষমতা প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়েছে; কিন্তু প্রকৃতির আক্রমণ প্রতিরোধে তারা কিছুই করতে সক্ষম হয়নি।"'[৭৭]

'আই অ্যাম এক্সট্রেমলি শকড!' বেশ আশ্চর্য হয়ে আমার দিকে ঝুঁকে পড়লেন জাকির ভাই।

---

৭৬. http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2151143/Climate-change-wiped worlds-great- civilisations-4-000-years-ago.html

৭৭. http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2189802/Egyptian-kingdom-died-4-200-years-ago-following-mega-drought-caused-climate-change.html

'অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির প্রত্নতত্ত্ববিদ প্রফেসর মাইকেল পেত্রাগলিওফ বলেন, "বালির নিচে হারিয়ে যাওয়া তথ্য উদ্‌ঘাটনে আমরা জানতে পারি যে, প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার মূলে ছিল নদী-নালা। যার ফলে মূলত ফারাওরা ৫০০০ বছর আগে এত সুবিশাল রাজ্য স্থাপনে সক্ষম হয়।"'[৭৮]

'অনেস্টলি বলছি, আমার কাছে সব রূপকথার গল্পের মতো মনে হচ্ছে।'

'তা তো হওয়ারই কথা। এখন যে মরুভূমিময় অঞ্চল আমরা দেখছি, ফারাওদের সময় এরকম ছিল না। ৫০০০ বছর আগে এটি একটি সবুজাভ সভ্যতা ছিল। নদ-নদী, গাছপালা সব ছিল।'

'অস্থির তো।'

'তার চেয়ে বেশি অস্থির হলো, কুরআন ফারাওদের নিয়ে কথা বলেছে, কথা বলেছে সে সময়ের মিশরের অবস্থা সম্পর্কে। কুরআন বলছে— "ফেরাউন তার সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘোষণা দিলো। বলল, হে আমার সম্প্রদায়! মিসরের রাজত্ব কি আমার নয়? আর এসব নদ-নদী (যা আমার প্রাসাদের) নিচ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে, তোমরা কি তা দেখো না?"'[৭৯]

'এসব কোরানে আছে?'

'হ্যাঁ, কুরআনেই আছে! কুরআন সেই সময়কার ঘটনা উল্লেখ করতে গিয়ে তাদের অঞ্চলে নদ-নদীর অস্তিত্বের কথাও বলছে। সূরা শূ'আরাতে বলা হয়েছে— "এবং আমি তাদেরকে বিতাড়িত করলাম উদ্যানরাজি এবং ঝরনাসমূহ থেকে।"[৮০] এখানেও ফেরাউনের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে তার সময়কার উদ্যান এবং ঝরনার কথা বলেছে।'

'আর কিছু?'

'আরও একটি আয়াতে বলা হয়েছে— "তারা পশ্চাতে রেখে গিয়েছিল কত উদ্যান এবং ঝরনাধারা। কত শস্যক্ষেত এবং অভিজাত অট্টালিকা।"[৮১] এই আয়াতেও

---

[৭৮]. EcoAlert: Satellite Images Reveal an Ancient Network of Rivers in Arabian Desert, http://www.dailygalaxy.com/my_weblog/2012/05/ecoalert-satellite-images-reveal-an-ancient-network-of-rivers-in-arabian-desert-.html

[৭৯]. সূরা যুখরুফ-৪৩ : ৫১

[৮০]. সূরা শূ'আরা-২৬ : ৫৭

[৮১]. সূরা দুখান-৪৪ : ২৫-২৬

ফেরাউন (ফারাওদের) এবং তাদের শেষ পরিণতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে উদ্যান, ঝরনাধারা, শস্যক্ষেত এবং অভিজাত অট্টালিকার কথা বলা হয়েছে। যা প্রত্নতত্ত্ববিদরা আধুনিক বিজ্ঞান ব্যবহার করে অনেক জটিল পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা নিশ্চিত হয়ে আমাদেরকে এই তথ্য দিয়েছেন।'

'তুই বলার আগে এসব আমি জীবনে কখনো শুনিনি!'

'শুনবি ক্যামনে? তোর জীবন হইছে কতটুকু, আর তুই কি কোনো লেখাপড়া করিস? সারা দিন টই টই করে ঘুরে বেড়াস। আর কস আল্লাহ নাই, আল্লাহ নাই। যেদিন জাহান্নাবে ঢুকবি সেদিন বুঝবি যে আল্লাহ আছে কী নাই?'

আমি চাচার কথায় বিব্রত হলাম। ওনাকে শান্ত করে জাকির ভাইয়ের দিকে মনোযোগ দিলাম।

'না শোনাটা একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু কবে এই ঘটনা উদ্ঘাটন করেছে বিজ্ঞানীরা, জানেন? মাত্র সেদিন। মাত্র সেদিন তারা জানালেন যে, এত দিনের ধারণা আসলে ভুল। প্রাচীন ফারাওরা কখনোই মরুভূমির লোক ছিল না। তারা শস্য-শ্যামল, সবুজাভ প্রকৃতির মধ্যে বাস করত। তাদের অভিজাত অট্টালিকা, পিরামিড ইত্যাদি মরুভূমিতে নির্মিত হয়নি। তা হয়েছে নদীর পাড়ে, নদীর অববাহিকায়। অথচ কুরআনে প্রাচীন মিশরের ফারাওদের রাজত্বকালে তাদের অঞ্চলের আশপাশে নদ-নদীর যে অস্তিত্ব ছিল, তা স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয়েছে প্রায় সাড়ে চোদ্দোশত বছর আগে।'

'অসাধারণ তথ্য দিলি! আসলেই আরব্য উপন্যাস।'

জাকির ভাই হেঁয়ালি করলেন নাকি সিরিয়াসলি বললেন, কিছুই বুঝতে পারলাম না। আমি বলতেই থাকলাম...

'আরও এমন অনেক ঐতিহাসিক নিদর্শন বর্ণনার প্রমাণ রয়েছে। অনেক ভবিষ্যদ্বাণী আছে যেগুলোর অনেকগুলো ইতোমধ্যে প্রমাণিত হয়েছে। আর কিছু আছে ভবিষ্যতের জন্য, যার সত্যতা পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার আগে মিলবে। এবার আপনিই বলেন, কুরআন যদি একজন নিরক্ষর লোকের কথা হয়ে থাকে তার পক্ষে কি হাজার বছরের অতীত এবং সমসাময়িক হতে শত বছর পর পর্যন্ত এত চ্যালেঞ্জ, এত ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব?'

এবার জাকির ভাই কথা বললেন না। সত্যি সত্যি তার কপালে চিন্তার রেখা দেখা দিলো। আমি বললাম,

'এবার আসুন, আমরা খুব সহজে বিজ্ঞান দিয়ে যাচাই করে দেখি।'

'অবজেকশন ইউর অনার।'

'ওকে অবজেকশন গ্রান্টেড। বলে ফেলুন ভাইয়া...'

'তোদের আর এই স্বভাবটা গেল না। সব সময় তোরা সবার কাছে কুরআনকে বিজ্ঞান দিয়ে প্রমাণ করতে চাস কেন?'

'এই প্রশ্নটি ভেরি লজিক্যাল অ্যান্ড ইমপরট্যান্ট। দেখুন ভাইয়া, শুধু বিজ্ঞান দিয়ে কুরআনের সত্যতা প্রমাণ করাতে যাই একথা ঠিক নয়। অনেকভাবেই কুরআনের সত্যতা যাচাই করা যায়। কিন্তু আপনি আমি তো সামান্য বিজ্ঞান আর ঐতিহাসিক জ্ঞান ছাড়া অন্য কিছু জানি না।'

'অন্য কিছু বলতে কী বোঝাচ্ছিস?' বেশ গম্ভীর গলায় বললেন জাকির ভাই।

'যেমন, কুরআন নাজিলের সময়টা বিজ্ঞানের যুগ ছিল না। তখন ছিল সাহিত্যের যুগ, অলৌকিকতার যুগ। এজন্য সে সময়ের মক্কার মুশরিকরা যারা কুরআনকে আল্লাহর বাণী বিশ্বাস করত না তারা বলত, মুহাম্মদ তো কবি হয়ে গেছে,[৮২] মুহাম্মদ তো জাদুকর হয়ে গেছে।[৮৩] কুরআনে এমন কী আছে যাতে তখনকার পণ্ডিতরা মুহাম্মদ ﷺ-কে কবি বলত, আশ্চর্য হতো? জাদুকর বলত? আচ্ছা ভাইয়া, আপনার মোবাইলে ডাটা আছে না?'

'হুম, আছে।'

'একটা কাজ করুন, সূরা তাকভির লিখে ইউটিউবে সার্চ দিন প্লিজ।'

এরপর আমরা খুব সুন্দর সুরে ছোটো একটি ছেলের কণ্ঠে সূরাটি শুনলাম, এই যে শুনলে সূরাটির আরবি ছন্দ–

---

[৮২]. সূরা আম্বিয়া-২১ : ৫, সূরা তূর-৫২ : ৩০
[৮৩]. সূরা মুদ্দাস্‌সির-৭৪ : ২৪

ইযাশ শামসু কুওয়িরাত-
ওয়া ইযান নুজুমুন কাদারাত-
ওয়া ইযাল জিবা-লু সুইয়িরাত-
ওয়া ইযাল ইশা-রু উত্তিলাত-
ওয়া ইযাল উহুশু হুশিরাত-
ওয়া ইযাল বিহা-রু সুজ্জিরাত-
ওয়া ইযান নুফুসু যুওয়িজাত-
ওয়া ইযাল মাওউদাতু সুয়িলাত-
বিআইয়ি যাম্বিন কুতিলাত-
ওয়া ইযাছ ছুহুফু নুশিরাত।[৮৪]

'আহ হা। পরানটা জুরায়া গেল। কী সুন্দর তেলওয়াত! আর একবার দাও তো শুনি।' আগ্রহ নিয়ে বললেন জমির চাচা।

'চাচা পরে এক সময় শোনাব।' আমার কথা শুনে চাচা আর কথা বাড়ালেন না। আমি বলতে থাকলাম, 'খেয়াল করুন ভাইয়া, এখন এই অংশটুকুর যদি আমি অনুবাদ করে বলি, তা হবে এই রকম,

যখন প্রভাহীন হবে এ শশী,
যখন খসে পড়বে নক্ষত্ররাজি,
যখন পাহাড়-পর্বত হবে চলমান,
যখন পূর্ণ-গর্ভা উষ্ট্রী হবে উপেক্ষমান,
যখন বন্য পশু-পাখী জড় হয়ে এক,
যখন উদ্বেলিত করা হবে সমুদ্রসমেত,
যখন দেহাত্মা পুনরায় হবে সংশ্লেষ,
যখন প্রোথিত কন্যাকে হবে জিজ্ঞেস,
কী ছিল পূর্বে তার প্রোথিত কারণ?,
যখন আমলনামা হবে উন্মোচন।

'বাংলা ছন্দে কেমন লাগল আপনার কাছে?'

---

৮৪. কুরআনের আরবিকে বাংলায় লিখলে তা কখনো পরিপূর্ণ শুদ্ধ হয় না। তাই কুরআন পড়তে হবে আরবি দেখে। বাংলা বা ইংলিশ উচ্চারণ দেখে কুরআন পড়া সঠিক নয়।

'হুম, কথাগুলো হওয়ার কথা গদ্য। কিন্তু গদ্যের পদ্যরীতি। ভালোই...'

'কিন্তু যে লোক আরবি ব্যাকরণ জানে তাকে যদি আপনি এই সূরার আরবি ছন্দের সঙ্গে এই বাংলা অনুবাদের ছন্দের মিল কেমন তা জিজ্ঞেস করেন, সে এক শব্দে উত্তর দেবে, "ডিজগাস্টিং"।'

'এখানে ডিজগাস্টিং বলার কী আছে?'

'কারণ, কুরআনের ভাষাশৈলী এতই উঁচু মানের যে, এসব অনুবাদ তার সঙ্গে তুলনাই করা যায় না। কিন্তু আমরা কি এর পার্থক্য বুঝতে পারব? নাহ, পারব না।'

'এটা তো খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। কারণ, আমরা তো আর আরবি জানি না।'

'আপনি আরবি জানলেও বুঝতে পারতেন না। আরবি ব্যাকরণের গভীর জ্ঞান না থাকলে বোঝা সম্ভব নয়। কারণ, সাধারণ আরবি আর কুরআনের আরবি এক নয়।'

'একই ভাষা সাধারণত একইরকম হওয়া উচিত কিন্তু কুরআনে আরেক রকম! তোর কথা তো উলটা-পালটা লাগছে, কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'আপনাকে কুরআনের ব্যাকরণের একটু ডেমো দিই। তাতেই আপনি ক্লিয়ার হবেন আশা করি।'

'আচ্ছা আপনি প্যালিনড্রোম বুঝেন?'

'কেন বুঝব না? কোনো শব্দের শেষ এবং শুরু, যেদিক থেকেই লেখি না কেন ওই শব্দটির রূপ একই থাকবে। যেমন একটি শব্দ RACECAR। এই শব্দটিকে যদি শেষের দিক থেকে লেখি তাহলেও হবে RACECAR। এটাই প্যালিনড্রোম।' বলার সঙ্গে সঙ্গে জমির চাচার কাছ থেকে কাগজ আর কলম নিয়ে লিখে দেখিয়ে দিলেন জাকির ভাই।

'উদাহরণটা দারুণ দিয়েছেন ভাই। এবার আমিও আপনাকে একটি আয়াতাংশ দেখাই। দেখুন, সূরা ইয়াসিন-এর ৪০ নম্বর আয়াতে গ্রহ-নক্ষত্রের কথা বলতে গিয়ে বলা হয়েছে— "কুল্লুন ফি ফালাকিন ইয়াসবাহুন" অর্থাৎ প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণ করে। খেয়াল করুন, "কুল্লুন ফি ফালাকি" অংশটুকু প্যালিনড্রোম।'

'কীভাবে?'

আমি জাকির ভাইয়ের হাত থেকে কলমটি নিয়ে বললাম, 'আমি লিখছি খেয়াল করুন সহজে বুঝতে পারবেন।
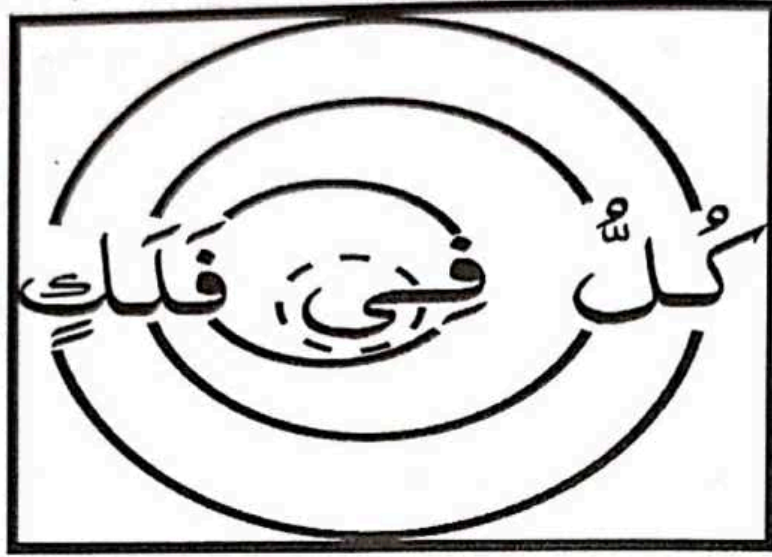
প্রথম এবং শেষ দিক থেকে কাফ দিয়ে শুরু। তারপর সিরিয়ালে লাম এবং ফা। আপনি যেভাবেই লেখুন না কেন আরবি টেক্সট একই থাকবে।'

'প্যালিনড্রোম এমনিতেই মজার ব্যাপার...'

'আসল মজা তো এখনও দেখেননি। এবার আসলটা দেখুন। মাঝখানের "ইয়া" অক্ষরটি খেয়াল করুন। ইয়া অক্ষরটি কিন্তু ঠিক কেন্দ্রে অবস্থিত এবং ইয়া-এর দুপাশে অন্য অক্ষর বা হরফগুলো প্যালিনড্রোম আকারে বিন্যস্ত। অ্যারো চিহ্নগুলো দেখুন, ইয়া-কে কেন্দ্র করে যদি হরফগুলো ঘুরতে থাকে, তাহলে প্রত্যেকটি হরফের জন্য আলাদা আলাদা কক্ষপথ থাকে। আল্লাহ শুধু বলেই দেননি, চমৎকারভাবে দেখিয়েও দিয়েছেন যে, সবকিছুরই নির্দিষ্ট একটি কেন্দ্র আছে। আছে আলাদা আলাদা কক্ষপথ। প্রত্যেকেই সেই কক্ষপথে বিচরণ করছে।'

মুখে প্রকাশ না করলেও বিস্ময়ের রেখা ফুটে উঠল জাকির ভাইয়ের কপালে।

'কিন্তু এই অংশটুকু যদি সারা দিন দেখতেন তাহলে কি এই অলৌকিক ভাষাশৈলী বুঝতে পারতেন?'

'তা বুঝতাম না।' বললেন জাকির ভাই।

'আপনাদের তসলিমা আন্টি এই আয়াত থেকে দাবি করেছেন, কুরআন নাকি বলছে সূর্য পৃথিবীর চারপাশে ঘুরছে। আচ্ছা ওনার কথা বলে সময় নষ্ট করে লাভ নেই। মূল কথায় আসি। এভাবে কুরআনের ভাষাশৈলী অলৌকিকত্বে পূর্ণ।

মক্কার মুশরিকরা কুরআনের ভাষাশৈলী দেখে আশ্চর্য হয়ে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে, কুরআন কোনো মানুষের কথা হতে পারে না। আমরা যদি আরবি উচ্চমানের ব্যাকরণ বুঝতাম, তাহলে আমরাও কুরআনকে ব্যাকরণ দিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে পারতাম। কিন্তু আপনি, আমি তো সেসব বুঝি না। তাহলে আমাদের জন্য কি ফলসিফিকেশন টেস্ট করার কোনো অপশন নেই?'

'ব্যাপারটা তুই-ই ভালো জানিস। আমি জানি না।'

এই সময় চাচা কিছু বলতে চাইলেন কিন্তু আমি ইশারা করাতে উনি ওনার নিয়ম ভেঙে চুপ হয়ে গেলেন। উনি কথা বলতে চেয়েছেন কিন্তু বলেননি, এমন উদাহরণ বিরল।

'আছে, বর্তমান সময় হচ্ছে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগ। কুরআন যেহেতু বিজ্ঞান বিষয়েও কথা বলেছে, আর আমরাও যেহেতু একটু-আধটু বিজ্ঞান বুঝি, তাহলে আমাদের জন্য এই অপশনটি হচ্ছে সবচেয়ে বেটার।'

'তাহলে শুরু কর।'

'তবে একটা কথা মাথায় রাখবেন। আমরা সেই বিষয় নিয়ে কথা বলব, যা বিজ্ঞানে নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। যা এখনও প্রমাণিত হয়নি, তা নিয়ে কোনো কথা বলব না। কারণ, বিজ্ঞান যেকোনো মুহূর্তেই U-turn করতে পারে, কিন্তু কুরআন তার বক্তব্যে অনড়। আমি আপনার কাছে খুব অল্প সময়ের মধ্যে সংক্ষেপে কয়েকটি বৈজ্ঞানিক সত্যতা তুলে ধরতে চাই। কোন বিষয়টা দিয়ে শুরু করব বলেন।'

'তুই তোর ইচ্ছেমতো শুরু করে দে। আমি শুনছি।'

'আপনি তো ফিজিক্সের স্টুডেন্ট তাহলে ফিজিক্স দিয়েই শুরু করা যাক।'

জাকির ভাই মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি দেওয়ার পর আমি বলা শুরু করে দিলাম,

'১৯২৯ সালে জ্যোতির্বিজ্ঞানী এডুইন হাবল প্রথম ডপলার ইফেক্ট প্রক্রিয়ায় পর্যবেক্ষণ করেন যে, আমাদের মহাবিশ্ব সম্প্রসারণশীল। গ্রহ, নক্ষত্রগুলো ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে।'

'এসব নিয়ে তো আগেও কথা হয়েছে। রিপিট করার দরকার কী? নতুন কিছু বল।'

'আবার একটু মনে করিয়ে দিলাম আর কি। এখন আপনি বলেন তো, কোন বিখ্যাত বিজ্ঞানী প্রথমদিকে এই তত্ত্বে বিশ্বাস করতেন না?'

'স্যার আইনস্টাইন।'

'হ্যাঁ, শুধু একমত হননি তা কিন্তু নয়; বরং উলটো বিরোধিতা করেছিলেন। কেন বলেন তো?'

'কারণ, তখনো বিষয়টা দৃঢ়ভাবে আবিষ্কৃত হয়নি। তথ্য-প্রমাণের অনেক ঘাটতি ছিল। আমাদের দেশীয় রাজনীতির ভাষায়, একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা।'

'ঠিক বলেছেন। শুরুর দিকে মহামতি আইনস্টাইন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন, এই মহাবিশ্ব স্থির। পরবর্তী সময়ে তিনি তার ভুল স্বীকার করে বলেছেন, সেটাই ছিল তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড়ো ভুল। এ ব্যাপারে পরে আরও বলেছেন— "একটি রহস্যময় স্বতাড়িত বৈশিষ্ট্যের কারণে মহাবিশ্ব ক্রমেই সম্প্রসারিত হয়ে চলছে।" আচ্ছা, এই গবেষণায় সত্যতার কোনো প্রমাণ আছে কি না?'

'পাগল নাকি? কত উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যেমে আবিষ্কার হয়েছে তুই জানিস? ডপলার ইফেক্ট, রেডিও অ্যাস্ট্রনোমি, ফোর্স অব এক্সপেনশন, রেড় শিফ্‌ট ইত্যাদি। এগুলো কি তুই বুঝিস?'

'খুব বেশি বুঝি না ভাইয়া। তবে এবার বলেন তো, এই তথ্য যদি আরব মরুভূমিতে ১৪৫০ বছর আগের কোনো বইয়ে পাওয়া যায়, তা কি আশ্চর্যের বিষয় নয়? কুরআন সূরা জারিয়াহর ৪৭ নং আয়াতে বলছে— "আমরা আকাশ নির্মাণ করেছি আমাদের ক্ষমতাবলে এবং আমরা অবশ্যই এর সম্প্রসারণকারী।"'[৮৫]

'এত পার্ট নেওয়ার কিছু নেই। সেই সময় গ্রিকরা এসব নিয়ে গবেষণা করত। হতে পারে নবি মুহাম্মদ শুনে কপি মেরে দিয়েছে।'

ক্ষিপ্র গতিতে চায়ের কাপটা ধপাস করে টেবিলের ওপর রাখলেন চাচা। শব্দ শুনে আমরা চাচার দিকে তাকালাম। খানিকটা চা টেবিলের ওপর ছলাৎ করে পড়ে গেল। সম্ভবত কিছু বলার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। আমি আবারও তাকে থামিয়ে দিয়ে কথা শুরু করলাম। চাচার বলতে চাওয়া কথা মুখেই আটকে গেল।

---

৮৫. সম্প্রসারণের জন্য কুরআনে আরবি শব্দ 'মুসিউন' ব্যবহার করা হয়েছে।

'আপনি ঠিক আছেন তো? হকিং তাঁর *ব্রিফ হিস্ট্রি অব টাইমে* বলেছেন, "মহাবিশ্ব প্রসারমান। এই আবিষ্কার বিংশ শতাব্দীর বৃহত্তম বৌদ্ধিক বিপ্লবগুলোর অন্যতম। পশ্চাৎদৃষ্টি দিয়ে আমরা অবাক হয়ে ভাবতে পারি, এর আগে কেন কেউ এমনটা ভাবেনি।" আর আপনি বলছেন মুহাম্মাদ ﷺ দেড় হাজার বছর আগে গ্রিকদের কাছ থেকে কপি করেছে?'

জাকির ভাইয়ের মুখের ভাষা যেন কিছুক্ষণের জন্য উধাও হয়ে গেল। জাকির ভাইয়ের এমন চুপ থাকা দেখে, চাচা তার পান খাওয়া দুপাটি দাঁত বের করে ফিক করে হেসে দিলেন। কিছু না বলে অফ মুডে বসে আছেন জাকির ভাই।

আমি চালিয়ে গেলাম, 'একই সময়ে ল্যামেট্রি এবং হাবল আরও বলেন যে, এই আকাশমণ্ডলী সৃষ্টি হয়েছে ২টি পৃথক সময়ে। প্রথম পর্যায়ে, বিগব্যাং-এর পরে শীতল হয়ে ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন কণাগুলো ধুম্রপুঞ্জ গ্যাস মেঘের সৃষ্টি করে। তারপরে কি ঘটেছিল বলতে পারেন?' আমি জাকির ভাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলাম।

'পারব না কেন? মেঘ সৃষ্টি হওয়ার পর হিলিয়াম ও হাইড্রোজেন পরমাণু দ্বারা বস্তু আকারে কেন্দ্রীভূত হয়ে সংকোচনশীল গ্যাসপিণ্ড বৃত্তাকার, উপবৃত্তাকার, সর্পিলাকার ইত্যাদি বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করে। এগুলোকে আমরা এখন গ্যালাক্সি হিসেবে চিনি। অর্থাৎ প্রথম স্টেপে বিভিন্ন প্রকার গ্যালাক্সি ও ধুম্রপুঞ্জ আকাশের সৃষ্টি হয়।'

আমি আবারও জানতে চাইলাম, 'দ্বিতীয় পর্যায়টাও নিশ্চয়ই আপনার জানা আছে?'

'দ্বিতীয় পর্যায়ে গ্যাস বলয়গুলো ভেঙে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এগুলো আবর্তিত হতে হতে জমাট বেধে ছোটো ছোটো বলয়ে বিভক্ত হয়ে চ্যাপ্টা আকৃতি ধারণ করে। গ্যাস ও ধূলিকণার গোলাকার মেঘপুঞ্জকে বলা হয় নীহারিকা। নীহারিকাসমূহ ঘূর্ণন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংকুচিত হতে হতে গোলাকার বস্তুপিণ্ডগুলোকে আলাদা করে দেয়। এই অবশেষে গোলাকার বস্তুপিণ্ডই তৈরি করে সোলার সিস্টেম।'[৮৬] বললেন জাকির ভাই।

মুচকি হেসে জাকির ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে বললাম,

'একই কথা কুরআন সূরা হা-মিম সিজদার ১১ নং আয়াতে বলছে— "অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন, যা ছিল ধুম্রপুঞ্জ বিশেষ।" ১২ নং আয়াতে বলছে— "তিনি সপ্ত আকাশের সব কাজ সমাপ্ত করেন দুটো সময়ে।"

---

৮৬. Astronomy the cosmic journey- W.K Hartman.

একটু স্বচ্ছ বিবেক দিয়ে চিন্তা করে দেখুন তো, কীভাবে মরুভূমির একজন নিরক্ষর ব্যক্তি, যিনি কিনা বাল্যকালে মেষ চড়ানোর কাজ করতেন। তিনি এই জটিল তথ্য কীভাবে জানতে পারেন? যদি না তা স্রষ্টার পক্ষ থেকে তাকে জানানো হয়? কুরআন আরও...'

'আচ্ছা, তোরা দেখছি সবাই ঘুরেফিরে এই আয়াতগুলোই ব্যবহার করিস। কেন, তোদের কুরআন কি আর কোনো তথ্য দেয়নি?' আমি শেষ করার আগেই জাকির ভাই আমার মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে বললেন।

'ভাইয়া দেখুন, আমরা সবাই শুধু এই আয়াতগুলো নিয়ে কথা বলি এইটা ঠিক না। কুরআনে শত শত বৈজ্ঞানিক তথ্য আছে। আমরা যারা দাওয়াতি কাজ করি তারাও অনেক আয়াত নিয়ে কথা বলি। তবে হ্যাঁ, এই আয়াতগুলো সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয়। কারণ, এই বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলো সবচেয়ে বেশি আধুনিক এবং চমকপ্রদ। যে তথ্যগুলো একজন নিরক্ষর মানুষের মাথা থেকে কোনোভাবেই বের হওয়া সম্ভব না।'

'হে হে, তাই নাকি? ঘুরে ফিরে তোমরা ওই বেলতলার নিচেই চলে আসো।' এতক্ষণে বিজয়ীর ভাবটা তুলে ধরে বললেন জাকির ভাই।

'খবরদার বত্রিশ দাঁত বের করে হাসবি না। আগে শোন, ভাতিজা কী কইতে চায়। বাবা তুমি চালাই যাও। করিম ভাই, হা কইরা আবার চাইয়া আছস ক্যান? একটা ডাবল পান বানাই দে তো।'

মনে হলো জমির চাচা জাকির ভাইয়ের ওপর রাগ দেখাতে না পেরে, তা ঝেড়ে দিলো করিম চাচার ওপর। কিন্তু করিম চাচা কোনো রিঅ্যাকশন দেখালেন না। বোঝা গেল জমির চাচার এমন ব্যবহারে করিম চাচা অভ্যস্ত হয়ে গেছেন।

আমি বললাম, 'উড়িয়ে দিচ্ছেন কেন? এই কথাটি বলেছেন ড. আলফ্রেড ক্রোনার।'

'আলফ্রেড ক্রোনা...র, আলফ্রে...ড ক্রোনার... ঠিক মনে পড়ছে না।'

'আরে তিনি জার্মানির মেইনযে অবস্থিত *জোহান্স গার্টনবার্গ ইউনিভার্সিটির* ইন্সটিটিউট অব জিওসায়েন্সিসের ভূতত্ত্ববিদ্যার প্রফেসর ও চেয়ারম্যান ছিলেন।'

'ওহ! কী বলেছেন তিনি?'

তিনি বলেছেন, "মুহাম্মদ যে সময়ে যে স্থানে জন্মগ্রহণ করেছিল, সে সম্পর্কে ভাবলে আমার মনে হয়, তাঁর পক্ষে মহাবিশ্বের উৎপত্তির মতো বিষয় সম্পর্কে জানা একেবারেই অসম্ভব। কারণ, খুবই জটিল ও অগ্রগামী পদ্ধতির মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা মাত্র কয়েক বছর পূর্বে এ বিষয়গুলো জানতে পেরেছে। আমি মনে করি, ১৪০০ বছর পূর্বে কোনো মানুষ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স সম্পর্কে কোনো কিছুই জানত না। সে নিজের মন থেকে এ সম্পর্কে কোনো তথ্য প্রকাশ করতে পারত না। যেমন : একই উৎস থেকে পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রের উৎপত্তি ইত্যাদি।"'[৮৭]

'দু-একটি কথা সত্য হয়ে গেলেই এটা প্রমাণিত হয়ে যায় না যে, কথাগুলো স্রষ্টা বা আল্লাহ থেকে আসা। ইট'স ভেরি সিম্পল। যে কারো হতেই পারে।'

'দু-একটি কথা নয় ভাইয়া। এভাবে কুরআন পদার্থবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞানের মতো জটিল জটিল বিষয়ে শত শত কথা বলেছে। যেসব বিষয়ে আজ থেকে ২০০ বছর আগেও মানুষ তেমন কিছুই জানত না। কুরআন আমাদেরকেই প্রশ্ন করছে যদি এটা আল্লাহর নিকট থেকে না আসে, তাহলে এটা কে অবতীর্ণ করেছে?[৮৮] আচ্ছা ভাইয়া একটি কমন প্রশ্নের উত্তর দিন তো, প্রাণের প্রধান উৎস কী?'

'কী সব বাচ্ছা পোলাপানের মতো প্রশ্ন করিস? এর উত্তর মোটামুটি সবাই জানে। পানিই হলো প্রাণের প্রধান উৎস।'

'কে বলেছে এই কথা? এর প্রমাণই বা কী?' আমি না জানার ভান ধরে জানতে চাইলাম।

'Dr. P.P. Grashe তাঁর *The evolution of living organism* গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করে নিশ্চিত করেছেন যে, প্রাণের আদি ও প্রধান উৎস হচ্ছে পানি। ড. মরিস বুকাইলি তাঁর *The origin of man* বইয়ে বলেছেন, জীবনের আদি উৎসের ব্যাপারটা এখন আর আদৌ কোনো গবেষণাগারে পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিষয় নয়। কেননা, প্রাণের আদি উৎসসংক্রান্ত সব রহস্যই উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। এ ছাড়া আমরা নাইন-টেনের বইয়ে পড়ে এসেছি যে, কোষের সারবস্তু সাইটোপ্লাজমের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগই পানি।'

---

[৮৭]. YouTube channel "This is the truth"

[৮৮]. সূরা আ'নাম-৬ : ৯২

'কিন্তু আমরা এসব তথ্য জেনেছি কবে? মাত্র এক দেড়শত বছরের উন্নত গবেষণায়।'

'তা বলতে পারিস।'

'তাহলে কীভাবে একজন নিরক্ষর লোক দেড় হাজার বছর আগে বলতে পারল যে— "আমরা প্রাণবান সমস্ত কিছুই সৃষ্টি করলাম পানি হতে।"[৮৯] ব্যাপারটা কি গভীর চিন্তার বিষয় নয়? এবার আসুন মেডিকেল সাইন্সে। যেমন, কুরআন ভ্রূণবিদ্যা নিয়ে কথা বলেছে প্রায় সাড়ে চোদ্দোশো বছর আগে।'

'সে আর নতুন কী? গ্রিকরা আর ভারতীয়রা তারও আগে থেকে এ ব্যাপারে বলেছে।'

'ভাইয়া, আপনি দেখছি গ্রিক নিয়ে খুব দিওয়ানা হয়ে গেছেন। তোরপরেও বলছি। হ্যাঁ, আপনার কথা ঠিক যে, তারা এ বিষয় বলেছিল। তবে সেগুলো ছিল অবৈজ্ঞানিক। কুরআন নাজিলের আগে তৎকালীন গবেষকদের মধ্যে ভ্রূণবিদ্যা সম্পর্কে অনেক ভুল ধারণা ছিল। যেমন : হিপোক্রিটাসের মতে, "বীর্য এমন একটি জিনিস, যেটি পিতা ও মাতার সমস্ত দেহ থেকে আসে। যখন ভ্রূণ হয় তখন এটি মায়ের Menstrual blood-এর মাধ্যমে পুষ্টি পেয়ে বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। এজন্য সন্তান ধারণের পরে মায়েদের menstruation বন্ধ হয়ে যায়। তারপরে এই মিশ্রণ থেকে মাংস ও নাভী তৈরি হয়।"[৯০] হিপোক্রিটাসের এই কথা কি বৈজ্ঞানিক?'

জাকির ভাই চুপ করে রইলেন । বুঝলাম, চুপ থাকা সব সময় সম্মতির লক্ষণ নয়। আমি আমার কাজ চালিয়ে গেলাম।

'এবার দেখুন অ্যারিস্টটল কী বলে। তাঁর মতে, "একটি ভ্রূণ তৈরি হয় মেয়েদের menstrual blood দিয়ে, যখন এটি ছেলেদের বীর্য দ্বারা সক্রিয় হয়।"[৯১] ক্লডিয়াস গ্যালেনের মতে, ভ্রূণ তৈরি হয় ২টি বীর্য এবং menstrual blood-এর মিশ্রণে। তারপরে এটি রক্ত দিয়ে পরিপূর্ণ হয়। তখনও হৃৎপিণ্ড, স্নায়ু এবং যকৃত পরিপূর্ণ আকৃতিতে থাকে না। তারপরে হাড়ের ওপরে মাংস তৈরি হয়। এর পরে প্রকৃতি তার হাত ও পা সম্পূর্ণ করতে সাহায্য করে।[৯২] এগুলো কি বৈজ্ঞানিক?'

---

৮৯. সূরা আম্বিয়া-২১ : ৩০

৯০. Hippocrates Section 8, p 321 & p 326

৯১. De Generatione Animalium by Aristotle, Book II, 739b20-739b30, The Complete Works of Aristotle, Jonathan Barnes (ed.), Princeton, 1985, Vol 1, p. 1148 (Interpreted by Prof. Dr. Keith Moore).

৯২. Corpus Medicorum Graecorum: Galeni de Semine (Galen: On Semen) (Greek text with English trans. Phillip de Lacy, Akademic Verlag, 1992) section I:9:1-10 pp. 92-95, 101

'আসলে তখনকার গবেষণায় তারা যা পেয়েছেন, তা বলেছেন। এত উন্নত প্রযুক্তি তো তখন ছিল না ।' স্বর অনেক নরম হলো জকির ভাইয়ের।

'ঠিক বলেছেন। একইভাবে অন্যান্য ধর্ম গ্রন্থেও; যেমন : তালমুদ, উপনিষদে ভুল তথ্য দেওয়া হয়েছে। কেবল কুরআনেই সম্পূর্ণ সঠিক তথ্য দিয়েছে। যেমন : সূরা মুমিনুন-এর ১৩-১৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে— "অতঃপর আল্লাহ তাআলা নুতফাকে (শুক্রাণু ও ডিম্বাণুকে) জরায়ুতে স্থাপন করেন। তারপর একে জাইগোটকে একটি আলাক্বাতে (জোঁকের মতো বস্তুতে) পরিণত করেন। তারপর এই আলাক্বাকে মুদ্গাহতে (চর্বিত মাংসপিণ্ডে) পরিণত করেন। এরপর এই মুদ্গাহ থেকে হাড় তৈরি করেন এবং অতঃপর এই হাড়কে মাংস দিয়ে আবৃত করে দেন। অতঃপর তাকে নতুন এক সৃষ্টিরূপে বের করে আনেন। নিপুণতম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ কত কল্যাণময়।"

আমিও মানি, তখন এত বেশি প্রযুক্তি ছিল না। কিন্তু তারা যখন কোনো বিষয়ে কথা বলেন, তখন তা ভুল হয়ে যায়। আবার কুরআন যখন একই বিষয়ে কথা বলে তখন সব ঠিক হয়ে যায়। নিশ্চয়ই কথাগুলো কোনো মানুষ বলেনি। আধুনিক ভ্রূণবিদ্যা অনুযায়ী কুরআনে বর্ণিত এই পর্যায়গুলোর সবই সঠিক।[৯৩] মাত্র কয়েক বছর আগেও বিজ্ঞান ভ্রূণবিদ্যায় এত উন্নত ছিল না। কিন্তু কুরআন ভ্রূণবিদ্যা (Embryology) নিয়ে কথা বলেছে প্রায় সাড়ে ১৪ শত বছর আগে।'

'তোদের কোরানকে তুই ঠিকই বলবি এটাই স্বভাবিক। নিজের ছেলেরে কি কেউ কানা কয়? সবাই পদ্মলোচন বলেই ডাকে।' বলেই জাকির ভাই হাসতে লাগলেন।

জাকির ভাইয়ের হাসি দেখে চাচা বললেন, 'তোরে না কইছি বত্রিশ দাঁত বের করে আমার সামনে হাসবি না। আমার পিত্তি জ্বলে যায়। আরে নিজের পোলা যদি কানা না হয় তাইলে হেরে পদ্মলোচন কইত না ক্যান?'

এবার জাকির ভাইকে বললাম, 'ভাইয়া আমি কিন্তু আপনাকে খুব সহজ ভাষায় বলেছি এবং প্রমাণ দেখিয়েছি। এখন বুঝতে না পারলে সে দায় আপনার। আমি আবারও সহজ ভাষায় বলছি, প্রফেসর ড. কেইথ মুরকে কুরআন এবং হাদিসের ভ্রূণবিদ্যা সম্পর্কিত তথ্যসমূহকে একত্রিত করে ৮০টি প্রশ্ন করা হয়েছিল। কেইথ মুর তো আপনার অচেনা থাকার কথা না?'

---

[৯৩]. বিস্তারিত জানতে দেখুন- https://www.muslimmedia.info/2017/07/28/skepticism-sries-does-quran-give-correct-info-about-creation-and-embryology

'না, তা থাকবে কেন। কানাডার *টরেন্টো ইউনিভার্সিটি* ভ্রূণতত্ত্বের ও অ্যানাটমি বিভাগের প্রফেসর ছিলেন। তাঁর সময়ে তিনি ছিলেন ভ্রূণতত্ত্বে সর্বোচ্চ বিশেষজ্ঞ ও গবেষক, নট অনলি ইউরোপ আমেরিকা বাট অলসো ইউনিভার্সাল। তাঁর *The Developing Human* বইটি খুবই বিখ্যাত।'

'হ্যাঁ, তিনি কি বলেছিলেন জানেন?'

'একজন মানুষের সব বিষয়ে জানতে হবে নাকি?'

'নাহ! তা হবে কেন? তাহলে শুনুন, তিনি বলেন, "ভ্রূণসংক্রান্ত বিজ্ঞানের সর্বশেষ আবিষ্কারের সঙ্গে কুরআন ও হাদিসের তথ্যগুলো সম্পূর্ণ মিলে যায়। কিন্তু যদি ৩০ বছর আগেও আমাকে এই প্রশ্নগুলো করা হতো, বৈজ্ঞানিক তথ্যের অভাবে আমি এর অর্ধেকেরও বেশি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারতাম না।"[৯৪] এ ছাড়াও কিছু তথ্যকে তিনি সঠিকও বলতে পারেননি, আবার ভুলও বলতে পারেননি। কেননা, ওই সময়ে সে সব তথ্য সম্পর্কে তিনি নিজেই জানতেন না। পরবর্তী সময়ে তিনি তাঁর *ডেভেলাপিং হিউম্যান* বইয়ের সংস্করণ করেছেন।'

'কত বই তো সংস্করণ হচ্ছে, এটাও হতে পারে। ব্যাপার নাহ।'

'অবশ্যই ব্যাপার। কেইথ মুর, কুরআন ও হাদিস থেকে পাওয়া তথ্যের বিশ্লেষণ করে তাঁর বইয়ের তৃতীয় সংস্করণ করেন ১৯৮২ সালে। একক লেখকের চিকিৎসাবিজ্ঞানের ওপর লেখা এই বইটি শ্রেষ্ঠ বই হিসেবে পুরস্কৃত হয়। আপনি জানেন, সৌদি আরবের দাম্মামে অনুষ্ঠিত ৭ম চিকিৎসা সম্মেলনে তিনি কুরআন সম্পর্কে কি বলেছিলেন?'

'না, কোরান নিয়ে ওনার কোনো মন্তব্য শুনিনি।'

'তাহলে এখন শুনেন। ড. কেইথ মুর বলেন, "কুরআনে বর্ণিত মানুষের বিকাশ সম্পর্কিত তথ্যের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত। আমার কাছে এই বিষয়টি পরিষ্কার যে, মুহাম্মদ ﷺ-এর কাছে এই তথ্যগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকেই এসেছে। কারণ, অধিকাংশ জ্ঞান বহু শতাব্দী পরেও আবিষ্কার হয়নি। আমার কাছে এটাও প্রমাণিত হয়েছে যে, মুহাম্মদ ﷺ অবশ্যই আল্লাহর রাসূল।" এমন আরও অনেক নিদর্শন ও সত্যতার স্বীকারোক্তি থাকতেও

---

৯৪. https://www.youtube.com/watch?v=Tx434UE3SYw

আপনি বলবেন কুরআন আল্লাহর বাণী নয়?[৯৫] কুরআন মুহাম্মদ ﷺ-এর নিজের বানানো কথা? অথচ তিনি ছিলেন একজন নিরক্ষর মানুষ[৯৬] এবং তিনি ওহি ছাড়া কোনো কথা বলতেন না।'[৯৭]

'তারপরও একটা প্রশ্ন থেকেই যায়। বিজ্ঞানে সাইকোলজিক্যাল একটা ব্যাপার আছে, সেটা হচ্ছে মিথোম্যানিয়া।[৯৮] একজন মিথোম্যানিয়াক মিথ্যা কথা বললেও মনে করে সে সত্য কথা বলেছে। আবার কোনো কোনো সময় সে মানুষ অবচেতন মন থেকে এমন কিছু কথা বলে, দেখা যায় পরবর্তী সময়ে সত্যি সত্যি সেটা মিলে গেছে। বিভিন্ন ধর্মজাজকরা এই কাজটা বেশি পারে। এমনও তো হতে পারে যে, নবি মুহাম্মদ ছিলেন মিথোম্যানিয়াক?'

'তার মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন, মুহাম্মদ ﷺ তাঁর অবচেতন মন থেকে কথা বলছেন আর সেটাই কুরআন? (নাউজুবিল্লাহ) কী যে সব অদ্ভুত কথা বলেন না ভাই। মিথোম্যানিয়া তো কোনো পাওয়ার না, এটা হচ্ছে একটা মানসিক রোগ। কোনো রোগী অল্প সময়ের জন্য মিথোম্যানিয়াক থাকতে পারে, আবার কেউ সারা জীবনও থাকতে পারে। ব্যাপারটা এমন না যে, মিথোম্যানিয়াকের সব কথাই সত্য হয়। আচ্ছা, ধরলাম সত্য হয়। আপনি কি জানেন, কত বছর সময় ধরে পূর্ণ কুরআন নাজিল হয়েছে?'

'শুনেছি, ২৩ বছর। ঠিক না ভুল, জানি না।'

'ঠিক শুনেছেন। এই ২৩ বছর জীবনে রাসূলুল্লাহ ﷺ মুশরিকদের কত অত্যাচার সহ্য করেছেন, তাদের সঙ্গে কত চুক্তি করেছেন, পত্র যোগাযোগ করেছেন, যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছেন। এ ছাড়াও তিনি স্ত্রীদের নিয়ে স্বাভাবিক জীবনযাপন করেছেন। আচ্ছা বলুন তো, ২৩ বছর ধরে একজন মিথোম্যানিয়া রোগীর পক্ষে কি একইসঙ্গে এতগুলো দায়িত্ব পালন করা সম্ভব?'

'এভাবে ভেবে দেখিনি।'

---

৯৫. http://www.islam-guide.com/truth.htm
৯৬. সূরা জুমু'আ-৬২ : ২
৯৭. সূরা আম্বিয়া-২১ : ৪৫, ৪৬ : ৯, ৫৩ : ৩-৪, ৬৯ : ৪৩-৪৭
৯৮. https://www.merriam-webster.com/dictionary/mythomania

'তুই ভাববি কেমনে? খালি গলাবাজি করিস? এলাকার ছেলেগুলারে কী সব আলতু ফালতু যুক্তি দিয়া নষ্ট করে ফেলতেছিস। এই করিম ভাই, তোকে কইলাম ডাবল পান দিতে, আর তুই দিলি সিঙ্গেল? তুইও আমার সঙ্গে মশকরা করিস? দে, আর একটু সুপারি দে।'

জমির চাচা আবারও করিম চাচার ওপর রাগ দেখালেন। করিম চাচা পূর্বের মতোই তার দিকে একবার তাকিয়ে নিজ কাজে ব্যস্ত হয়ে গেলেন।

আমি জাকির ভাইকে একটু কড়া কথা বলতে চাইছিলাম কিন্তু চাচার গরম মেজাজ দেখে নিজেকে দমন করলাম। কারণ, আমি কড়া কথা বললে চাচা অ্যাকশন শুরু করে দেবেন। তাই স্বাভাবিক গলায় বললাম,

ভাইয়া, অভিযোগ তোলার আগেই ভাবা উচিত ছিল। একটু চিন্তা করুন, মক্কার মুশরিকরাও তাঁকে সমগ্র ক্ষমতার অফার করেছিল। এসব তো সবার জানা কথা। যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ মিথোম্যানিয়াক হতেন, তাহলে মক্কার মুশরিকরা তাকে ক্ষমতা দিতে চাইত? মদিনার আউস এবং খাজরাজ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে বহুকাল ধরে চলমান বিবাদ মেটানোর জন্য তারা মুহাম্মদ ﷺ-কে মদিনায় আমন্ত্রণ জানিয়েছেলেন। শুধু তাই নয়, সবাই তাঁকে নিজেদের নেতা হিসেবে মনোনীত করেছিলেন। একই সঙ্গে দুটো অভিজাত গোত্র একজন মিথোম্যানিয়াককে নিজেদের নেতা বানাতে পারে? এইটা কি সম্ভব?

এ ছাড়াও বিশ্বের শ্রেষ্ঠ একশো মনীষীর জীবনী নিয়ে লেখা বিখ্যাত বই *দ্যা হান্ড্রেড*-এর লেখক মাইকেল এইচ.হার্ট, তাঁর বইয়ে মুহাম্মদ ﷺ-কে এক নম্বরে রেখেছেন। তাহলে তিনি কি একজন মিথোম্যানিয়াককে এক নম্বরে রেখেছেন? যেখানে বাকি নিরানব্বইজনের তালিকায় ছিলেন নিউটন, আইনস্টাইনের মতো জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিতগণ। যতসব উদ্ভট অভিযোগ করেন আপনারা। আসুন, আমরা অযথা সময় নষ্ট না করে একটু যাচাই করে দেখি, আল-কুরআন কোনো মানুষের আন্দাজ অনুমানে বলা কথা হতে পারে কিনা। Theory of probability আপনার জানা আছে?'

'হু...ম। কত্ত আগে পড়েছি এসব, তবে এখন ঠিক মনে পড়ছে না।'

'আরে কী যে বলেন না ভাইয়া। মানুষ এটাও ভুলে নাকি? এই যে ধরুন, একটা কয়েন টস করলাম, হেড উঠবে নাকি টেল উঠবে, তা একবারে সঠিক বলার সম্ভবনা কতটুকু? ধরুন, প্রথমবার টসে আপনি বললেন হেড উঠবে।

যেহেতু পয়সার দুইটা দিক সেহেতু আপনার কথা সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা দুই ভাগের এক (১/২) মানে ৫০%। আবার টস দিলাম, আপনি আবার বললেন হেড উঠবে। দুবারই আপনার কথা সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা হবে (১/২ × ১/২ = ১/৪) = ২৫%, অর্থাৎ আপনার দুবারই সঠিক বলার সম্ভাবনা ২৫%।'

'ও হ্যাঁ... হ্যাঁ... এবার মনে পড়েছে। ধর, একটা লুডুর গুটি মারলাম। তুই বললি ছয় উঠবে বা পাঁচ উঠবে। যেহেতু গুটির ছয়টা তল বা দিক, সেহেতু প্রথমবার তোর সঠিক বলার সম্ভাবনা ছয় ভাগের এক ভাগ। দুবার সঠিক বলতে পারার সম্ভবনা ছয় ভাগের এক গুণ ছয় ভাগের এক-

১/৬ × ১/৬ = ১/৩৬ = ০.০২৮% এটাই তো?'

'হ্যাঁ... এটাই হচ্ছে থিওরি অব প্রোবাবিলিটি।'

'বুঝলাম না, এটার সঙ্গে কুরআনের সম্পর্ক কী?'

'আছে আছে। এখন আমরা এই থিওরি দিয়ে দেখব কুরআন আসলে কোনো মানুষের আন্দাজে বলা কথা হতে পারে কিনা। আচ্ছা, মনে করুন আমরা সাড়ে চোদ্দোশত বছর আগের আরবের মরুভূমিতে আছি। বিজ্ঞানের জ্ঞান বলতে তেমন কিছুই নেই, মহাকাশ বা প্রাণীজগৎ সম্পর্কেও কিছু জানি না।'

'হুম মনে করলাম।'

'এখন চাঁদের নিজের আলো আছে নাকি নেই, একজন মানুষ আন্দাজে বলতে পারার সম্ভাবনা কত?'

'দুই ভাগের এক (১/২)।'

'ডিম্বাকৃতি, গোল, সমতল, ঘনক, চতর্ভুজ, পঞ্চভুজ ইত্যাদি আমরা ন্যূনতম দশ প্রকার আকৃতি বলতে পারব, তাহলে পৃথিবীর আকৃতি ডিম্বাকৃতির এটা আন্দাজে সঠিক বলার সম্ভাবনা কত?'

'দশ ভাগের এক (১/১০)।'

'বিশ্বজগৎ কীভাবে সৃষ্টি? একবিন্দুতে প্রথমে সব একত্রিত ছিল, যেভাবে দেখছি সেভাবেই ছিল, বিস্ফোরণে, শান্তভাবে, ভেঙে আলাদা হয়ে ইত্যাদি অন্তত একশো রকমের চিন্তা করতে পারবেন। তাহলে এই প্রশ্নের উত্তর আন্দাজে সঠিক বলার সম্ভাবনা কত?'

'একশো ভাগের এক (১/১০০)।'

'মানুষ কী দিয়ে সৃষ্টি? মাটি, পানি, লোহা, তামা, সিসা এরকম প্রায় হাজারটা পদার্থের কথা চিন্তা করতে পারবেন। তাহলে এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর আন্দাজে বলার সম্ভাবনা কত?'

'এক হাজার ভাগের এক (১/১০০০)।'

'এই চারটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর আন্দাজে বলার সম্ভাবনা মোবাইলের ক্যালকুলেটরে হিসেব করে দেখুন তো...'

'ওয়েট দেখছি, ১/২ × ১/১০ × ১/১০০ × ১/১০০০ = ০.০০০০০০৫'

'মানে, ম্যাথমেটিক্যালি প্রায় জিরো। কুরআনে এরকম শত শত বৈজ্ঞানিক তথ্য দেওয়া আছে, যার কয়েকটা এরকম হিসেব করলে সম্ভাবনা হবে ০.০০০০০... প্রায় শূন্যের কাছাকাছি অঙ্কের। ম্যাথম্যাটিক্যালি জিরো। আবার "জিরো নলেজ প্রুফ" পদ্ধতিতেও কুরআনের সত্যতা প্রমাণ করা যায়, সেদিকে যাচ্ছি না। অতএব, কুরআনের তথ্যগুলো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আন্দাজে বলা কথা হওয়ার সম্ভাবনাও শূন্য। সুতরাং এটা নিশ্চিত যে, কুরআন কোনো মানুষের কথা নয়। যদি কথাগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহি না হয় তাহলে কথাগুলো কার? কুরআন যদি আল্লাহর বাণী না হয় তাহলে এই বাণীগুলো এলো কোত্থেকে?'[৯৯]

'দেখ, একটা বিষয় উপস্থাপন করলেই তা প্রমাণিত হয়ে যায় না। সেই বিষয়ে যাছাই বাছাই করার দরকার আছে। তুই কোরানের যে উদ্ধৃতিগুলো দিয়েছিস সেগুলো নিয়ে আগে চিন্তা করে দেখি। বাকি ব্যাপারে কালকে আলোচনা করা যাবে।'

'ওকে ভাইয়া, কুরআনও আমাদেরকে আলোচনা করতে উৎসাহিত করে।[১০০] তাহলে কাল ১১টার দিকে আমরা আবার দেখা করতে পারি, কী বলেন?'

'সেটাই ভালো সময়, বিকালে আমারও কাজ আছে। ওকে, ১১টা...'

---

[৯৯]. Is the QURAN Gods word, Dr.Zakir abdul karim Naik.
[১০০]. সূরা নাহল-১৬ : ১২৫

চাচার মুখে বিজয়ের হাসি। আমরা দুজনেই দোকান থেকে বের হয়ে নিজ নিজ গন্তব্যের দিকে হাঁটা শুরু করলাম। একটু যেতেই চাচা আবার ডাক দিলেন,

'এই দুজনেই খাড়াও।'

আমরা অনিচ্ছা সত্ত্বেও দাঁড়ালাম। এবার চাচা যদি দীর্ঘমেয়াদি কথা শুরু করে দেয়, তাহলে বিপদ। আমার বিকালের কাজটি বরবাদ হয়ে যাবে।

'বাবা জাকির, তোর চায়ের বিল দেবে কেডায়?'

জাকির ভাই মাথা নিচু করে বিল শোধ করতে গেলে চাচা আবারও বলা শুরু করে দিলেন,

'করিম ভাই, পাঁচটা চা, একটা বিস্কুট আর দুইটা ডাবল পানের দাম নিয়ে নে। অবশ্য, বিলটা আমিই দিতাম। তুই হেরে যাওয়ায় আমি যে কী আনন্দ পাইছি, তা তোরে বোঝাতে পারব না। এখন বিলটা দিয়া আমার আনন্দকে ফুল-ফিল করে দিবি। যাতে তোর আক্কেল হয়।'

বিষণ্নমুখে বিল পরিশোধ করার পর জাকির ভাই আমাকে বললেন,

'পকেটে যা ছিল তা তো বিল দিতেই গেল। ফারিহার জন্য আজকেও চকলেট নেওয়া হবে না রে।'

আমি মন খারাপ করে মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিতেই চাচা বললেন, 'চকলেট কত টাকা বাবা, নাও তো, এই বিলটা আমি দেবো। বলেই পান খাওয়া দাঁতের সেই রঙিন হাসিটা উপহার দিলেন জমির চাচা।'

সেদিনের বিদায় বেলায় জাকির ভাইয়ের মলিন মুখখানি আমার হৃদয়ে দাগ কেটে দিলেও তার চিন্তার জগতে ভিন্ন আলোড়ন সৃষ্টি করতে পেরে একটা অদ্ভুত সুখ অনুভূত হয়েছিল।

জিন কথন

আমরা জানি ভাইয়া, সব মানুষ সহজ বিষয় সহজে মেনে নিতে পারে না। তোমরা যারা সত্যকে সুস্পষ্ট দেখার পরও অস্বীকার করো, তারা ওই একই শ্রেণির মানুষ। কিছু মানুষ আছে যারা চাঁদের জোছনা দেখে না; বরং চাঁদে পাহাড়ের ছায়া দেখে, সেটাকে কলঙ্ক বলে থাকে। এ ধরনের মানুষের আত্মা অসুস্থ। তারা কাছের নিখুঁত হীরা পরখ না করে, দূরের খুঁত খুঁজে নিয়ে, আবার সেই খুঁত দিয়েই, নিখুঁতের খুঁত খুঁজে বের করতে উঠেপড়ে লাগে। কিন্তু আল্লাহ যেখানে খুঁত রাখেননি, তা তো নিখুঁতই থাকবে। যাক সে কথা, পরদিন ১১টা বাজার আগেই বাজারের দিকে রওয়ানা দিলাম। স্টলের কাছে যেতেই লক্ষ করলাম, জাকির ভাই আর মহিউদ্দিন ভাই করিম চাচার দোকানে বসে কথা বলছেন। আমি জানতাম এখন আমাকে ডাকা হবে, আর তাই ডাকার আগেই হাজির হয়ে সালাম দিলাম। শুধু করিম চাচাই সালামের উত্তর দিলেন।

'আরে মিরাজ... এসে গেছিস... আয় বস, বললেন জাকির ভাই।'

'জি ভাইয়া এসে গেছি, আপনারা কেমন আছেন?'

'আছি ভালোই। শুনলাম, তুমি নাকি জাকিরকে কাল বিজ্ঞানের ছবক দিয়েছ। আচ্ছা একটা বিষয় আমার কাছে ক্লিয়ার করো তো... ধর্ম তো আত্মিক ব্যাপার। তোমরা কথায় কথায় বিজ্ঞানকে ধর্মের মধ্যে টেনে আনো কেন?' এবার কথা বললেন মহিউদ্দিন ভাই।

'জাকির ভাইকে এই প্রশ্নের উত্তর একবার দিয়েছি। আপনাকেও বলছি, মানছি কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা বিজ্ঞানকে টেনে নিয়ে আসি। তবে সেটা আমাদের জন্য নয়, আপনাদের জন্য। যাতে করে আপনারা সত্যকে খুঁজে পেয়ে সত্যিকারের মুক্তমনা হয়ে আল্লাহর কাছে ফিরে আসতে পারেন। আর নিজেকে ইহকাল এবং পরকালের কঠিন শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারেন।'

'হা হা হা আবারও সেই পরকাল? বিজ্ঞান কি পেরেছে পরকালের প্রমাণ দিতে? যেদিন প্রমাণ দিতে পারবে, সেদিন পরকালের কথা বলতে এসো। আমরা না-দেখা বিষয়কে যেমন বিশ্বাস করি না, তেমনি প্রমাণ ছাড়া ধারণাপ্রসূত কথাও বিশ্বাস করি না। যখনই বিজ্ঞান কিছু আবিষ্কার করে, তখনই তোমরা এটা কুরআনে আছে, ওটা কুরআনে আছে বলে গলা ফাটাও। কেন, নিজেরা আগে ভাগেই বলতে পার না যে, কুরআনে এটা বলা হয়েছে, ওটা বলা হয়েছে...'

'মহিউদ্দিন ভাই, পৃথিবী অনেক এগিয়ে গেছে। অদেখাকে বিশ্বাস করি না এসব অনেক পুরোনো থিওরি। এসব হাস্যকর কথা বাদ দিন। এই টপিক নিয়ে কথা বলতে আর ভালো লাগে না। বরং নতুন কিছু নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। একবিংশ শতাব্দীতে এসে এসব সিকি কথা-বার্তা একেবারেই হাস্যকর।'

'কী বোঝাতে চাচ্ছ তুমি?'

'অনেক কিছু বোঝাতে চাচ্ছি ভাইয়া। তবে ভালো হয় যদি আমরা একটু পড়ালেখা করি। তখন বুঝতে পারব। না দেখে কোনো কিছু বিশ্বাস করা যাবে না, এটা পুরোটাই একটা অযৌক্তিক কথা।'

'কী রকম?'

'ডার্ক মেটারের প্রমাণ আছে আপনাদের কাছে? ডার্ক এনার্জির? মাল্টিভার্স ইউনিভার্স? এলিয়েন? নিজেদেরকে দাবি করেন, আপনারা এসেছেন এসব থেকে আর এসবের কোনো প্রমাণ ছাড়া তো ঠিকই বিশ্বাস করেন। শুধু কুরআনের বলা কথা আপনারা বিশ্বাস করতে পারেন না। অথচ কুরআনের বৈজ্ঞানিক আয়াতসমূহের প্রায় ৮০% সঠিক প্রমাণিত হয়েছে, আর বাকি ২০% সঠিকও প্রমাণিত হয়নি আবার ভুলও প্রমাণিত হয়নি।'

'বাকি ২০%-এর শুদ্ধতার গ্যারান্টি কে দেবে?'

'কমনসেন্স দেবে। কমনসেন্স বলে ৮০% যদি সঠিক হয়, বাকি ২০%ও সঠিক।'

'হে হে... ছোকরা বলে কী? আমারে কমনসেন্স শিক্ষা দেয়। হা হা হা...'

বুঝতে পারছি আমি ক্রমম্বয়ে একটু উত্তেজিত হয়ে যাচ্ছি। এখন আমাকে একটু ধীর স্থিরভাবে কথা বলা উচিত। তাই চেষ্টা করলাম নিজেকে ব্যালেন্স করার। আল্লাহ বলেছেন, 'প্রতিপালকের দিকে আহ্বান করো প্রজ্ঞা ও সদুপদেশ দ্বারা।'[১০১] আয়াতটি মনে পড়তেই আমি 'আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বনির রাজিম' পড়ে শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চেয়ে নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে শান্তভাবে বললাম,

'মেনে নেবেন না জানি। যেহেতু আপনারা সত্যিকারের মুক্তমনা হতে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন, সেহেতু এই সত্য মেনে নেওয়ার ক্ষমতা সম্ভবত আপনাদের নেই। কুরআন অনেক কথা বলেছে, যা বিজ্ঞান এখনও প্রমাণ করতে পারেনি, শুধু ধারণা দিয়ে যাচ্ছে। একটা-দুইটা না, কুরআনে এমন অনেক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আছে, যে বিষয়গুলো সম্পর্কে বিজ্ঞান এখনও কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেনি।'

'কীরকম?'

'ভাইয়া, আমরা মহাবিশ্বের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে জানি, কিন্তু ধ্বংসের ব্যাপারে কি জানি বা আপনি কি জানেন?'

'উ...ম... আসলে বিজ্ঞান ধ্বংসের ব্যাপারে সঠিক কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি। বিজ্ঞানিরা অনেক তত্ত্ব দিয়ে যাচ্ছেন। যেমন কেউ বলছেন, গ্রহ-নক্ষত্র স্বতন্ত্রভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে। কেউ বলছেন, গ্রাভিটি ফোর্স নষ্ট হয়ে যাবে। আবার কেউ বলছেন, গ্রহ-নক্ষত্রগুলো একে অপরের সঙ্গে সংঘর্ষে ধ্বংস হয়ে যাবে। আবার কেউ বলছেন, সবকিছু ব্ল্যাকহোলে পতিত হবে। একেকজন একেক রকম থিওরি দিয়ে যাচ্ছেন।'

'হ্যাঁ ভাইয়া, আমিও ধারণা করেছিলাম এমনটাই বলবেন। দেখুন, কুরআন এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টির ব্যাপারে যেমন কথা বলেছে, তেমনই ধ্বংসের ব্যাপারেও কথা বলেছে। বিজ্ঞান সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাপারে একমত। আবার কুরআন ধ্বংসের ব্যাপারে নিশ্চিত করে বলেছে। যেমন, সূরা কিয়ামাতে বলা হয়েছে– "সে সময় চন্দ্র জ্যোতিহীন হয়ে পড়বে। সূর্য এবং চন্দ্র একত্রিত হয়ে যাবে।"[১০২] বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত করে বলতে পারছেন না সূর্যের শেষ অবস্থা কী হবে। কিন্তু কুরআন বলছে,

---

[১০১]. সূরা নাহল-১৬ : ১২৫

[১০২]. সূরা ক্বিয়ামাহ-৭৫ : ৮-৯

সূর্য আলোহীন হয়ে যাবে এবং নক্ষত্ররাজিও দীপ্তিহীন হয়ে যাবে।[১০৩] আকাশের শেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে বিজ্ঞান নিশ্চিত করে কিছু বলেছে?'

'না, বলেনি।' একটু চিন্তা করে উত্তর দিলেন মহিউদ্দিন ভাই।

'কিন্তু কুরআন বলেছে, আকাশের এমন সুস্থিত বিস্তার থাকবে না, আকাশ বিদীর্ণ হয়ে যাবে।[১০৪] কাগজ যেমন গুটানো হয় তেমনই আকাশকেও গুটানো হবে। বিজ্ঞান কি বলতে পেরেছে, সবকিছু ধ্বংসের পর কি হবে?'

'না, এ ব্যাপারে অবশ্য বিজ্ঞান কোনো তথ্য দিতে পারেনি।' অনেকক্ষণ ধরে চুপ থাকার পর উত্তর দিলেন জাকির ভাই।

'কিন্তু কুরআন শুধু তথ্যই দেইনি, দৃঢ় চিত্তে বলেছে সবকিছু আবার সৃষ্টি করা হবে।[১০৫] আচ্ছা বিজ্ঞান বলছে এলিয়েনের কথা, কিন্তু নিশ্চিত প্রমাণ দিতে পেরেছে?'

'তা এখনও নিশ্চিতভাবে বলতে পারেনি, আপাতত স্ট্রং ডকুমেন্ট নেই।'

'কিন্তু কুরআন নিশ্চিত করে বলছে পৃথিবীর বাহিরেও প্রাণীর বসবাস আছে।[১০৬] কুরআন বলছে আত্মার কথা কিন্তু বিজ্ঞান আত্মার প্রমাণ দিতে পারেনি। কুরআন বলছে জান্নাত-জাহান্নামের কথা, জিন, ফেরেশতার কথা কিন্তু বিজ্ঞান এসবের প্রমাণ দিতে পারেনি। বিজ্ঞান এমন অনেক কিছুরই প্রমাণ দিতে পারেনি।'

'কী? কী বললে তুমি? হা হা হা... তুমি এখনও জিনে বিশ্বাস করো? আচ্ছা তুমি নিজেই বিজ্ঞান নিয়ে এত কথা বলো আবার সেই মানুষ কীভাবে অবৈজ্ঞানিক জিনে বিশ্বাস করে বলো তো?' অত্যন্ত অবজ্ঞার সুরে হাসতে হাসতে বললেন মহিউদ্দিন ভাই।

'জিন, অবৈজ্ঞানিক? এটা কে বলল আপনাকে?'

'আচ্ছা, তোমাদের কুরআন কি বলেনি যে, জিনকে সৃষ্টি করা হয়েছে আগুনের শিখা হতে?'

---

[১০৩]. সূরা তাকভীর-৮১ : ১-২
[১০৪]. সূরা ইনফিতর-৮২ : ১
[১০৫]. সূরা আম্বিয়া-২১ : ১০৪
[১০৬]. সূরা আশ-শূ'আরা-৪২ : ২৯

'হুম, বলেছে। আল্লাহ বলেছেন, তিনি জিনকে সৃষ্টি করেছেন ধোঁয়াহীন অগ্নিশিখা হতে।[১০৭] এখানে অবৈজ্ঞানিক কী প্রমাণিত হলো?'

'আমরা সবাই জানি যে, আগুন কোনো উপাদান বা পদার্থ নয়। আগুন যেহেতু কোনো উপাদান বা পদার্থ নয়, এটি জিন বা কোনো প্রাণী সৃষ্টির উপাদান হতে পারে না। সো, জিন সৃষ্টি করা হয়েছে আগুনের শিখা হতে এটা একটা ফালতু কথা।'

'কে ফালতু? কীসের ফালতু? এ কথা কে কইল রে?'

আমরা পেছন দিকে ঘুরে দেখলাম জমির চাচা তার দপ্তরে এসে হাজির। চাচা বলেই চলছেন,

'নতুনটা আবার কোত্থেকে আমদানি হলো? ও বুঝবার পারছি, কাল নাকানিচুবানি খাইয়া আজকে সাগরেদ ধইরা আনছ, তাই না, আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বাবা মিরাজ, কাল যে তোমারে কইলাম আমারে এক মিনিট ফোন করার জন্য!'

বলেই জমির চাচা তার জন্য রাখা নির্ধারিত আসনে বসে পড়লেন। আর সঙ্গে সঙ্গেই চা চলে এলো। আমি মনে করতে পারলাম না, কাল চাচা কখন আমাকে ফোনের কথা বলেছিলেন। তাঁর দিকে তাকিয়ে অনুতপ্ত হওয়ার ভান করে বলা শুরু করলাম,

'আসল ব্যাপারটা হলো জিন সম্পর্কে সম্ভবত আপনার সঠিক ধারণা নেই। আরবি আয়াত খেয়াল করুন-

وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ.

আলোচ্য আয়াতে مَّارِجٍ অর্থ অগ্নিশিখা। نَّارٍ অর্থ এক বিশেষ ধরনের আগুন। কাঠ বা কয়লা জ্বালালে যে আগুন সৃষ্টি হয়, এটা সে আগুন নয়। এর অর্থ; ধোঁয়াবিহীন শিখা।[১০৮] সাহাবি ইবন আব্বাস (রা.) বলেন, "এটা হলো ধূম্রহীন আগুনের শিখা, যা মানুষকে মেরে ফেলে।"'[১০৯]

'এই আগুন কি আমাদের দেখা আগুন না?' বললেন জাকির ভাই।

---

[১০৭]. সূরা আর রাহমান-৫৫ : ১৫

[১০৮]. কুরআনুল কারীম (বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসির), ড. আবু বকর যাকারিয়া, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা : ২৫-২৮

[১০৯]. তাফসির তাবারি, ১৭তম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৩৩

'না ভাইয়া। সাহাবি আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) বলেন, "এই ধুম্রহীন আগুন হলো সেই ধুম্রহীন আগুনের তেজের সত্তর ভাগের এক ভাগ, যে ধুম্রহীন আগুন থেকে জিন জাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তারপর তিনি কুরআনের আয়াত পাঠ করেন, এর পূর্বে সৃষ্টি করেছি জিনকে, প্রখর শিখাযুক্ত অগ্নি হতে।"'[১১০]

'জিন দেখতে কোন প্রাণীর মতো? এ ব্যাপারে তোমাদের কোরানে কী বলা আছে?'

'জিনদের প্রকৃতি সম্পর্কে কুরআনে উল্লেখ আছে— "সুলাইমান বললেন, হে পরিষদবর্গ, তারা (রানি বিলকিস) আত্মসমর্পণ করে আমার কাছে আসার পূর্বে তাঁর সিংহাসনকে আমাকে আমার কাছে কে এনে দেবে? জনৈক শক্তিশালী-জিন বলল, আপনি আপনার স্থান থেকে ওঠার পূর্বে আমি তা এনে দেবো এবং নিশ্চয়ই আমি এ কাজে শক্তিমান, বিশ্বস্ত। কিতাবের জ্ঞান যার ছিল, সে বলল, আপনার চোখের পলক ফেলার পূর্বেই আমি তা আপনাকে এনে দেবো..."'[১১১]

'ওরে, বাবা! এত ক্ষমতা? এ তো মহা ব্যাপার-স্যাপার।' অবাক হয়ে বললেন জাকির ভাই।

'জি ভাইয়া (জাকির ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে), জিনেরা মানুষের মতো কিংবা পৃথিবীর অন্যসব প্রাণীর মতো নয়। এরা এমন এক প্রাণী, যারা মুহূর্তের মধ্যেই এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াতের ক্ষমতা রাখে। এরা মানুষের থেকে ভিন্ন কোনো মাত্রার প্রাণী। বিস্তারিত আল্লাহই ভালো জানেন।'

মহিউদ্দিন ভাই বললেন 'জাকির, তুই যে রহস্য নিয়ে শুনছিস, মনে হচ্ছে জিনের অস্তিত্ব প্রমাণ হয়ে গেছে। এখনই তোকে নিয়ে উড়াল দেবে, হা হা হা। তাহলে সিন্দাবাদের দৈত্য তো সত্যই হয়ে গেল।'

প্রত্যুত্তরে কিছু না বলে জাকির ভাই চুপ করে বসে থাকলেন। চাচাকে দেখলাম আমার পরবর্তী কথা শোনার জন্য তাকিয়ে আছেন।

আবার বলতে শুরু করলাম, 'জিনের অস্তিত্ব বিজ্ঞান দ্বারা প্রমাণ করা সম্ভব হয়নি কিন্তু নাকচ করাও সম্ভব হয়নি। কুরআনে জিন সম্পর্কে যা বলা আছে, বিজ্ঞান সে সম্পর্কে এখনও অজ্ঞ। বিজ্ঞান পৃথিবীর অনেক রহস্য এখনও ব্যাখ্য করতে পারেনি। আপনিকি কি U.F.O সম্পর্কে জানেন?'

---

[১১০]. সূরা হিজর-১৫ : ২১, তাফসির তাবারি, ১৬তম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ২১

[১১১]. সূরা নামল-২৭ : ৩৮-৪০

'United Operation Force?'

'আরে নাহ, সেই U.F.O-এর কথা বলিনি। বাংলায় একে বলা হয়, উড়ন্ত সসার। ইংরেজিতে Fling sacure। পৃথিবী থেকে আকাশে এমন কিছু ক্ষিপ্রগতিসম্পন্ন বস্তু দেখা যায়, বিজ্ঞানীরা যার কোনো স্পষ্ট ব্যাখ্যা দিতে পারেননি। একারণে এদেরকে Unidentyfied Flying Object সংক্ষেপে U.F.O বলা হয়।'[১১২]

'কই আগে তো শুনিনি! এই জাকির, তুই শুনেছিস নাকি? (একটু ক্ষেপে গিয়ে) আরে তুই এরকম ভাস্কর্যের মতো বসে আছিস কেন?'

'ও তো কালকেই মূর্তি হয়া গেছে। একটু ওয়েট কর, কিছুক্ষণ পর তুইও মূর্তি হইয়া যাইবি।' অদ্ভুত একটা মুখের ভঙ্গি করে বললেন চাচা।

আমি চাচার কথা শুনেও না শোনার ভান করে বললাম, 'অনেক আগ থেকেই নাকি এধরনের বস্তু দেখা যায়, খ্রিষ্টপূর্ব একশত শতাব্দীতে প্লিনি তাঁর *ন্যাচারাল হিস্ট্রি* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, লুসিয়াস ভ্যালেরিয়াস এবং গেইয়াস ভ্যালেরিয়াসের কন্সালশিপের সময় একদিন সূর্যাস্তের একটু আগে জ্বলন্ত ঢালের মতো দেখতে কিছু একটা খুব ক্ষিপ্রগতিতে পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে চলে যেতে দেখেছে তারা।'

'আরে দূর, এগুলো মানুষকে আকর্ষিত করার জন্য যত্তসব ফালতু জিনিস।'

'আরে ভাইয়া, এই ফ্লাইং সসার বা ইউ.এফ.ও সম্পর্কে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করার জন্য International U.F.O Bureau গঠন করা হয়েছে। তাহলে কি ফালতু জিনিসের জন্য ইন্টারন্যাশনাল ব্যুরো গঠন করা হয়েছে? কী যে বলছেন আপনি। দু-একটা ঘটনা শুনবেন?'

'বলো, শুনছি।'

'সময়টা ১৯৬৫ সালের ৮ই জুন একটা C-119 বক্সার বিমান দশ জন বৈমানিকসহ হারিয়ে যায়। হারিয়ে যাওয়ার স্থান ছিল বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল। ১৯৭৩ সালে এসে ইন্টারন্যাশনাল ইউ.এফ.ও ব্যুরো একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করে বলে যে, ওই C-119 বিমানটি নাকি কোনো এক U.F.O-এর কবলে পড়েছিল।

---

[১১২]. https://www.britannica.com/topic/unidentified-flying-object

তারা বলেন, সে সময় Gemini-4 নামক একটি মহাশূন্যযান ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে। এই যানের পাইলট জেমস মেডিবিড এবং অ্যাডওয়ার্ড হুইট একটি উড়ন্ত বস্তুকে বারমুডা ট্রায়াঙ্গেলের ওপর দিয়ে উড়ে যেতে দেখেছিলেন।'

'আজব তথ্য! পেলে কোথায়?'

'আরে, *ডেইলি অবজার্ভার* একটি প্রবন্ধ ছাপিয়েছে lost on the yankee route নামে।[১১৩] U.F.O-এর অভিজ্ঞ পর্যবেক্ষক এবং বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ এম.কে যোসেফ তাঁর সাড়া জাগানো বই *দ্যা কেইস ফর দ্য ইউ.এফ.ও* এ দাবি করেন যে, "বারমুডা ট্রায়াঙ্গেলের মতো ফ্রেয়া-মেরি, সিলেক্ট-এলেন, অস্টিন ইত্যাদির ঘটনাসমূহ ঘটিয়েছে এই U.F.O।" ১৯৬৪ সালে কেইপ কেনেডি থেকে পোলারিস মিসাইল ছোঁড়ার আগে এদেরকে আরেকবার দেখা যায়। "নাসা আন-এক্সপ্লেইন্ড ফাইল" নামে একটি ভিডিও প্রচার করে সাইন্স চ্যানেল।'[১১৪]

'নাসা ব্যাখ্যা দিতে পারেনি? বলছ কী? নতুন কিছু শুনলাম মনে হয়।'

'যা বলছি সব ডকুমেন্টেড। Appollo-12 চাঁদে অবতরণ করার ঠিক আগ মুহূর্তেও নাকি U.F.O-দেরকে দেখা যায়। পৃথিবী থেকে ১৩২০০০ হাজার মাইল অতিক্রম করার পর অ্যাপোলো-১২-এর সামনে পেছনে U.F.O এমনভাবে ছিল যেন, তাঁরা পাহারা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। অ্যাপোলো-১২ থেকে হাস্টন কমান্ড সেন্টার অব ইউ.এফ.ও-তে সংকেত পাঠালেন আস্ট্রেনট গর্ডন। তখন অ্যাপোলো-১২-এর ওপর নজর রাখা সবাই দেখেছিলেন U.F.O-দেরকে।[১১৫] আচ্ছা, আপনারা কেউ ব্ল্যাক-আউট সম্পর্কে জানেন?'

'আমি জানি, পৃথিবীতে বেশ কয়েকবার ঘটেছে এই ধরনের ঘটনা। ১৯৬৫ সালেও হঠাৎ করেই আমেরিকার উত্তর পূর্বের একটি অঞ্চলে বিরাট এলাকা জুড়ে বিদ্যুৎ চলে যায়। কারেন্ট ফেইলের এই ঘটনাকে ব্ল্যাক-আউটও বলা হয়।' আবারও কথা বলে উঠলেন জাকির ভাই।

---

[১১৩]. http://www.thedailyobserver.ca/2008/04/30/lost-on-the-yankee-route

[১১৪]. https://www.sciencechannel.com/tv-shows/nasas-unexplained-files/videos/socorro-ufo-sighting

[১১৫]. http://www.dailymail.co.uk/news/article-3493177/Does-footage-secret-spacecraft-UFO-hunters-claim-proof-Black-Manta-spotting-three-lights-Apollo-12-moon-landing-image.html

'জি এটাই। কিন্তু কেন এমন হয় বলতে পারেন?' আমি জাকির ভাইকে জিজ্ঞেস করলাম।

'না, তা জানি না।'

'এর জন্য দায়ী করা হয় U.F.O-দেরকে। অনেক চেষ্টা করেও এই ঘটনার কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। বিশেষজ্ঞরা বলেন, উত্তর পূর্বাঞ্চলের বৈদ্যুতিক পাওয়ারগ্রিডে ঘটে যাওয়া ব্ল্যাক আউটের ঘটনাটি আধুনিক সভ্যতার বড়ো একটি রহস্য সৃষ্টি করেছে।'[১১৬]

'তো, এসব বলে কী বুঝাতে চাচ্ছ? জিন প্রমাণ হয়ে গেল? নাকি ওরাই জিন?' বললেন মহিউদ্দিন ভাই।

'না, আমরা জিন দাবি করছি না। আমি শুধু বলতে চাচ্ছি, চাক্ষুষ দেখার পরেও আধুনিক বিজ্ঞান এখনও প্রমাণ করতে পারছে না এরা কারা? কেউ বলছে এলিয়েন, কেউ বলছেন অতি প্রাকৃতিক কোনো কিছু ইত্যাদি। তাহলে যেগুলোকে আমরা চোখে দেখতে পারি না, যারা ভিন্ন ভিন্ন ডাইমেনশনের তাদেরকে আপনার বিজ্ঞান দিয়ে কীভাবে প্রমাণ করবেন?'

'আচ্ছা, প্রাণ থাকলেই তো প্রাণী। তাহলে যত কিছুই হোক না কেন, এত উন্নত বিজ্ঞানের মাধ্যমে তো প্রমাণ পাওয়ার কথা তাই না? তা ছাড়া আগুনের শিখা হতে কীভাবে প্রাণী সৃষ্টি হয়?' বললেন মহিউদ্দিন ভাই।

'আহা ভাইয়া, আপনাকে যে কীভাবে বোঝাই? এতক্ষণ ধরে তাহলে কী বললাম? জিনরা তো আমাদের চেনা প্রাণীদের মতো না। আপনার এমন চিন্তা কেন হলো যে, মহাবিশ্বের সকল প্রাণই পৃথিবীর প্রাণের মতো উপাদান দ্বারা গঠিত হতে হবে? এর থেকে ভিন্ন কোনো মেকানিজমে মহাবিশ্বের কোনো প্রাণ সৃষ্টি হতে পারে না, এই নিশ্চয়তা আপনাকে কে দিলো? সত্যিকারের বিজ্ঞানীরা কিংবা বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তিরা কখনোই এটা কল্পনা করে না, মহাবিশ্বের সকল প্রাণীই পৃথিবীর প্রাণীর ন্যায় তৈরি। বরং একজন বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তি অনেক ধরনের প্রাণের সম্ভাব্যতায় বিশ্বাস করতে বাধ্য।'

'হে হে... তুমি U.F.O দিয়ে জিনে বিশ্বাস করাতে চাইলে, আর আমি মেনে নিলাম? ফুটপাথের ক্যানভাসারদের ওযুধ আমি কিনি না, মিরাজ।'

---

[১১৬]. https://en.wikipedia.org/wiki/Northeast_blackout_of_1965

'আমি এতক্ষণ ধরে যদি ফুটপাথের ন্যায় ক্যানভাসার করে থাকি তাহলে U.F.O-কে কী বলবেন? আমি শুধু আপনাকে এটা বুঝাতে চেয়েছি যে, জিন অবৈজ্ঞানিক বলে লাফিয়ে ওঠাটা ঠিক নয়। আচ্ছা আপনাকে আরও কিছু তথ্য দিই। বিজ্ঞানী জি. ফেইনবার্গ এবং আর.শেফ্রিও তাঁদের বইতে[১১৭] উল্লেখ করেছেন, পৃথিবীর বাইরে প্রাণের বিস্তারের সম্ভবনা সবচেয়ে বেশি আছে সূর্য বা অন্য কোনো নক্ষত্রে প্লাজমার মধ্যে। প্লাজমার মধ্যে অদ্ভুত সম্ভাব্য সেই প্রাণীদেরকে তাঁরা প্লাজমা-বিস্ট বা প্লাজমা-জন্তু বলে অভিহিত করেছেন।'[১১৮]

'প্লাজমা! বিষয়টা ঠিক বুঝলাম না।'

'সমান সংখ্যক ইলেক্ট্রন ও ধনাত্মক আয়নযুক্ত উচ্চ আয়নিক গ্যাসকে প্লাজমা বলা হয়। আন্তঃনাক্ষত্রিক জগতে বিশেষ করে সূর্য ও অন্যান্য নক্ষত্রের বায়ুমণ্ডলে, গ্যাসসমূহ উচ্চ আয়নিক অবস্থায় থাকে। তাই সেখানে প্লাজমাবস্থা বিরাজ করে। এ ছাড়া পরীক্ষাগারে ক্ষরণনলে কিংবা তাপ নিউক্লিয় রিএক্টরে প্লাজমাবস্থা সৃষ্টি করা যায়। প্লাজমা অবস্থা তৈরির জন্য ৫০০০০ কেলভিনের থেকে বেশি তাপমাত্রার প্রয়োজন হয়। বুঝেছেন?'

'কিছুটা বুঝেছি।'

'তাতেই আপাতত চলবে। এই আন্তঃনাক্ষত্রিক প্লাজমাকে সহজেই ধোঁয়াবিহীন অগ্নিশিখা বলে অভিহিত করা যায়। বিজ্ঞানী ফেইনবার্গ এবং শেফ্রিও প্লাজমাকে বলেছেন প্লাজমা-বিস্ট গঠনের উপাদান। একেবারে সাম্প্রতিক সময় ২০০৭ সালে ভি.এন টাইতোভিচ-এর নেতৃত্বে জেনারেল ফিজিক্স ইনস্টিটিউট অব দ্যা রাশিয়ান একাডেমি অব সায়েন্সের বিজ্ঞানীদের একটি দলও এ মত প্রকাশ করেছে যে, "প্লাজমা অবস্থা থেকে প্রাণের বিকাশ হওয়া খুবই সম্ভব।"[১১৯] বিজ্ঞানী রবার্ট এ.ফ্রেইটাস মহাবিশ্বে নন-বায়োলজিক্যাল প্রাণের সম্ভাব্যতার ব্যাপারে মত প্রকাশ করেছেন।'

'কী মত প্রকাশ করেছেন?'

---

১১৭. (Published: William Morrow and Co., New York)

১১৮. https://www.amazon.com/Life-Beyond-Earth-Intelligent-Earthlings/dp/0688036422

১১৯. "Cosmic Dust Clouds Point to Non-Carbon Life Forms" http://www.dail ygalaxy.com/my_weblog/2011/11/inorganic-cosmic-dust-points-to-non-carbon-life-forms.html "Physicists Discover Inorganic Dust With Lifelike Qualities" https://www.sciencedaily.com/releases/2007/08/070814150630.htm

'তাঁর মতে, এ ধরনের প্রাণব্যবস্থায় বিপাকক্রিয়া চারটি ধাপ দ্বারা হতে পারে। যথা: ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিজম, শক্তিশালী নিউক্লিয় বল, দুর্বল নিউক্লিয় বল, এবং মহাকর্ষ। এই সম্ভাব্য জীবন প্রক্রিয়ার নামকরণ করা হয়েছে, ক্রোমোডায়নামিক। আচ্ছা আরেকটা কথা বলি, পৃথিবীর প্রাণীকূল যে কার্বনভিত্তিক এটা তো জানেন?

'হুম সেটা জানি।'

'বিজ্ঞানী ফ্রেইটাসের মতে, ক্রোমোডায়নামিক লাইফ শক্তিশালী নিউক্লিয় বলভিত্তিক। এ ধরনের প্রাণের বিকাশের পরিবেশ থাকতে পারে কেবল নিউট্রন স্টারে। তিনি আরও বলেন যে, "পৃথিবীর কার্বনভিত্তিক প্রাণীকূলের মতো মহাকর্ষীয় প্রাণীর অস্তিত্ব থাকাও সম্ভব, যারা সরাসরি মহাকর্ষীয় বল থেকে শক্তি আহরণ করতে পারে। ফ্রেইটাসসহ অন্যান্য বিজ্ঞানীরা মহাশূন্যে প্রাণের বিস্তার ও এর সম্ভাব্যতার ব্যাপারে অনেকগুলো তত্ত্ব দিয়েছেন।"[১২০] সেগুলোর সব সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ করা হলে আজ সারা দিন চলে যাবে। মহাবিশ্বে সম্ভাব্য প্রাণের বিকাশ সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের উত্থাপিত অল্প কিছু তত্ত্বের কথা আপনাকে বললাম।'

'বাহ, এই তো খুব সুন্দর জিনের প্রমাণ পেয়ে গেলে তাই তো?' বেশ হেঁয়ালির স্বরে বললেন মহিউদ্দিন ভাই।

'না। আমি তো গোঁড়ামি করে বলতে পারি না, বিজ্ঞানীদের এই তত্ত্বগুলোই কুরআনে বর্ণিত জিনদের বর্ণনা। আমি শুধু বুঝাতে চেয়েছি, বিজ্ঞানীরা মহাবিশ্বে সম্ভাব্য প্রাণ থাকার সম্পর্কে এসব তত্ত্ব দিয়েছেন, যার সঙ্গে পৃথিবীর প্রাণীদের কোনো মিল নেই। প্লাজমা থেকে প্রাণের উদ্ভবের তত্ত্ব যে বিজ্ঞানীরা দিয়েছেন, তা দেখে কেউ কিন্তু এটা বলেনি, প্লাজমাবস্থার ৫০০০০ কেলভিনের ভয়ানক তাপে কীভাবে প্রাণের বিকাশ হতে পারে? বলেছিল কেউ?'

জাকির ভাই আর মহিউদ্দিন ভাই একে অন্যের দিকে একবার তাকিয়ে চুপ করে রইলেন। বুঝতে পারলাম তারা পালটা কোনো উত্তর রেডি করতে পারেননি।

'কী হলো ভাইয়ারা, কোনো জবাব নেই কেন? শক্তিশালী নিউক্লিয় বলভিত্তিক প্রাণ, এমনকি মহাকর্ষীয় প্রাণীর প্রস্তাবনা পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা দিয়েছেন। যারা কিনা

---

[১২০]. 10HypotheticalFormsOfLife" http://listverse.com/2015/07/17/10-hypothetical-forms-of-life/ কৃতজ্ঞতা স্বীকার 'অন্ধকার থেকে আলোতে'-এর লেখক মুশফিকুর রহমান মিনার ভাই এর প্রতি।

সরাসরি মহাকর্ষ বল থেকে প্রয়োজনীয় শক্তি পেতে পারে। আপনাদের মতো মুক্তমনা টাইপের কেউ বলেনি যে, শক্তিশালী নিউক্লিয় বল কিংবা মহাকর্ষের কোনোটাই উপাদান/পদার্থ নয়। তাহলে এখান থেকে কীভাবে প্রাণ সৃষ্টি হতে পারে?'

বেশ কিছুক্ষণ মুখ চাওয়-চাওয়ি করে অবশেষে জাকির ভাই বলে দিলেন, 'আমরা আসলে এসব জানতাম না।'

'তা জানবি ক্যান? কাল আক্কেল হয় নাই। তয় একটা কথা ঠিক যে, তোমরা এতক্ষণ ধইরা কী সব ভাষা কইছ, আমি কিছুই বুঝি নাই। কিন্তু এতটুকু বুঝছি, জিন কিন্তু আছে। এই করিম ভাই, চারটা চা দে। হিট খাইয়া পোলাগো মাথা গরম হই গেছে।'

চাচার মেজাজ দেখে মিনিট খানেকের মধ্যে চা চলে এলো। চায়ে চুমুক দিয়ে বললাম,

'সত্য বলার জন্য ধন্যবাদ ভাইয়া, আপনাদের মধ্যে সত্য বলতে পারা লোক খুঁজে পাওয়া মুশকিল। মহিউদ্দিন ভাইকে বলছি, বোঝার চেষ্টা করুন প্লিজ। আপনারা এখন বলছেন, এসব জানেন না। কিন্তু ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে নাজিলকৃত গ্রন্থ আল-কুরআনে যখন এক বিশেষ ধরনের অগ্নি (ধোঁয়াহীন আগুনের শিখা) থেকে গঠিত প্রাণীর কথা উল্লেখ করা হয়, তখন তো আপনারা আপত্তি তোলেন। আর অভিযোগ করে বলতে থাকেন যে, রিঅ্যাকশনারি কেমিক্যাল প্রসেস থেকে কীভাবে প্রাণ সৃষ্টি হতে পারে? বলুন এইটা কি দ্বিমুখী চরিত্র নয়? এটা কি আপনাদের চিন্তার সংকীর্ণতা নয়? এটা কি ফেইক মুক্তমনা নয়?'

কুরআন কি বাইবেল থেকে কপি করা

কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থেকে ফুটন্ত তেলে জল পড়ার মতো তেঁতে উঠলেন মহিউদ্দিন ভাই। উদ্ধত কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'অনেক হয়েছে, তোমার ব্যাখ্যা অনেক শুনেছি। যখনই কোনো কথা তোমাদের কুরআনের বিরুদ্ধে যায় তখনই তোমরা একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করাও। যত কিছুই করো না কেন, মুহাম্মদের নকলবাজি তো আর লুকিয়ে রাখতে পারনি।'

মহিউদ্দিন ভাইয়ের রিঅ্যাকশন দেখে বুঝতে পারলাম, সাপের লেজে পা দিয়েছি। বললাম, 'বুঝলাম না ! বুঝিয়ে বলুন, প্লিজ।'

'এই তো খ্রিষ্টান মিশনারিরা মুহাম্মদের চালবাজি ধরে ফেলেছে। মুহাম্মদ বাইবেল থেকে নকল করে লিখে, নিজের ওপর কোরান নাজিল হয়েছে বলে চালিয়ে দিয়েছে।'

'আচ্ছা আপনিও তাহলে খ্রিষ্টান মিশনারিদের সঙ্গে একমত?'

'শুধু আমি কেন? তোমাদের কোরানেও এই কথা স্বীকার করা আছে।'

'কুরআনে স্বীকার করা আছে মানে! বুঝলাম না, ক্লিয়ার করুন।'

'তোমাদের কোরানেই তো বলা আছে, কুরআন হচ্ছে তার আগের কিতাবসমূহের সমর্থক। আসল বিষয় হচ্ছে, মুহাম্মদ ছিল খুবই চালাক মানুষ। সে যখন কপি করছিল তখনই এই ফাঁক বন্ধ করে দিয়েছে, যেন পরবর্তীকালে তাঁর নকলবাজি

ধরা খেলে মানুষ তাঁর থেকে দূরে সরে না যায়। সেজন্যই আগে ভাগেই বলে রেখেছে যে, এইসব পূর্ববর্তী কিতাবের সমর্থক। আর তোমরাই তো যিশুকে নবি বলে বিশ্বাস করো। বাইবেল তো নবি মুহাম্মদের আগে যিশুকেই দেওয়া হয়েছে বলে বিশ্বাস করো।'

'আহা! ভাইয়া, কীসের সঙ্গে কী মিলাচ্ছেন? কোথাকার কথা কোথায় এনে লাগাচ্ছেন? আপনার বলা আয়াতাংশ ঠিক, কিন্তু প্রসঙ্গ এবং লজিক কোনোটিই ঠিক নেই। পুরো ব্যাপারটা আমি আপনাকে ক্লিয়ার করছি শুনুন। যে আয়াতটি আপনি বললেন, সেটা হলো কুরআনের সূরা আলে-ইমরানের ৩ নং আয়াত। আয়াতটি হচ্ছে— "তিনি সত্যসহ তোমার প্রতি কিতাব নাজিল করেছেন, যা তাঁর পূর্বের কিতাবের সমর্থক।"

'তো কী বোঝানো হয়েছে এখানে?'

'এখানে বোঝানো হয়েছে, ইতঃপূর্বে নবিদের ওপর যে কিতাব নাজিল হয়েছে, এই কিতাব সেগুলো সত্যায়ন করে। সে কিতাবগুলোতে যে কথাগুলো লিপিবদ্ধ ছিল, তার সত্যায়ন করে এবং তাতে যে সব ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণিত হয়েছে, তা সত্য বলে স্বীকার করে। আর এখানে পরিষ্কার কথা হলো, কুরআনও সে সত্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ, যে সত্তা পূর্বেও বহু কিতাব নাজিল করছেন। এটা যদি অন্য কারও পক্ষ থেকে আসত অথবা মানব রচিত হতো তাহলে কুরআন এবং উক্ত কিতাবগুলোর মধ্যে মিল থাকার পরিবর্তে অমিল থাকত।'[১২১]

'ওই একই কথা। বাইবেল তো পূর্ববর্তী কিতাবের মধ্যে আছে। যেগুলোকে তোমরা আল্লাহর কথা বলে বিশ্বাস করো। এখন চাপা দেওয়ার জন্য ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বলছ।' বেশ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বললেন মহিউদ্দিন ভাই।

'আগে তো আমাকে শেষ করতে দেবেন! কোথায় বলা হয়েছে যিশু বা ঈসা (আ.)-কে বাইবেল দেওয়া হয়েছে? কুরআনে বলা হয়েছে, "মরিয়ম পুত্র ঈসাকে পাঠিয়েছিলাম, তাদের সামনে তাওরাত কিতাবের যা কিছু ছিল তার সত্যতা প্রতিপাদনকারী হিসেবে। তাঁকে দিয়েছিলাম ইঞ্জিল..."[১২২] কুরআনের কোথাও বলা হয়নি যে, ঈসা মসিহ কিংবা যিশুকে দেওয়া হয়েছে বাইবেল।

---

[১২১]. তাফসির আহসানুল বায়ান, পৃষ্ঠা : ৯৬
[১২২]. সূরা মায়িদাহ-৫:৪৬

আমরা মুসলিমরা, ঈসা (আ.)-কে দেওয়া ইঞ্জিল কিতাবের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখি। বর্তমান প্রচলিত বাইবেল ঈসা (আ.)-কে দেওয়া সেই ইঞ্জিল কিতাব।'

'কেন? মানবে না কেন? তাহলে মুহাম্মদের নকলবাজি ফাঁস হয়ে যায় এই তো? তোমরা তো নিজেদের খুব চালাক মনে করো। মুহাম্মদ নিজেও খুব চালাক ছিল। আর তোমরা তাঁর অনুসারী হয়ে তাঁর মতোই চালাকি করছ। কৌশলে দুয়ে দুয়ে পাঁচ মেলাচ্ছ।'

বেশ গড়গড় করে কথাগুলো বলে গেলেন মহিউদ্দিন ভাই। এবার কিছুটা বিরক্ত হয়ে বললাম, 'ভাইয়া! আপনারা হঠাৎ তেড়ে ওঠা স্বভাব ঝেঁড়ে ফেলতে পারলেন না। আগে কথা তো শেষ করতে দেবেন।

জাকির ভাই, মহিউদ্দিন ভাইয়ের প্রতি হাত দিয়ে ইশারা করে বললেন, 'আগে শেষ করতে দে... হ্যাঁ, মিরাজ বল...'

আমি আবার বলতে শুরু করলাম। 'প্রথমত, আপনি কুরআনের কোনো ইংরেজি অনুবাদে কোথাও বাইবেল শব্দটি খুঁজে পাবেন না। মজার কথা হচ্ছে সমগ্র বাইবেলের কোথাও বাইবেল শব্দটি উল্লেখ নেই। দ্বিতীয়ত, এই বাইবেল ঈসা (আ.)-এর ওপর নাজিলকৃত ইঞ্জিল হতেই পারে না। কারণ, ঈসা (আ.)-এর ভাষা ছিল অ্যারামায়িক। তিনি অ্যারামায়িক ভাষাতেই ইঞ্জিল প্রচার করেছেন। কিন্তু মূল বাইবেল পুরোটা গ্রিক ভাষায় লেখা হয়েছে প্রায় ১৬০০ বছর ধরে। বর্তমান প্রচলিত বাইবেল থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়।'

'তাহলে আমরা এখন যে ভাষায় বাইবেল দেখি, যিশুর কিতাব এই ভাষায় ছিল না, এটাই তোমার দাবি?'

'শুধু দাবি নয়, প্রমাণ দিচ্ছি আপনাকে। যেমন, মার্কের লেখা গসপেলে আছে— "তিনি বালিকার হাত ধরে তাকে বললেন, টালিথাকুমি (বালিকা উঠে দাঁড়াও)।"[১২৩] টালিথা মানে বালিকা এবং কুমি মানে দাঁড়াও, এগুলো অ্যারামায়িক ভাষা।

---

[১২৩]. মার্ক-৫:৪১

মার্কের ৭ম অধ্যায়ে বলা হয়েছে, "তিনি আকাশের দিকে দৃষ্টি দিয়ে, দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে তাকে বললেন, ইফফাতা (খুলে যাক)।"[১২৪] জনের লেখা গসপেলে আছে, "যিশু তাঁকে বললেন, মরিয়ম, তিনি ফিরে তাকালেন, আর তাঁকে বললেন, রব্বানি (গুরু)।"[১২৫] সবচেয়ে সুন্দর উক্তি আছে ম্যাথিউ-এর গসপেলে। "যিশু খুব জোরে বলে উঠলেন, এলি-এলি-লামা-শবক্তানি?" যার অর্থ, ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, তুমি কেন আমায় ত্যাগ করেছ?'[১২৬]

'ইফফাতা, রব্বানি, এলি-এলি-লামা শবক্তানি আমার জানামতে এগুলো তো অ্যারামায়িক ভাষা।' বললেন জাকির ভাই।

'ইয়েস আমি বলার আগেই ধরে ফেলেছেন। বাইবেলেই অকাট্য প্রমাণ আছে যে, যিশু কথা বলতেন অ্যারামায়িক ভাষায়। অন্যদিকে, ঐতিহাসিকদের থেকেও এটা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, যিশু বা ঈসা (আ.) অ্যারামায়িক ভাষায় কথা বলতেন এবং ইঞ্জিলও অ্যারামায়িকক ভাষাতেই প্রচার করেছেন। *Where is Gods true Church today* বইয়ের লেখক Which language did Jesus speak – Aramaic or Hebrew শিরোনামে বিস্তারিত আলোচনায় স্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছেন, যিশু খ্রিষ্ট অ্যারামায়িক ভাষায় কথা বলতেন।[১২৭] অতএব, আপনি যদি আয়াতটা দিয়ে বলতেই চান যে, কুরআনে পূর্ববর্তী কিতাব থেকে কপি করা হয়েছে, তাহলেও এটা প্রমাণ হয় না যে, এটা বর্তমান বাইবেল থেকে কপি করেছে।'

'কিন্তু খ্রিষ্টান মিশনারীরা তো এই দাবি বহু বছর ধরেই করে আসছে?'

শীতল কণ্ঠের প্রশ্ন শুনে জাকির ভাই থেকে চোখ ফিরিয়ে মহিউদ্দিন ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, চোখের রক্তিম আভা আর দেখা যাচ্ছে না।

'বহু বছর কোনো প্রমাণ নয়, ভাইয়া। বহু বছর ধরে মানুষ দাবি করেছে পৃথিবী সমতল। আশ্চর্যের বিষয় এখনও *ফ্ল্যাট আর্থ সোসাইটির* লোকেরা সেটাই দাবি করছে। আপনি কি তাদের দাবি মেনে নেবেন?'

'তা কী করে হয়?'

---

[১২৪]. মার্ক-৭ : ৩৪
[১২৫]. জন-২০ : ১৬
[১২৬]. মথি-২৭ : ৪৬
[১২৭]. https://www.tms.edu/preachersandpreaching/what-language-did-jesus-speak/

'আচ্ছা, এবার খ্রিষ্টান মিশনারীদের কথায় আসেন। এই খ্রিষ্টান মিশনারিরা বাইবেল আল্লাহর বাণী এটা প্রমাণ করতে সক্ষম নয়। আবার দাবি করে কুরআন বাইবেল থেকে নকল করা। খ্রিষ্টানরা মূলত বাইবেলকে দুই ভাগে ভাগ করেছে। ওল্ড টেস্টামেন্ট এবং নিউ টেস্টামেন্ট। ঈসা (আ.)-এর আগে বনি ইসরাইলের কাছে প্রেরিত রাসূলদের কাছে পাঠানো কিতাবসমূহকে ওল্ড টেস্টামেন্ট বলে। আর যিশু বা ঈসা (আ.)-এর কাছে প্রেরিত ইঞ্জিল এবং তাঁর শিষ্যদের লেখা গ্রন্থসমূহকে বলে নিউ টেস্টামেন্ট। ওল্ড টেস্টামেন্টের একটা বইকে মূসা (আ.)-এর তাওরাত বলে দাবি করে।

'হুম, জানি। ৫ম বই ডিউটরনমি হচ্ছে মূসার ওপর প্রেরিত সেই তাওরাত। আর যিশুর জীবন কাহিনি নিয়ে রচিত নিউটেস্টামেন্ট তোমাদের ঈসা নবির ওপর প্রেরিত কিতাব।'

'পুরোটাই বানানো কথা।'

'মানে?'

'মানে খুব সহজ। ডিউটরনমির অধ্যায় ৩৪-এর ৬,৭,৮ অনুচ্ছেদে মূসা আ-এর মৃত্যুর কথা বর্ণনা করা হয়েছে। সপ্তম অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে মৃত্যুর সময় মূসা (আ.)-এর বয়স ছিল ১২০ বছর। আমরা জানি সমগ্র তাওরাত মূসা (আ.)-এর জীবদ্দশায় একত্রে নাজিল হয়েছে। তাহলে একজন নবির জীবদ্দশায় নাজিল হওয়া গ্রন্থে কীভাবে ওই নবির পূর্ব মৃত্যুকাল উল্লেখ করা হয়? মৃত্যুর সময়ের বয়স এবং পরের ঘটনা বর্ণনা করা হয়?'

'হা হা হা, পাগলা পাগলা। এইটা হইল আমাদের এলাকার রতন পাগলার মতো। হেই কয়, হেই নাকি তার বাপের বিয়া খাইছে। তয় এইটা তো কিলিয়ার যে, বাইবেল টাইবেল আমাদের মূসা নবির তাওরাত না।'

চাচা প্রাণ খুলে হাসলেও বাকি দুজন চুপ থাকাটাই যুক্তিযুক্ত মনে করলেন। তাই আমি আবারও বলা শুরু করলাম,

'এবার মিশনারিদের আরেকটি ভাওতাবাজি দেখুন। বর্তমান বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্ট এবং নিউ টেস্টামেন্টের অনেক কথা মিল রয়েছে। মিশনারিরা কি বলেছে, নিউ টেস্টামেন্ট ওল্ড টেস্টামেন্ট থেকে কপি করা? বলেনি। আবার দুটাতেই অনেক পরস্পরবিরোধী কথা আছে। যেমন, এবার দেখুন, বাইবেলে ঈশ্বরের হিসেব। এক জায়গায় বলা হলো, "যোয়াব রাজার হাতে লোকসংখ্যার

তালিকা তুলে দিলো। তরবারি ব্যবহার করতে পারে এমন লোকর সংখ্যা ইজরাইলে ছিল ৮০০০০০ এবং যিহুদার লোকসংখ্যা ছিল ৫০০০০০ জন।"[১২৮] আবার অন্য জায়গায় বলা হলো, "ইজরাইলে মোট ১১০০০০০ লোক আছে যারা তরবারির ব্যবহার জানে। আর যিহুদায় এই ধরনের লোকের সংখ্যা ৪৭০০০০।"[১২৯]

তাহলে তরবারি ব্যবহার জানা লোকের সঠিক সংখ্যা কত? ৮০০০০০ নাকি ১১০০০০০? যিহুদার লোকসংখ্যা কত ছিল ৫০০০০০ জন নাকি ৪৭০০০০ জন? কোনটা সঠিক? এমনকি বাইবেলের ঈশ্বর নাকি যোগ অঙ্ক করতে পারে না।

যেমন, এজরা এবং নেহেমিয়া তাদের গ্রন্থে ব্যবিলনের বন্দিবস্থা থেকে ফিরে আসা লোকদের সংখ্যা উল্লেখ করে তাদের যোগফল উল্লেখ করেছে। এজরাতে বলা হলো, "যারা ফিরে এলো তাদের মধ্যে ৪২৩৬০ জন ব্যক্তি ছিল। এ ছাড়াও তাদের সঙ্গে ছিল ৭৩৩৭ জন পুরুষ ও নারী ভৃত্য, ২০০ জন গায়ক ও গায়িকা।"[১৩০] কিন্তু কারও প্রদত্ত সংখ্যা যোগ করলে ৪২৩৬০ জন হয় না। এজরার সংখ্যা যোগ করলে হয় ২৯৮১৮ আর নেহেমিয়ার সংখ্যা যোগ করলে হয় ৩১০৮৯ জন।

চিন্তা করুন, এই বাইবেল মহান ঈশ্বরের বাণী কীভাবে হতে পারে? যেখানে এমন শত শত পরস্পরবিরোধী কথা আছে। মিশনারিরা কি বলেছে, নিউ টেস্টামেন্টের তথ্য ঠিক ওল্ড টেস্টামেন্ট ভুল? অথবা ওল্ড টেস্টামেন্ট ঠিক নিউ টেস্টামেন্ট ভুল? তাও বলেনি। প্রকৃত কথা হচ্ছে, ইঞ্জিলের খুব সামান্য অংশ এই বাইবেলে থাকলেও থাকতে পারে, বাকি সবই মানুষের নিজের হাতের লেখা। গসপেলগুলোও আলাদা আলাদা সময়ে আলাদা আলাদা মানুষের লেখা। যে চারটি গসপেলকে তারা ইঞ্জিল বলে দাবি করে সেগুলো গ্রিক কিংবা ইংরেজি অনুবাদে নাম করা হয়েছে। সেগুলোর নাম জানেন?

'জানি তো। গসপেল অব জন, গসপেল অব মার্ক...'

'আরে না না ভাইয়া। আসল নাম হচ্ছে যথাক্রমে :

---

[১২৮]. সেকেন্ড স্যামুয়েল-২৪ : ৯

[১২৯]. ফার্স্ট ক্রোনিকল্স-২১ : ৫

[১৩০]. এজরা-২ : ৬৪, নেহমিয়া-৭ : ৬৬

১. The Holy Gospel of Jesus Christ According to St. Matthew (সাধু মথির মতানুসারে ঈসা মসির ইঞ্জিল)

২. The Holy Gospel of Jesus Christ According to St. Mark. (সাধু মার্ক-এর মতানুসারে ঈসা মসির ইঞ্জিল)

৩. The Holy Gospel of Jesus Christ According to St. Luke. (সাধু লুক-এর মতানুসারে ঈসা মসির ইঞ্জিল)

৪. The Holy Gospel of Jesus Christ According to St. Jhon. (সাধু জনের মতানুসারে ঈসা মসির ইঞ্জিল)

দেখুন, অমুকের মতে, তমুকের মতে, নাম থেকেই বোঝা যায় যে, বিভিন্ন ব্যক্তি বাইবেল লেখার পর তা ইঞ্জিল বলে দাবি করেছে। এ ছাড়াও খ্রিষ্টানদের মধ্যে বাইবেল নিয়ে বিভক্তি আছে সেটা জানেন?'

'বলিস কি! মূলগ্রন্থ নিয়েই বিভক্তি?'

'জি হ্যাঁ, খ্রিষ্টানরা প্রধানত তিনটি বৃহৎ দলে বিভক্ত। ক্যাথোলিক, প্রটেস্ট্যান্ট আর অর্থোডক্স। তাদের প্রত্যেকের আলাদা আলাদা ধারার বাইবেল আছে। মূলধারা ছাড়াও আরও অনেক ধারার বাইবেল আছে। সব ধারার বাইবেলে, এমন অসংখ্য অসংগতি আছে। আছে বহুসংখ্যক অনুবাদ। আছে বহু ভার্সন।'

'বহু ভার্সন মানে?'

'যেমন, ASV, KJV, CJV, DARBY, DRA, JUB, MSG, NOG, NABRE, WEB, WYC, YLT ইত্যাদি। কোনোটির সঙ্গে কোনোটির ১০০% মিল নেই। যে ভার্সনকে সর্বজনীন বলা হয় সেটা হচ্ছে KJV (King James version)। এই ভার্সন সম্পর্কে ১৮৭০ সালে ইংল্যান্ডের ক্যানটনবেরিতে অনুষ্ঠিত খ্রিষ্টানদের মহাসম্মেলনে খ্রিষ্টান পণ্ডিতগণ সর্বসম্মতভাবে মত প্রকাশ করেন যে, ১৬১১ সালের কিং জেমস ভার্সনের অনেক বিবরণকেই বর্তমান জ্ঞান বিজ্ঞানের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো যাচ্ছে না। ফলে সেসব বাদ দিয়ে বাইবেলকে যুগোপযোগী করে তুলতে হবে।'[১৩১]

'আবার সংস্করণ করেছে?'

---

[১৩১]. Jesus in the 19th century and after by Mr.Wincle and Widgery.

'তো আর বলছি কী! তার দশ বছর পর সংস্করণ বের হয় RSV (Revised Standard Version). এই রিভাইসড ভার্সনেও অসংগতি আছে অগণিত। আর সকল যৌক্তিক মানুষ এটা মানবে, স্রষ্টার কথায় কোনো ভুল থাকতে পারে না। যে বই অসংগতিপূর্ণ তা স্রষ্টার নয় বরং মানুষের নিজ হাতে লেখা। আর এ কারণেই এই বাইবেলে আছে শত শত স্ববিরোধী, অশালীন, অযৌক্তিক, অবৈজ্ঞানিক কথা। আর এমন বই কখনো আল্লাহর পাঠানো কিতাব ইঞ্জিল হতেই পারে না। আচ্ছা, তর্কের খাতিরে ধরেই নিলাম যে এই বাইবেলই সেই আসমানি কিতাব ইঞ্জিল। তারপরেও, মিশনারিদের এই অভিযোগ টেকে না।'

'কেন, কেন?'

'এর কারণ হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময় বাইবেলের কোনো আরবি অনুবাদ ছিল না। প্রথম সাদিয়া গাওন বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টের আরবি অনুবাদ করেন ৯০০ খ্রিষ্টাব্দের সময়। মানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মৃত্যুর প্রায় ২০০ বছর পর।[১৩২] আর নিউ টেস্টামেন্টের আরবি অনুবাদ করেন ইরপেনিয়াস, ১৬০০ খ্রিষ্টাব্দের সময়।[১৩৩] রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মৃত্যুর প্রায় ১০০০ বছর পর।'

'তার মানে নবি মুহাম্মদের জীবিত সময়ে বাইবেল আরবিতে ছিল না?'

'না, সেটাই তো বললাম। তাহলে নিরক্ষর রাসূলুল্লাহ ﷺ কীভাবে গ্রিক ভাষার বাইবেল পড়ে সেখান থেকে নকল করলেন? অথচ তিনি নিজের ভাষাই পড়তে বা লিখতে পারতেন না।'[১৩৪]

'মিরাজ, তোমার এই যুক্তি আমি মানতে পারলাম না। মুহাম্মদ পড়া লেখা জানত না বলে কপি করতে পারেনি এটা অযৌক্তিক! কারণ, মুহাম্মদের অনেক সঙ্গী সাথি ছিল, যারা পড়া লেখা জানত। মুহাম্মদের সাথি উমরও পড়া লেখা জানত। তারা পড়ে বললে মুহাম্মদের পক্ষে কপি করা সহজ।' বললেন মহিউদ্দিন ভাই...

'কী যে বলেন ভাইয়া। মুহাম্মদ ﷺ-এর সাথিরা পড়েছিল, তিনি শুনেছেন আর কপি করেছেন? আচ্ছা সমস্যা নেই, হাতে আজকে সময় অনেক, এই ব্যাপারেও বলতে পারব। বলি শুনেন, এই কথা ঠিক সেই সময়ের কঠিন মুহূর্তেও

---

১৩২. http://textus-receptus.com/Bible_translations_into_Arabic

১৩৩. Judaism and Islam: Boundaries, Communications, and Interaction : Essays in Honor of William M. Brinner , Brill, pp. 227–236

১৩৪. সহিহ বুখারি, হাদিস নং-৩১৮৪

আলহামদুলিল্লাহ উমর বিন খাত্তাব (রা.) শিক্ষিত মানুষ ছিলেন। তিনি সেই সময়ে সাড়া জাগানো কবিতা লিখতে পারতেন। আচ্ছা তিনি ইসলামে আসার পরে কুরআনের মহত্ত্ব দেখেছেন? নাকি কুরআনের মহত্ত্ব দেখে ইসলামে এসেছেন?'

'সে বিষয়ে তেমন ভালো জানি না।'

'আচ্ছা আমি বলছি, তিনি ছিলেন প্রচণ্ড ইসলাম বিদ্বেষী। কুরআনের একটি অংশ পড়ার কারণে তিনি তার বোন এবং ভগ্নিপতিকে খুব মেরেছিলেন। তারপর সেই অংশ তিনি নিজেই পড়েছিলেন। কুরআনের মহত্ত্ব দেখেই তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে সরাসরি এসে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।'[১৩৫]

'হ্যাঁ হ্যাঁ, এরকম ঘটনা আমিও শুনেছিলাম।'

'এরকম আরও অনেক সাহাবি আছেন, যারা কুরআন শুনে আশ্চর্য হয়ে ইসলামে এসেছেন। তাহলে কে আগে নকল করে দিয়েছিল? তা ছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ সেই সময়ের মুশরিকদের কাছেও নিখাদ সত্যবাদী এবং বিশ্বাসী ছিলেন। কেউ কোনো ব্যাপারে তাঁর প্রতি মিথ্যা বলার অভিযোগ আনেননি। সব কাজেই মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রতি আস্থাশীল ছিল। আপত্তি ছিল শুধু তারা বাপ দাদার আমল ছাড়তে পারবে না। অথচ মুহাম্মদ ﷺ-এর দাওয়াত ছিল বাপ দাদার আমল তথা সকল গাইরুল্লাহকে অস্বীকার করে এক আল্লাহর ইবাদত করতে হবে।'[১৩৬]

'কে কী মানল না মানল তা দিয়ে আমাদের কাজ কী?' বললেন মহিউদ্দিন ভাই।

'আমি আপনাদেরকে এটা বোঝাতে চাচ্ছি, তখনকার সময় তো কেউ এই অভিযোগ করেনি, ইহুদি নাসারাদের কিতাব থেকে নকল করে বলছে (নাউযুবিল্লাহ)। এখন এসে আপনাদের এই অভিযোগ হাস্যকর নয় কি? আচ্ছা, আপনাদের অভিযোগ যদি মেনেও নিই, সাহাবারা কেউ বাইবেল পড়েছে আর রাসূলুল্লাহ ﷺ শুনে সিলেক্ট করেছে (নাউযুবিল্লাহ), তাহলে বলব রাসূলুল্লাহ ﷺ বাইবেল থেকে নকল করেননি বরং বাইবেলের ভুল শুধরে দিয়েছেন।'

'এমন মনে হওয়া কারণ?'

---

১৩৫. আর রাহিকুল মাখতূম; আল্লামা সফিউর রহমান মুবারকপুরী, পৃষ্ঠা : ১৩৭-১৪৪।
১৩৬. সূরা বাক্বারা-২ : ১৭০

'কারণ, এমন অনেক তথ্য আছে যেসব ব্যাপারে বাইবেল কোনো কথাই বলেনি, অথচ কুরআনে সঠিকভাবে বলা হয়েছে।[১৩৭] আর এমন অনেক তথ্য আছে যেগুলোর ব্যাপারে কুরআন এবং বাইবেল ২টি গ্রন্থই কথা বলেছে। এখন লজিক্যালি একটা প্রশ্নের উত্তর দিন।'

'বল।'

'আচ্ছা, যদি এমন হতো যে, কুরআন বাইবেল থেকে কপি করা, তাহলে বাইবেলের ভুলগুলো কুরআনে উল্লেখ থাকার কথা না?'

'অবশ্যই থাকার কথা।' বললেন জাকির ভাই।

'কিন্তু বাইবেলের কথা বিজ্ঞানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক বা ভুল, অন্যদিকে কুরআনের একই বিষয়ে বর্ণনা বিজ্ঞানের সঙ্গে কোনো সংঘর্ষ নেই। যেমন, বাইবেলে বলা হলো পৃথিবীকে সুদৃঢ় করে স্থাপন করা হয়েছে, ফলে পৃথিবী নড়াচড়া করে না/ঘোরে না।[১৩৮] একথা ঠিক না ভুল?'

'ভুল।'

'আর কুরআন বলছে, '"তিনি সৃষ্টি করেছেন দিন এবং রাত্রি, সূর্য এবং চন্দ্র; প্রত্যেক (গ্রহ, নক্ষত্র, সকল আকাশি বস্তু) নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণ করে।"'[১৩৯] পৃথিবীর আকৃতি বাইবেল অনুযায়ী একটি পয়সার মতো। বাইবেলে এক যায়গায় বলছে, "শয়তান তাঁকে একটি উঁচু পাহাড়ে ওঠাল এবং তাকে পৃথিবীর সব রাজ্য দেখাল।"[১৪০] যতই উঁচু পাহাড় হোক না কেন, পৃথিবীর সব রাজ্য দেখা সম্ভব যদি পৃথিবী চ্যাপ্টা হয়। ঠিক?'

'হুম।'

'আবার অন্য জায়গায় বলা হলো, "তিনি (ঈশ্বর) বৃত্তাকার পৃথিবীর ওপর বসে রইলেন"[১৪১] তাহলে দুই ভার্স অনুযায়ী, পৃথিবী বৃত্তাকার এবং চ্যাপ্টা তার মানে পয়সার আকৃতি। ওকে?'

---

[১৩৭]. http://www.islamictreasure.com/689-101-proofs-that-the-quran-is-not-copied-from-the-bible/

[১৩৮]. ফার্স্ট ক্রনিকলস-১৬ : ৩০

[১৩৯]. সূরা আম্বিয়া-২১ : ৩৩

[১৪০]. মথি-৪ : ৮

[১৪১]. আযায়াহ-৪ : ২২

'ওকে কীভাবে হবে? এইটা তো পাগলামো কথা।'

'মিশনারি লোকগুলো তো দেখছি খুব ফাজিল। আমি শুনছি হেরা নাকি পাহাড়ি এলাকার লোকদের ট্যাকা পয়সা দিয়া খ্রিষ্টান বানাইতেছে?' আমার কাছে জানতে চাইল চাচা।

'চাচা, আপনি ঠিক বলেছেন। এইসব মিশনারিরা মুসলিম প্রধান এলাকায় গিয়ে, তাদের ক্ষুধা দরিদ্রতার সুযোগ নিয়ে ধর্মান্তরিত করে। অর্থাৎ টাকা পয়সার লোভ দেখিয়ে খ্রিষ্টান বানায়। যাক, আজ আমি সেদিকে যাব না। কুরআনে সূরা যুমারে বলা হয়েছে– 'তিনি রাত্রিকে আচ্ছাদিত করেন দিবস দ্বারা, দিবসকে আচ্ছাদিত করেন রাত্রি দ্বারা।'[১৪২]

'রাত-দিনের আচ্ছাদনের সঙ্গে পৃথিবীর আকৃতির কী সম্পর্ক, বুঝলাম না?'

'আরে এটা তো সাধারণ অনুবাদ। আয়াতের আরবি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, কাওর। কাওর অর্থ হচ্ছে একটি জিনিস দিয়ে অপর একটি জিনিসকে জড়িয়ে দেওয়া। যেমন : মাথায় পাগড়ি পরিধান করা।[১৪৩] দিন ও রাত্রি একে অপরকে কুণ্ডলি পাকিয়ে আচ্ছাদিত করা তখনই সম্ভব যদি পৃথিবির আকৃতি গোল হয়। পৃথিবীর আকৃতি সমতল বা চ্যাপ্টা হলে দিন-রাত্রির পরিবর্তন হতো হঠাৎ করে, তখন আর আচ্ছাদন হতো না।'

'ও আচ্ছা।'

'এবার দেখুন, সৃষ্টি সম্পর্কে বাইবেলের বর্ণনা হচ্ছে, ২৪ ঘণ্টার হিসেবে ছয় দিনে এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে।[১৪৪] বর্তমান বিজ্ঞান অনুযায়ী মহাবিশ্ব ছয়টি পর্যায়ে সৃষ্টি হয়েছে ঠিকই কিন্তু কোনোভাবেই ২৪ ঘণ্টার হিসেবে ছয় দিনে নয়।

সময় ছয়টি ভাগে ছিল ঠিক কিন্তু সময়টা ২৪ ঘণ্টার হিসেবে এক দিন তো নয়। অনেক লম্বা সময়।

এবার দেখুন, কুরআন বলছে– "নিশ্চয় তোমাদের রব আল্লাহ, যিনি সৃষ্টি করেছেন নভোমণ্ডল এবং ভূমণ্ডল ছয়টি সময়কাল ধরে।"[১৪৫]

---

[১৪২]. সূরা যুমার-৩৯ : ৫

[১৪৩]. Scientific Trends in the Quran, A.M. Soliman, P;17

[১৪৪]. জেনেসিস-১ : ৫-৩১

'চালাকি না? কোরানে তো ঠিকই দিন বলা হয়েছে। তুমি চালাকি করে বলছ সময়কাল।' হা...হা...হা... করে হাসতে লাগলেন মহিউদ্দিন ভাই।

ফিলোসোফার ওরফে মহিউদ্দিন ভাই মুখের হাসিটাকে আরও দীর্ঘক্ষণ রাখতে চাইলেন। কিন্তু চাচার সঙ্গে চোখাচোখি হওয়ায় হাসিটাকে থামিয়ে দিতে বাধ্য হলেন। কারণ, মহিউদ্দিন ভাই কথা বলা শুরু করলে জমির চাচা তার দিকে গম্ভীর মুখে চেয়ে থাকেন। চাচার পান খাওয়া হাসিটা যতটা প্রাণবন্ত, গম্ভীরতাটা ঠিক ততটাই ভয়ংকর।

'ভাইয়া লেট মি ফিনিশ। কুরআনে দিন বলা হয়নি, বলা হয়েছে আইয়্যাম। আরবি আইয়্যাম শব্দটি হচ্ছে ইওম-এর বহুবচন। ইওম অর্থ দিন, কাল, মাস, বছর, অনেক লম্বা সময়কাল অথবা ক্ষুদ্র সময় অর্থাৎ যেকোনো সময়ের জন্য ব্যবহৃত হয়।'

'সুবিধাবিশেষে অর্থের ব্যবহার, বেশ ভালো, ভালো তো, ভালো না!'

'সুবিধাবিশেষ না, কথাটি হবে ক্ষেত্রবিশেষ। আচ্ছা, বলেন তো ব্যাংকিং মানে কী?'

'টাকা পয়সা লেনদেনসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান ও কার্যক্রম।'

'ওকে। যখন আপনি ফিজিক্সের গতিসংক্রান্ত টপিক নিয়ে কথা বলবেন, তখন ব্যাংকিং মানে কী?'

মহিউদ্দিন ভাই জাকির ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে আছেন। জাকির ভাই বললেন, 'ফিজিক্সে ব্যাংকিং মানে বাঁক। যেমন, আমরা সাইকেল চালাচ্ছি, রাস্তার মোড়গুলোর টার্নিং পয়েন্টকে ব্যাংকিং বলা হয়।'

'মহিউদ্দিন ভাই, দেখলেন তো, ক্ষেত্রবিশেষে একই শব্দের ভিন্ন অর্থ হতে পারে। আপনি অনুবাদ দেখেছেন। অনেক অনুবাদক আয়াতের আইয়্যাম শব্দকে দিন হিসেবে অনুবাদ করেন। যেমন, মহসিন খান, ইউসুফ আলি, পিকথাল অনুবাদ করেছেন, days অর্থাৎ দিন। এই আয়াতের জন্য days অনুবাদ সঠিক নয়। আলহামদুলিল্লাহ, শাকির অনুবাদ করেছেন periods of time আর আসাদ অনুবাদ করেছেন aeons অর্থাৎ সময়কাল, দুটোই সঠিক। ক্লিয়ার?

---

[১৪৫]. সূরা আরাফ-৭ : ৫৪

'বলে যা।' বললেন জাকির ভাই।

'এবার বলুন, পৃথিবী ধ্বংস হবে কি হবে না?'

'বিজ্ঞান বলছে, শুধু পৃথিবী নয়, সব ধ্বংস হয়ে যাবে।'

'দেখুন বাইবেল কী বলে। পৃথিবীর অস্তিত্ব সম্পর্কে বাইবেল বলছে, "যুগ যাবে যুগ আসবে, কিন্তু পৃথিবী চিরকাল থাকবে।"'[১৪৬]

'আর কোরান?'

'কুরআন বলছে, কিয়ামাতের সময় নক্ষত্রগুলো শক্তিহীন হয়ে যাবে।[১৪৭] তার মানে গ্রাভিটি ফোর্স থাকবে না। সবকিছুর ব্যালেন্স নষ্ট হয়ে যাবে। আকাশমণ্ডলীর সবকিছুই বিস্ফোরিত হয়ে খণ্ড বিখণ্ড হয়ে যাবে।[১৪৮] আর কিয়ামাহ মানেই হলো সব ধ্বংস। পবিত্র কুরআনে একটি সূরাই আছে সূরা নাম্বার ৭৫, আল-কিয়ামাহ।

এবার আসুন, বাইবেল কুরআন যদি একই ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে তাহলে, একজন ঈশ্বরের তো বৈশিষ্ট্য দুই রকম হতে পারে না তাই না?'

'তা তো হতে পারে না।'

'কিন্তু বাইবেলের স্রষ্টা আর কুরআনের প্রেরক স্রষ্টা তো এক নয়। বাইবেলের স্রষ্টা সর্বশক্তিমান নয়। বাইবেল বলছে, "ঈশ্বর যিহুদার (যোদ্ধাদের) সহায় ছিলেন, পাহাড়ি দেশের অধিবাসীদের অধিকারচ্যুত করলেন। কিন্তু উপত্যকার অধিবাসীদের পারলেন না। কারণ, তাদের লোহার রথ ছিল।"[১৪৯] আবার জেনেসিসে বলা হলো যে, "ঈশ্বর যাকোবের সঙ্গে সারা রাত ধরে মল্লযুদ্ধ করেছিলেন। যুদ্ধে কেউ কাউকে হারাতে পারেননি। যুদ্ধে জিততে না পেরে ঈশ্বর যাকোবের উরু ভেঙে দিলেন।"'[১৫০]

---

[১৪৬]. ইক্লেসিয়াসটিস-১ : ৪
[১৪৭]. সূরা নাজম-৫৩ : ১
[১৪৮]. সূরা হাক্কাহ-৬৯ : ১৬
[১৪৯]. জাজেস-১ : ১৯
[১৫০]. জেনেসিস-৩২ : ২৪-৩০

'হা হা হা... ঈশ্বর নাকি মানুষের সঙ্গে যুদ্ধে পারে না। বাইবেলে কি এগুলো লেখা আছে? বাবা মিরাজ, তুমি বলে যাও।'

চাচার সেই পান খাওয়া দাঁতের হাসি চলতেই থাকল। দেখলাম, মুক্তমনা (!) বন্ধুদ্বয় চুপ করে আছেন।

'বাইবেলের ঈশ্বর সর্বজ্ঞ নয়। ঈশ্বরের কথা শুনে আদম এবং তার স্ত্রী যখন গাছের আড়ালে লুকালেন তখন বাইবেলের ঈশ্বর তাদেরকে দেখেননি, খুঁজে পাননি। তাই আদমকে ডেকেছিলেন, তুমি কোথায়?[১৫১] অন্যত্র বলা হলো ঈশ্বর মানুষের চিৎকার শুনতে পেলেও দেখতে পান না।[১৫২] তাই পৃথিবীর মানুষের অবস্থা দেখতে হলে তাকে নিচে নেমে আসতে হয়।'[১৫৩]

'নাহ, এটা তো একজন ইশ্বরের বৈশিষ্ট্য হতে পারে না।'

'দেখুন, বাইবেলের ঈশ্বর আগে থেকে ভালো-খারাপ বুঝতেন না। বলা হলো- "ঈশ্বর বললেন, আলো ফুটুক, আলো ফুটল। তখন ঈশ্বর দেখলেন যে আলো ভালো, তখন তিনি অন্ধকার থেকে আলো আলাদা করলেন।"'[১৫৪]

তারপর আর এক জায়গায় বলা হলো, "ঈশ্বর শুকনো জমির নাম দিলেন পৃথিবী। আর এক জায়গায় দেখলেন পানি জমা হয়ে আছে। সেই জায়গার নাম দিলেন মহাসাগর। ঈশ্বর দেখলেন ব্যবস্থাটা ভালো হয়েছে।"'[১৫৫]

'তার মানে বাইবেলের ঈশ্বর আগে জানতেন না, আলো ভালো। তা ছাড়া আলোর অনুপস্থিতই হলো অন্ধকার, অন্ধকার থেকে আলো আলাদা করলেন, এসব আবার কী?' বললেন জাকির ভাই।

'সেটাই তো দেখলেন। বাইবেলে আরও অনেক ঘটনার বর্ণনা আছে। সেগুলোতে দেখা যায়, ঈশ্বর অনেক কিছুই আগে থেকে জানতেন না। পরে যখন দেখলেন এগুলো ভালো, তখন সেগুলো পৃথিবীতে স্থাপন করে দিলেন। অন্যদিকে আল-কুরআনের প্রেরক আল্লাহ তাআলা সর্বশক্তিমান, সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ, সর্বদ্রষ্টা।

---

[১৫১]. জেনেসিস-৩ : ৮-৯
[১৫২]. জেনেসিস-১৮ : ২০-২১
[১৫৩]. জেনেসিস-১১ : ৫
[১৫৪]. জেনেসিস-১ : ৩-৪
[১৫৫]. জেনেসিস-১ : ১০

যদি বাইবেল থেকে কুরআন কপি করা হতো, তাহলে বাইবেলের ভুল তথ্যগুলো কুরআনেও থাকত। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ, কুরআনে কোনো ভুল তথ্য নেই এবং বাইবেলের লেখকের সঙ্গে কুরআনের লেখকের মিল নেই। আমি সম্ভবত আপনাদের বোঝাতে পেরেছি।'

'একেবারে পানির মতো বুঝেছি বাবা। আমরা অল্প লেখাপড়া জানা মানুষ। তোমার মতো ভালো ছেলের সঙ্গে থাকলে বহুত কিছু শিখবার পারি।'

'হ্যাঁ চাচা, এজন্যই কুরআনে প্রথম পড়ার কথা বলা আছে। যারা কুরআন হাদিস নিয়ে পড়াশোনা করে তাদের বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়।'

চাচা মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিলে আমি আবারও জাকির ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'ভাইয়া আপনারা বুঝতে পারছেন?'

'হুম, অনেকটাই বোঝা গেছে।'

'তাহলে একটু ভাবুন তো, একটি বইয়ের ভুলগুলো বাদ দিয়ে শুধু সঠিকগুলো গ্রহণ করা একজন নিরক্ষর ব্যক্তির পক্ষে কি কখনো সম্ভব? তারপরেও যদি আপনারা জোরপূর্বক দাবি করেন যে, কুরআন বাইবেল থেকে শুনে শুনে লেখা হয়েছে তাহলে আমি বলব, কুরআন বাইবেল থেকে কপি করেনি; বরং তার ভুলগুলো শুধরে দিয়েছে।'

কুরআনে গাণিতিক ভুল; নাকি অজ্ঞেয়বাদীর অজ্ঞতা

রুঢ় আচরণের পরিবর্তে হাসতে হাসতে মহিউদ্দিন ভাই বললেন, 'কাহিনি সিনপাট। এই বয়সে বহুত চালাক হইছো ভাই। বাইবেলের এই ভুল সেই ভুল, গাণিতিক ভুল, বহুত কইছো। মাগার কোরানের গাণিতিক ভুল চাপাইয়া গেছগা। কোরানের গাণিতিক ভুল কেডা করছে? ওই বাইবেলের ঈশ্বর আইছেনি?'

পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে বুঝলাম ওনার মাথা কিঞ্চিত গরম হয়েছে। তাই জানতে চাইলাম, 'আপনি কুরআনে কোথায় গাণিতিক ভুল দেখলেন?'

'ভাব দেখছসনি জাকির? হেয় কিচ্ছু জানে না। জানবে ক্যামনে? হেয় তো শুধু হের সুবিধামতো লেকচার ঝাড়ে। ক্যান, তোমগো আল্লা কোরানে সম্পত্তি বন্টনের হিসেবে ভুল করে নাই?'

'কীভাবে?'

'আরে, কোরানের হিসেব অনুযায়ী যদি কোনো পুরুষ মারা যাওয়ার পর তার স্ত্রী, দুইটি মেয়ে সন্তান এবং বাবা-মা দুজনেই জীবিত থাকে তাহলে তাদেরকে সম্পদ বন্টন করতে হবে এইভাবে,

বাবা-মা দুজনেই পাবে মোট সম্পত্তির ১/৬ অংশ করে, দুই মেয়ে পাবে ২/৩ অংশ এবং স্ত্রী পাবে ১/৮ অংশ। এবার অংশগুলো যোগ করলে হয় (১/৬ + ১/৬ + ২/৩ + ১/৮) মোট ২৭/২৪। কেমনে কী? সম্পূর্ণ অংশ ১ হয় না। আর সম্পূর্ণ অংশ ১ না হলে এইটা ভুল। কোরানে আল্লা সামান্য অঙ্কে ভুল করল? হা হা হা...'

'ভাইয়া, আপনার কথা শেষ হয়েছে?' মহিউদ্দিন ভাইয়ের কাছে জানতে চাইলাম।

'হুম, এবার দেখি তুমি ক্যামনে গোজামিল দাও বাপু?'

'বাবা মিরাজ, আমিও এই হিসেব ভালোভাবে বুঝবার পারি না। জানোই তো, আমি স্বল্প শিক্ষিত মানুষ! তয় তুমি বুঝাইলে ভালোভাবে বুঝবার পারুম।'

জমির চাচা বেশ জানার আগ্রহ নিয়ে আমার দিকে চেয়ে থাকলেন। ফিলোসোফার ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলাম,

'মাতবর সাহেবকে তো চিনেন?'

'চিনবো না মানে? তার মতো মুক্তমনা এই যুগে পাওয়া যায় কয়জন? তিনি অসাধারণ এক প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। আহা, উনি যে কত মানুষরে সত্যের পথ দেখালেন তার হিসেব দেওয়া কঠিন। আমি নিজেও তাকে আইডল মানি। এখন পথ দেখানোর মানুষের বড়োই অভাব।'

'গট দ্যা পয়েন্ট!'

'তুমি আবার কী পয়েন্ট পেলে?' বেশ হেঁয়ালির ছলে বললেন মহিউদ্দিন ভাই।

'এই অভিযোগটা নতুন না। এই কথাগুলো অনেক আগে থেকেই নাস্তিক এবং খ্রিষ্টান মিশনারিরা প্রচার করে আসছে। হতে পারে আপনি তাদের থেকে কপি করেছেন মাত্র। ইন্ডিয়াতে বেশি প্রচার করেছে আপনাদের আরেক গুরু অরুনশরি। আর বাংলায় আপনাদের মাতবরগুরুজি। আচ্ছা, এবার একটি সরল করুন তো। ৫ × ৫ − ৫ + ৫ × ২ = কত?

কিছুক্ষণ মনে মনে হিসেব করে জাকির ভাই বললেন, '৩০'।

'আমি যদি বলি ৫? সরল অঙ্কের BODMAS নিয়ম অনুযায়ী গুণের কাজ আগে করতে হবে। প্রথমে যোগের কাজ করলে হবে না।

আপনাদের দেশীয় গুরুজি, ভিনদেশীয় গুরুজিরা কুরআনের সম্পদ বন্টনের হিসেবে ক্ষেত্রে ঠিক এই ভুলটাই করে। কাকে আগে দিতে হবে, কাকে পরে, কোন ক্ষেত্রে কীভাবে হিসেব করতে হবে ইত্যাদি ক্ষেত্রে তারা ভুল করে ফেলে। পরে যখন মেলাতে পারে না, তখন নিজেদের অজ্ঞতা আল্লাহর ওপর চাপিয়ে দেয়।'

'এত কথা বাদ, তুমি মিলিয়ে দিলেই চলবে; মহাবিজ্ঞের দেখা পেয়েছি।' ব্যঙ্গস্বরে বললেন মহিউদ্দিন ভাই।

'না ভাই। আমি কোনোভাবেই নিজেকে বিজ্ঞ ভাবি না; সাধারণ ছাত্র মাত্র। কুরআনে সম্পত্তি বন্টন, মানে ফারায়েজবিদ্যা এতই কঠিন যে, একজন স্কলার চাইলে শুধু ফারায়েজ নিয়ে সারাজীবন গবেষণা করে কাটিয়ে দিতে পারেন। আপনি যে সমস্যার কথা বলেছেন শুধু এটা না, আরও অনেক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন স্কলাররা। আলহামদুলিল্লাহ, যখন যে সমস্যা এসেছে, তাঁরা তখন সে সমস্যার সমাধানও বের করেছেন ।

'বেহিসাবের হিসেব তো সারা জীবনভর মেলানো যাবে না। তুমি শুধু আমাকে এই সমস্যাটি সমাধান করে দাও, তাতেই চলবে।'

মহিউদ্দিন ভাইয়ের মুখে এবার প্রশান্তির হাসি। সম্ভবত উনি মনে করে নিয়েছেন, এই হিসেব আমি মেলাতে পারব না। যাক, বরাবরের মতোই আল্লাহর ওপর ভরসা করে বলা শুরু করে দিলাম।

'সমাধান করতে হলে আগে আয়াত দেখতে হবে। কুরআনে ফারায়েজ সম্পর্কে কয়েকটি জায়গায় বর্ণনা করা আছে। আপনার সমস্যা সমাধানের জন্য ২টি আয়াত লাগবে, সূরা নিসার ১১ এবং ১২ নম্বর আয়াত।'

মোবাইলটা পকেট থেকে বের করে আল-কুরআন অ্যাপসটি ওপেন করলাম। আর বললাম,

'দেখুন, সূরা নিসার ১১ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, "আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, এক পুত্রের অংশ দুজন কন্যার অংশের সমান। যদি শুধু কন্যা দুয়ের অধিক হয়, তবে তারা পাবে দুই-তৃতীয়াংশ এবং যদি কন্যা একজন থাকে, সে পাবে (পরিত্যক্ত সম্পত্তির) অর্ধেক। যদি মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকে তবে মৃত ব্যক্তির পিতা-মাতা প্রত্যেকে পাবে পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-ষষ্ঠাংশ করে। আর যদি সন্তান না থাকে শুধু পিতা-মাতাই উত্তরাধিকারী হয়, তবে তার মা পাবে সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ। তার যদি ভাই থাকে, তবে তার মা পাবে এক-ষষ্ঠাংশ, (আর এ বণ্টন করা হবে) মৃত ব্যক্তি যে ওসিয়ত করে গেছে, তা কার্যকর করার পর কিংবা ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের পিতা ও পুত্রের মধ্যে কে তোমাদের জন্যে অধিক উপকারী তোমরা জানো না। এটা আল্লাহ কতৃক নির্ধারিত অংশ, নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, রহস্যবিদ।"'

'কিছুই তো বুঝলাম না।' বললেন মহিউদ্দিন ভাই। জাকির ভাই এবং চাচাও আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকলেন। আমি আবারও বলা শুরু করলাম,

'দেখুন, এই আয়াতে উত্তরাধিকারীদের ৬টি অংশের কথা বলা হয়েছে—

১. একজন পুরুষ পাবে দুইজন নারীর সমান।
২. মেয়ে সন্তান দুইজন বা বেশি হলে তারা পাবে সম্পত্তির ২/৩ (দুই-তৃতীয়াংশ)।
৩. মেয়ে একজন হলে সে পাবে ১/২ (অর্ধেক)।
৪. মৃতের সন্তান থাকলে মা-বাবা প্রত্যেকে পাবে ১/৬ (এক-ষষ্ঠাংশ)।
৫. সন্তান না থাকলে মা পাবে ১/৩ (এক-তৃতীয়াংশ)।
৬. মৃতের কয়েকজন ভাই থাকলে মা পাবে ১/৬ (এক-ষষ্ঠাংশ)।

এবার দেখুন ১২ নম্বর আয়াত বলছে— "আর, তোমাদের স্ত্রীগণ যা কিছু রেখে যায় তার অর্ধাংশ তোমাদের, যদি তাদের কোনো সন্তান না থাকে। যদি তাদের সন্তান থাকে, তবে তারা যে ওসিয়ত করে যায় তা কার্যকর করার পর এবং ঋণ পরিশোধের পর পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে তোমাদের জন্য এক-চতুর্থাংশ। যদি তোমাদের কোনো সন্তান না থাকে, তোমরা যা কিছু ছেড়ে যাও, তার এক-চতুর্থাংশ পাবে তোমাদের স্ত্রীগণ। আর যদি তোমাদের সন্তান থাকে, তবে তোমরা যে ওসিয়ত করে যাও তা কার্যকর করার পর এবং ঋণ পরিশোধের পর, তারা তোমাদের রেখে যাওয়া সম্পত্তির এক-অষ্টমাংশ পাবে। যে পুরুষ বা নারীর ত্যাজ্য সম্পত্তি বণ্টন করা হচ্ছে, তার যদি মাতা-পিতা-পুত্র কিংবা স্ত্রী না থাকে এবং এই মৃতের এক ভাই কিংবা এক বোন থাকে, তবে উভয়ের প্রত্যেকে এক-ষষ্ঠাংশ পাবে। আর যদি ততোধিক থাকে, তবে তারা সকলে এক-তৃতীয়াংশের অংশীদার হবে ওসিয়তের পর, যা করা হয় অথবা ঋণ পরিশোধের পর, এমতাবস্থায় যে, অপরের ক্ষতি না করে। এ বিধান আল্লাহর। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সহনশীল। এখানেও ৬ ধরনের অংশের কথা উল্লেখ আছে,

১. সন্তান না থাকলে স্বামী তার স্ত্রীর সম্পত্তির ১/২ (অর্ধাংশ) পাবে।
২. সন্তান থাকলে পাবে ১/৪ (এক-চতুর্থাংশ)।
৩. সন্তান না থাকলে স্ত্রী তার স্বামীর সম্পত্তির পাবে ১/৪ (এক-চতুর্থাংশ)।
৪. সন্তান থাকলে স্ত্রী পাবে ১/৮ (এক-অষ্টমাংশ)।
৫. পিতা-মাতা, পুত্র, স্ত্রী না থাকা অবস্থায় যদি এক ভাই বা এক বোন থাকে, তারা উভয়ের প্রত্যেকে পাবে ১/৬ (এক-ষষ্ঠাংশ)।
৬. আর ভাই বা বোন ততোধিক হলে সবাই মিলে পাবে ১/৩ (এক-তৃতীয়াংশ)।

এবার দেখুন, এ দুটো আয়াতে আলাদা আলাদা শর্তে, ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে সম্পদ বণ্টনের হিসেব দেখানো হয়েছে। কিন্তু আমাদের সমস্যা দাঁড়িয়েছে দুটো আয়াতের আলাদা শর্ত একত্রে হিসেব করতে হচ্ছে।'

'ঠিক বুঝলাম না।'

'ওকে, খেয়াল করুন। পিতা-মাতা এবং দুই কন্যার জন্য ১১ নম্বর আয়াতের ২ নং এবং ৪ নং, আবার স্ত্রীর জন্য ১২ নম্বর আয়াতের ৪ নং। সাধারণ হিসেব অনুযায়ী আমরা সবগুলোকে যোগ করলে হয়,

$$\frac{১}{৬}+\frac{১}{৬}+\frac{২}{৩}+\frac{১}{৮}=\frac{৪+৪+১৬+৩}{২৪}=\frac{২৭}{২৪}$$

ভগ্নাংশ দাঁড়াচ্ছে ২৭/২৪। ফলাফল ১ না হয়ে ১.১২৫ হয়। এটাই তো সমস্যা?'

'জি মশাই, এতক্ষণে বুঝলেন তাহলে। হ্যাঁ, এটাই আসল সমস্যা। এখানেই তোমাদের আল্লা হ-য-ব-র-ল পাকিয়ে ফেলেছে।'

'আগে শুনেন ভাইয়া, আমি বলেছি এই সমস্যা অনেক পুরোনো। সাহাবি আবু বকর (রা.) পর্যন্ত সম্পদ বণ্টনে এই সমস্যার সম্মুখীন কেউ হয়নি। সাহাবি উমর (রা.)-এর সময়ে এক লোক তার দু কন্যা, পিতা-মাতা এবং স্ত্রী রেখে মারা যান। তখন উমর (রা.) এই সমস্যার সমাধান করেন। তিনি যে পদ্ধতিতে সমাধান করেন তা হলো, আউল নীতি বা সম্পত্তির বৃদ্ধি নীতি।'

'কোরানের সমস্যা সাহাবি দিয়ে দিলে তো হবে না। কোরান থেকেই দিতে হবে...'

'আহা ভাইয়া! সমাধান তো কুরআন থেকেই দিচ্ছি। দেখুন ভাইয়া, সবকিছুর খুঁটিনাটি নিয়ে যদি কুরআন বিস্তারিত আলোচনা করত, তাহলে হাজারো পাতার গ্রন্থ হতো। কুরআন সমস্যা সমাধানের পথ দেখিয়ে দিয়েছে। আমাদের শুধু সেখান থেকে সমাধান খুঁজে বের করতে হবে। এটা কুরআনের আরেকটি অলৌকিকত্ব। পৃথিবী যতদিন আছে, নতুন নতুন যত সমস্যা আসবে সব সময়ের জন্যই কুরআন আধুনিক। সব সমাধান কুরআন থেকেই করা যাবে ইনশাআল্লাহ। কিন্তু কুরআন ডিটেইলস বলেনি।'

'ডিটেইলস না বললে তোমরা মানো কীভাবে?'

'ভাইয়া, কুরআনের ডিটেইলস জানতে হবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদিস এবং সাহাবাদের আসার (কার্যাবলি) থেকে। যেমন, কুরআনে সূরা মায়িদার ৩ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, মৃত জীব-জন্তু খাওয়া আমাদের জন্য নিষিদ্ধ। কিন্তু আমরা মৃত মাছ খাই। বলতে পারেন কেন খাই?'

কেউ উত্তর দিলো না বিধায় আমি আবারও বলতে থাকলাম,

'কারণ, আল্লাহ রাসূল ﷺ-এর মাধ্যমে আমাদেরকে মৃত মাছ খাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন।[১৫৬] আবার কুরআনে সালাত সম্পর্কে বলা হয়েছে কিন্তু সালাত দিনে কয় ওয়াক্ত, কোন ওয়াক্ত কত রাকাত, কীভাবে আদায় করব বিস্তারিত নেই। বিস্তারিত শিক্ষা দিয়েছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাধ্যমে। বুঝলেন?'

'জাকির ভাই বললেন, বুঝলাম।'

'হ্যাঁ, এভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাতের পর ওহি আসা বন্ধ হয়ে যায়। যত নতুন সমস্যা দেখা দিয়েছে, তার সমাধান দিয়েছেন সাহাবারা। তারপর তাবেইন, তাবে-তাবেইন এভাবে বর্তমানের মুজতাহিদগণ। কিন্তু সমাধানের মূল উৎস একই, কুরআন এবং হাদিস। উমর (রা.) ওই সমস্যার সমাধান তো কুরআন থেকে করেছেন, সবগুলো অংশীদারির হিসেব তো কুরআন থেকেই নিয়েছেন।'

'সমাধান বলো তো। এত ওহি টহি এসব শুনার টাইম নাই। সমাধান না দিয়ে খালি উলটা-পালটা কেন বকছ?' বললেন মহিউদ্দীন ভাই।

'ওকে, হিসেবটা দেখুন। উমর (রা.) যা করেছেন তা হলো, এই যে ভগ্নাংশ ২৭/২৪। এখানে হর ২৪ হচ্ছে মোট সম্পত্তির ভাগ। আর লব হচ্ছে ২৭, যা মোট পাওনাদারের ভাগ। ভালো করে বুঝেন কিন্তু...'

'বুঝতেছি বল।'

'ভগ্নাংশে কোন অংশের পরিমাণ বেশি?'

'মোট পাওনাদারের।'

'ঠিক। মূল পয়েন্টে আসি। আউল নীতি অনুযায়ী যেহেতু মোট সম্পত্তির পরিমাণ থেকে পাওনাদারের অংশ বেশি, সেহেতু সকল পাওনাদার থেকে সমানভাবে সম্পদ কমিয়ে ভাগ করে দিলে সমস্যা সমাধান হয়ে যায়।'

'কীভাবে?'

'২৭-কে মোট সম্পত্তির ভাগ ধরে কুরআনিক হিসেবে বণ্টন করে দিলেই হয়। শুধু আগের হর ২৪-এর স্থানে এখন হর ২৭ বসিয়ে, বাকি সব ঠিক রেখে হিসেব দেখুন–

---

[১৫৬]. সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং-৩২১৮, হাদিসটি সহিহ।

$$\frac{৪}{২৭} + \frac{৪}{২৭} + \frac{১৬}{২৭} + \frac{৩}{২৭} = \frac{২৭}{২৭} = ১$$

ব্যস হিসেব ১০০% পিওর। কোনো গোলমাল নেই। বুঝলেন এবার?

'না রে, গ্যাঞ্জাম লেগে গেছে মাথায়। ক্লিয়ার না।' বললেন জাকির ভাই।

'আচ্ছা, একটা উদাহরণ দিচ্ছি। মনে করুন, এক লোক ১০০ টাকা রেখে মারা গেলেন। এখন এই ১০০ টাকা ভাগ করে তার পিতা-মাতা, দুই মেয়ে এবং স্ত্রীর মধ্যে বণ্টন করে দিতে হবে। এখন কুরআনিক বণ্টন নীতিতে,

১/৬ অংশ করে পিতা-মাতা দুজনে একত্রে পাবে $\left(১০০ \times \frac{১}{৬}\right) \times ২ = ৩৩.৩৩$ টাকা।

দুই মেয়ে পাবে ২/৩ অংশ অর্থাৎ $১০০ \times \frac{২}{৩} = ৬৬.৬৭$ টাকা

স্ত্রী পাবে ১/৮ অংশ অর্থাৎ $১০০ \times \frac{১}{৮} = ১২.৫$ টাকা।

মোট পাওনা টাকা যোগ করলে হয় ৩৩.৩৩ + ৬৬.৬৭ + ১২.৫ = ১১২.৫ টাকা।'

'সেটা তো আমরাও বুঝি বাপু। কিন্তু মোট সম্পত্তি ১০০, এখানে বণ্টন করে যোগের পর (১১২.৫-১০০) = ১২.৫ বাড়তি এলো কেন? এটাকে কী করবে?'

'সিম্পল ব্যাপার। বাড়তি অংশটুকু হচ্ছে পাওনাদারের। যেহেতু মোট সম্পত্তি থেকে মোট পাওনার অংশ বেশি হয়ে গেছে। সেহেতু মোট পাওনা অংশকে মোট সম্পত্তি দিয়ে ভাগ করে দিতে হবে। তাহলে হয়, ১১২.৫/১০০ = ১.১২৫ এখন আউল নীতি অনুযায়ী সবার সম্পত্তি সমান ভাগে কমে আসবে।

অতএব, পিতা-মাতা একত্রে পাবে, ৩৩.৩৩/১.১২৫ = ২৯.৬২ টাকা।

দুই মেয়ে পাবে, ৬৬.৬৭/১.১২৫ = ৫৯.২৭ টাকা।

স্ত্রী পাবে ১২.৫/১.১২৫ = ১১.১১ টাকা।

এবার যোগ করে দেখুন, ২৯.৬২ + ৫৯.২৭ + ১১.১১ = ১০০ টাকা। ব্যস কেল্লা ফতে। কুরআনের মূলনীতিতেই বণ্টন হলো, পাওনাদারের হক ও পরিপূর্ণ আদায় হলো।[১৫৭] সাপও মরল, লাঠিও ভাঙল না।

---

[১৫৭]. ফারায়েজ শিক্ষা, শায়েখ আবদুল হামিদ ফাইজি মাদানি (হাফিজাহুল্লাহ), তাফসির আহসানুল বায়ান, https://islamqa.info/en/131556, http://mcqadvocateship.blogspot.in/2014/08/?m=1, কৃতজ্ঞতা স্বীকার 'এন্টিডোট'-এর লেখক আশরাফুল আলম ভাইয়ের প্রতি।

'ধ্যাত। যত্তসব আউলা ঝাউলা হিসাবকিতাব। এই ওঠ,' হঠাৎ রেগে গিয়ে বললেন মহিউদ্দিন ভাই।

'রাইতের বেলা আউল-ফাউল খাইলে তো হিসেব আউলা-ঝাউলা হইবই। সারাদিন যুক্তির ঢোল পিটাইস, আর নিজেই যুক্তির ধার ধারিস না।' ক্ষিপ্র চোখে তাকিয়ে থেকে বললেন জমির চাচা।

'ভাইয়া আপনি এরকম রেগে যাচ্ছেন কেন? আমি কি অযৌক্তিক কথা বলছি?'

'শোনো, তুমি যতই লজিক দেখাও না কেন, এসব ধর্মকর্ম আমার মাথায় ঢুকাতে পারবে না। বুঝলে? তোমাদের মতো মোমিনদের প্রতি আমার কোনো ঈমান নেই। এই জাকির, তুই উঠবি? নাকি বসে বসে লজিক শিখবি? '

বলেই হনহন করে বাহিরে চলে গেল মহিউদ্দিন ভাই। পেছন থেকে করিম চাচা হাসতে হাসতে ডাক দিলেন,

'এই যে, চায়ের বিল দিয়া যান...'

এদিকে না ফিরেই মহিউদ্দিন ভাই জোর গলায় বললেন, 'জাকির দিয়ে দেবে।'

আমার অমল স্যারের দুইটি শ্লোকের কথা মনে পড়ে গেল। স্যার অনেক চমৎকার করে শ্লোক বলতে পারতেন। তিনি একদিন বলেছিলেন,

'রামায়ণ পড়ালেন গুরু বসে সারা রাত,
শিষ্য প্রভাতে কহে সীতা কার বাপ?'

আর একটা হলো,

জমিদার নারায়ণ পঞ্চায়েতকে কহিল,
শোনো নরেন, একখান কথা বলে যাই
যেন ঠিক ঠিক রায়টা পাই...
বিচার সালিস যাই কিছু হোক,
তাল গাছটা আমার চাই।

আনমনে বলে ফেললাম, 'নাস্তিকতা কী বিচিত্র, দেখিতেছি তাহার চিত্র।'

কেন শুধু কুরআন মানবো

ফিলোসোফার ভাইয়ের চলে যাওয়ার দিকে আমাদের মতো অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে জমির চাচা বললেন, 'বেয়াদব পোলা, কুরআন-হাদিস বুঝে না খালি ভুল ধরতে চায়। সালাম আদব কিচ্ছু জানে না, কিরম বেয়াদবি কইরা মুরুব্বি মাইনষের সামনে দিয়া হনহন কইরা বাইর হইয়া গেল? এগুলা নাকি উচ্চ শিক্ষিত হুহ...'

নব্য বন্ধুর প্রতি চাচার এমন ক্ষোভ ঝাড়তে দেখে জাকির ভাই ইতস্তত বোধ করলেন। দ্রুত প্রসঙ্গ পরিবর্তনের জন্য প্রশ্ন করলেন,

আচ্ছা, মিরাজ। কুরআন কেন মানতে হবে সেই প্রশ্নটি তো এখনও ক্লিয়ার করতে পারিসনি। খ্রিষ্টানদের বাইবেলের ব্যাপারটি বুঝলাম কিন্তু হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলোকে আল্লাহর বাণী বলে মানিস না কেন?

'আপনাকে আগেই দেখিয়েছি, কুরআন কোনো মানুষের কথা নয়। শতভাগ নিশ্চিত যে, কুরআন মানবজাতির জন্য আল্লাহর প্রেরিত কিতাব। তাহলে মানবেন না কেন? এরপরও আপনি যদি প্রশ্ন করেন হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলো আল্লাহর বাণী কিনা? উত্তরে আমরা বলতে পারি, হতেও পারে। কুরআন বলছে, এমন কোনো জাতি নেই, যাদের কাছে আমি সতর্ককারী পাঠাইনি।[১৫৮] হয়তো আল্লাহ এই ভারতবর্ষে কোনো রাসূল পাঠিয়েছেন এবং তাকে এই গ্রন্থগুলো দিয়েছিলেন।

---

[১৫৮]. সূরা ফাতির-৩৫ : ২৪

কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে, কালের আবর্তনে এই গ্রন্থগুলোও বাইবেলের মতো মানুষের হস্তক্ষেপ থেকে রক্ষা পায়নি। ফলে এই গ্রন্থগুলোতে অনেক কথা বিদ্যমান, যা কখনো পবিত্র ঈশ্বরের হতে পারে না।'

'কী রকম?'

'আচ্ছা, আমরা তাহলে সংক্ষেপে হিন্দুইজম[১৫৯] একটু দেখি। হিন্দু ধর্মের প্রধান গ্রন্থ কী?'

'গীতা?'

'নাহ, অনেক হিন্দুরাও মনে করে তাদের মূল গ্রন্থ গীতা। আসলে তারা সবচেয়ে বেশি পড়ে গীতা। কিন্তু সবচেয়ে প্রধান এবং পুরোনো হচ্ছে বেদ। এ ছাড়া আছে উপনিষদ, পুরাণ ও অন্যান্য। সবগুলো বিভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত।[১৬০] অন্যান্য গ্রন্থের মতো বেদ চার ভাগে বিভক্ত। ঋগ-বেদ, সাম-বেদ, যজুর্বেদ, অথর্ব-বেদ। প্রসিদ্ধ আছে ঋষি ব্যাসদেব এই চারভাগে সংকলন করেন।'

'হু... ম...'

'দেখুন প্রথমত, এই বেদগুলো কবে রচনা করা হয়েছে সেই কাল নিয়েও স্কলারদের মধ্যে অনেক মতভেদ রয়েছে। অধ্যাপক হেরমান জাকোবির মতে, বেদের রচনাকাল খ্রিষ্টপূর্ব ৪০০০ বছর। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপ্যাধ্যায়-এর মতে, খ্রিষ্টপূর্ব ৯০০ থেকে ১০০০ বছর। ম্যাক্সমুলারের মতে, খ্রিষ্টপূর্ব একাদশ বা দ্বাদশ শতাব্দীতে। এভাবে বিভিন্ন স্কলার বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন।[১৬১]

দ্বিতীয়ত, বেদের বিভিন্ন অংশের প্রণেতাও বিভিন্নজন। যেমন :

- ঋগবেদ ২য় মণ্ডলের ৪৩টি সুক্তের মধ্যে ৪০টির প্রণেতা হলেন ঋষি গৃৎসমদ। বাকি তিনটির প্রণেতা ভৃগু ঋষির পুত্র সোমাহুতি।
- ৩য় মণ্ডলের ৬২ সূক্ত, ৬১টি রচনা করেন একই পরিবারের কয়েকজন মিলে। তারা হলেন ঋষি বিশ্বমিত্র, তার পিতা গাথি, পুত্র প্রজাপতি, ঋষভ এবং কচের পুত্র উৎকীল। ২৩ নম্বর সূক্ত রচনা করেন দেবশ্রবা ও দেববাত।

---

[১৫৯]. হিন্দুধর্ম শব্দটি একটি Misnomer. হিন্দু ধর্ম গ্রন্থের কোথাও 'হিন্দু' শব্দটি পাওয়া যায় না। প্রকৃত শব্দ 'বেদান্তবাদী'।

[১৬০]. সংক্ষেপ করার জন্য অন্যান্য গ্রন্থগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়নি।

[১৬১]. https://en.wikipedia.org/wiki/Vedas, Rigveda Samhita by H.H.Willson, Vol.01 introduction. ঋগবেদ সংহিতা, সূচনা, প্রথম খণ্ড, রমেশ চন্দ্র দত্ত (৩য় সংস্করণ),

> ৫ম মণ্ডলের ৮৭টি সূক্ত রচনা করেছেন অত্রি ঋষি ও তার পুত্ররা। কন্যা বিশ্ববারাও একটি সূক্ত রচনা করেছেন।

> ৭ম মণ্ডলের ১০৪টি সূক্ত। ১০৩টি সূক্ত রচনা করেন বিশিষ্ট এতনি, ৪৩ নং রচনা করেন বিশিষ্ট ও তার পুত্ররা মিলে। এরকম আরও বহু আছে। নারীরাও বেদের অনেক সূক্ত রচনা করেছেন।[১৬২]

এভাবে বিভিন্ন সুক্তে মানুষের হস্তক্ষেপে বেদের বর্তমান অবস্থা। তৃতীয়ত, কাল পর্যায়ে বেদের বিভিন্ন শাখাও বাদ পড়ে।'

'তার মানে বাইবেলের মতো সংস্করণ, সংযোজন, বিয়োজন হয়েছে?'

'জি, হিন্দু পণ্ডিতগণই সেটা বলছেন,

- দুর্গাদাস লাহড়ি তাঁর পৃথিবীর ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, ঋগবেদের শাখা ছিল ২১টি, বর্তমানে মাত্র ৫টি।
- সামবেদের শাখা ছিল ১০টি, বর্তমানে ৮টি।
- যজুর্বেদের শাখা ছিল ৮৬ বা ১০০টি, বর্তমানে মাত্র ২টি।
- অথর্ববেদে সূক্ত ছিল ১২৩৩৩টি বর্তমানে মাত্র ৫৮৩৩টি।

প্রাক্তন পুরোহিত সুদর্শন ভট্টাচার্য ঋগবেদ থেকে বাদ পড়া একটা সূক্ত উল্লেখ করেন, ঋগবেদ সংহিতা ১/৩/১৪ সূক্তটি ছিল,

'মিমিহি শ্লোক মাস্যে পর্জন্য ইব ততনঃ
গায় গায় ত্রতক্ থ্যম।'

অর্থাৎ মুখে মুখে শ্লোক রচনা করো, পুণ্য অর্জনের ন্যায় তা বিস্তার করো। স্তুতিবিশিষ্ট গায়ত্রীচ্ছন্দে রচিত (সূক্ত) পাঠ করো। যার ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ঋষীগণ নিজেরা সূক্ত রচনা করতেন। এই সূত্র ঋগবেদ থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।[১৬৩] মনুষ্য রচনা, বাদ পড়া, উধাও হওয়া ছাড়াও এক বেদ থেকে অন্য বেদে হুবহু কপি পেস্ট করা হয়েছে অনেক সূক্ত।'

'মানে এক গ্রন্থ থেকে অন্য গ্রন্থে হুবহু তুলে দেওয়া হয়েছে?'

'পণ্ডিতরা সেটাই তো বলেছেন। যেমন, অথর্ব বেদের সূক্তের রচয়িতা কে বা কারা, এর নির্দিষ্ট কোনো তথ্য কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। কোনো প্রকার পরিবর্তন ছাড়া

---

[১৬২]. ঋগবেদ সংহিতা, খণ্ড-০১, রমেশচন্দ্র দত্ত, ঋগবেদের পরিচয়-শ্রীহিরন্নয় বন্দ্যোপাধ্যায়।
[১৬৩]. ইতিহাস কথা কয়-আবুল হোসেন ভট্টাচার্য (প্রাক্তন পুরোহিত), পৃ. ৪৬

১৪৩টি সূক্ত হুবহু কপি করে এবং বহুসংখ্যক সূক্ত কিছুটা পরিবর্তন করে ঋগবেদ থেকে অথর্ববেদে সংকলন করা হয়। বিখ্যাত সাধনা ঔষধালয়ের অধ্যক্ষ বাবু যোগেষচন্দ্র ঘোষ অথর্ব্বেদের কোনো প্রণেতা নেই বলে উল্লেখ করেছেন।[১৬৪] সুনীতিকুমার চট্টোপ্যাধ্যায় তাঁর *ভারত সংস্কৃতি* গ্রন্থে বলেন, হিন্দুদের কোনো সর্বজনীন ও সর্বজনগ্রাহ্য ধর্মগ্রন্থ নেই। হিন্দুধর্ম ঈশ্বর প্রেরিত কোনো ধর্ম নয়, হিন্দুধর্ম ক্রমাগত পরিবর্তনশীল ইত্যাদি। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেন, "বেদ ভগবান প্রেরিত নয়, বেদ মানুষই লিখেছে।"[১৬৫]

চতুর্থত, এভাবে মনুষ্য বিকৃতির ফলে ধর্মগ্রন্থগুলোতে অগণিত অবৈজ্ঞানিক, অশালীন, অগ্রহণযোগ্য কথা আছে । যেমন, "স্বপ্তাত্বা হরিতো রথে বহন্তি দিব সূর্য।"[১৬৬] অর্থাৎ হরিৎ নামক সপ্ত অশ্ব-রথ সূর্যদেবকে বহন করে।

"উদুতং জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবম্, দ'শে বিশ্বায় সূর্যম।"[১৬৭]

সূর্য দীপ্তিমান এবং সকল প্রাণীদের জানেন, তাঁর অশ্বসমূহ তাঁকে সমস্ত জগৎ দেখানোর জন্য উর্ধ্বে বহন করছে।

"অযুক্ত সপ্ত শুন্ধ্যবঃ সুরো রথস্য নপ্ত্য। তাভির্যাতি স্বযুক্তভিঃ"[১৬৮]

সূর্য রথ বাহক সাতটি অশ্ব যোজিত করলেন। সেই স্বয়ং যুক্ত অশ্বদের দ্বারা তিনি গমন করেন। মানুষ যেরূপ নারীর পশ্চাৎ গমন করে (তন্মোমি ত্রো বরুণো মামহন্তা সদিতিঃ) সূর্য তেমনি দীপ্তিমান উষার পশ্চাতে গমন করে।

আয়ং গৌ : পৃশ্নির ক্রীমদ সদন্নাতরং পুরঃ
পুংর প্রয়ন্ত স্বঃ

এই যে উজ্জ্বল বর্ণধারী বৃষ অর্থাৎ সূর্য, ইনি প্রথমে আপন মাতা পূর্ব দিককে আলিঙ্গন করিয়া পরে আপন পিতা আকাশের দিকে যাচ্ছেন।[১৬৯]

---

[১৬৪]. আমরা কোন পথে?- অধ্যক্ষ বাবু যোগেষচন্দ্র ঘোষ, পৃ.-৩১৮
[১৬৫] বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম রচনাবলি : প্রবন্ধ- দেবতত্ত্ব ও হিন্দু ধর্ম, পৃ. ৭১০ (সাহিত্য সংসদ, কলকাতা ১৪০৫)
[১৬৬]. ঋগবেদ সংহিতা : ১/৫০/৮
[১৬৭]. ঋগবেদ সংহিতা : ১/৫০/১
[১৬৮]. ঋগবেদ সংহিতা : ১/৫০/৯
[১৬৯]. ঋগবেদ সংহিতা : ১০/১৯০/০১

উষা অরুণ অশ্বযুক্ত রথে আগমন করেন এবং আগে আগে গিয়ে সূর্যের গমনের জন্য পথ প্রস্তুত করে দেন।[১৭০] অন্যান্য বেদেও এমন অনেক কথা আছে যেগুলো দেখলেই বোঝা যায় যে, এই কথাগুলো স্রষ্টার কথা হতেই পারে না। বলুন তো, এগুলো কি বৈজ্ঞানিক?

'কীভাবে হতে পারে?'

'আচ্ছা, দেখুন শ্রী-গীতাতে বলা হয়েছে, "নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমতলোহ-ভ্যনুনাদায়ন।"[১৭১] (যুদ্ধের সময় শঙ্খের তুতল শব্দ) আকাশ ও পৃথিবীতে প্রতিধ্বনি হইয়া শত্রুপক্ষের হৃদয় বিদীর্ণ করিল। আকাশ ও পৃথিবীতে কি প্রতিধ্বনি হয়? যথা দিপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে[১৭২] অর্থাৎ বায়ুহীন স্থানে যেমন দ্বীপশিখা কাঁপে না।'

'ওমা! বায়ুহীন স্থানে অক্সিজেন পাবে কই? দ্বীপ জ্বলবেই না, কাঁপবে কীভাবে?'

'সে উত্তর আমার জানা নেই। আরও কিছু দেখুন...

"যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্‌ভাসয়তে খিলম্।
যষ্টচন্দ্রমসি যষ্টচাগ্নৌ তৎ তেজো বিদ্ধি মামকম।"

যে তেজ সূর্যে থাকিয়া সমগ্র জগৎ আলোকিত করে এবং যে তেজ চন্দ্র ও অগ্নিতে আছে সে তেজ আমারই তেজ জানিবে।[১৭৩] এখানে তেজ মানে আলো। সূর্যের নিজের আলো আছে, চন্দ্রেরও আছে?

মজার কথা হলো, বেদে উল্লিখিত বিভিন্ন ঋষিরা গরু খেয়ে পুনরায় সেগুলো জীবিত করে ফেলতে পারতেন। অথচ স্বয়ং ভগবান হয়েও মহাদেব তাঁর মৃত স্ত্রীকে নিয়ে পাগলের মতো ছোটোছুটি করেছেন।[১৭৪] এইভাবে বিভিন্ন অবৈজ্ঞানিক অযৌক্তিক কথা ধর্মগ্রন্থগুলোতে বিদ্যমান আছে।[১৭৫] অনেক অশালীন কথা, ভাষাগত অশালীনতা এতই বেশি যে, আমি বলতে পারব না।'

'তাহলে তোর কথার সত্যতা কী?'

---

[১৭০]. ঋগবেদ সংহিতা : ১/১১৩/১৬
[১৭১]. শ্রী-গীতা, ১/১৯
[১৭২]. শ্রী-গীতা, ৬/১৯
[১৭৩]. শ্রী-গীতা, ১৫/১২
[১৭৪]. পদ্ম পুরাণ, সৃষ্টি খণ্ড ৫ম অ. ৪৪পৃ.
[১৭৫]. মনু সংহিতা ৯ম অধ্যায়ের ৮-৪৩ নং শ্লোক বিশ্বজগৎ সৃষ্টি নিয়ে, ভাষাগত অশালীনতার কারনে উল্লেখ করা সম্ভব হয়নি।

'তুমি পদ্মপুরাণ, অগ্নিপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, লিঙ্গপুরাণ, দেবী ভগবত ইত্যাদি শাস্ত্রগুলো একটু দেখলেই বুঝতে পারবে স্রষ্টার পক্ষে কখনোই এমন অশালীন কথা বলা সম্ভব নয়। এভাবে আমরা দেখলাম, যদিও এই বেদ বা অন্যান্য গ্রন্থসমূহ কোনো সময়ের আল্লাহর পাঠানো কিতাব হলেও হতে পারে। কিন্তু কালের আবর্তনে টিকে থাকতে পারেনি। একমাত্র আল-কুরআনই অক্ষত অবস্থায় আছে। আল্লাহ যেমন পাঠিয়েছেন, ঠিক সেভাবে। অতএব, আমাদেরকে একমাত্র কুরআনই মানতে হবে। ভাইয়া আপনি সব জানার পরেও কুরআনে অবিশ্বাস করবেন?'

'একটু থেমে থেকে তিনি বললেন, গত কয়েকদিনে তুই যে তথ্য দিয়েছিস তাতে মনে হচ্ছে ব্যাপারগুলো নিয়ে আরও ঘাটাঘাটি করা দরকার। কারণ, কুরআনের অনুবাদে ভুল হতে পারে, মূল আরবির সঙ্গে অনুবাদের ভিন্নতা কিংবা একই আরবি শব্দের একাধিক অর্থ হতে পারে! মূল কনটেক্সট অনুযায়ী অর্থ করা এসব ব্যাপারে সত্যিই আমার জানা ছিল না।'

'এখন তো জানলেন। তাহলে সত্যি মেনে নিন। দেখুন আমাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ বলেছেন, আমি তাদেরকে আমার নিদর্শন দেখাব বিশ্বজগতের মধ্যে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে, ফলে ওদের নিকট সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হবে যে এ কুরআন সত্য।[১৭৬] আর আপনি এখনও কি আল্লাহর নিদর্শন দেখতে পাননি? আর কত নিদর্শন লাগবে আপনার?'

'ভালো কথা মনে করেছিস। কোরান তো পরের কথা, তোর স্রষ্টা আল্লাকেই তো প্রমাণ করতে পারলি না। বিজ্ঞান বলছে, আল্লা বলতে কেউ নেই। আর তুই বলছিস আছে। তুই যদি প্রমাণ করতে পারিস যে আল্লাহ আছে, তাহলে আমি কুরআন মেনে নেবো।'

'ঠিক আছে। আপনি যেহেতু প্রমাণ চেয়েছেন তাহলে জাস্ট কয়টা দিন ওয়েট করুন। এক্সাম নিয়ে বেশ ঝামেলায় আছি। পরীক্ষার পর এ ব্যাপারে আলোচনা করব। আর ভাইয়াকেও চিঠি লিখব।'

'লেখ বা না-লেখ সেটা তোর ব্যাপার। তবে আমার চাই বিজ্ঞানভিত্তিক প্রমাণ।'

'এই পর্যন্ত কি বিজ্ঞানভিত্তিক প্রমাণ ছাড়া কোনো কথা বলেছি? বলিনি। ইনশাহআল্লাহ, বিজ্ঞান দিয়েই প্রমাণ করব।'

---

[১৭৬]. সূরা হা-মিম সাজদাহ-৪১ : ৫৩

'জাকির ভাই আমার কানের কাছে এসে বলল, আজকে পকেটের অবস্থা ভালো না। জানিস তো... আমার আরও কিছু ব্যাপার-স্যাপার আছে। তুই একটু বিলটা মিটিয়ে দিস'। বলেই তিনি দোকান থেকে বের হয়ে চলে গেলেন।

জাকির ভাই চলে গেলে জমির চাচা আমার পাশ ঘেঁষে বসলেন। আমার হাত দুটো তার দুহাতের মধ্যে নিয়ে শক্ত করে ধরে বললেন, 'বাবা এই চায়ের দোকানে বইসা জীবনে অনেক বিষয় নিয়া কথা কইছি, অযথাই তর্ক-বিতর্ক করছি, মানুষের গিবত করছি। কিন্তু দুই দিন ধইরা তোমার কথা হুইনা মনে হইতাছে, আমার চায়ের দোকানে বসা সার্থক হইল। দুআ করি, তোমার মতো সন্তান প্রত্যেক ঘরে ঘরে পয়দা হোক। আমার..., আমার বুকটা ভইরা গেছে বাজান!' বলতে বলতে চাচার গলা ধরে এলো।

আমি চাচার হাত দুটো আমার হাতের মুঠোয় নিয়ে বললাম, 'চাচা আল্লাহ আমাদেরকে শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে বানিয়েছেন, তাঁর পথে মানুষকে ডাকার জন্য। অন্যের কাছে সত্য কথাগুলো যুক্তি সহকারে তুলে ধরার জন্য। আমি শুধু আমার দায়িত্বটা পালন করেছি মাত্র। চাচা, সারাদিন এভাবে চায়ের দোকানে, বাজারে অহেতুক সময় নষ্ট করাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিরুৎসাহিত করেছেন। কেননা, এতে করে মানুষ অলস হয়ে পড়ে এবং গিবতের চর্চা বেড়ে যায়। চাচা, গিবত এবং পরনিন্দার ব্যাপারে আল্লাহ খুবই কড়া কথা বলেছেন। তিনি গিবতকে মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সঙ্গে তুলনা করেছেন। তাই যেসব স্থানে গিবত চর্চা হয়, সেসব স্থান থেকে আমাদের দূরে থাকা উচিত। এতেই রয়েছে কল্যাণ। আর আল্লাহর দেওয়া বিধান মেনে চলার মধ্যেই রয়েছে শান্তি। চাচা, জোহরের আজান হয়েছে, আমার এখন যাওয়া দরকার।'

টেবিলটা ছেড়ে, পকেট থেকে মানিব্যাগটা বের করে, করিম চাচার নিকট পৌঁছলাম। আমার মানিব্যাগের ওপর করিমচাচা আলতো করে হাত ঠেকিয়ে বললেন, 'জীবনে তো অনেক ব্যবসা করলাম বাবা, আজকে না হয় তোমাগোর দুইখান চা-ই খাওয়াইলাম। আমার দোকানে এতদিন ধইরা খালি ফালতু আলাপ আর গিবতের আড্ডাই হইছে। তুমিই প্রথম কোরান কিতাব নিয়া এত ভালো ভালো কথা কইছো। আল্লাহর দ্বীনের লাইগা আমারে এইটুকুন খেদমত কইরবার দাও বাবা।'

আমি কিছুক্ষণের জন্য নিজের ভাষা হারিয়ে ফেললাম। তাঁর চোখের সরল চাহনি আমাকে কতটা আপ্লুত আর অনুপ্রাণিত করল তা তোমাকে কখনই বোঝাতে পারব না। যারা আল্লাহর জন্য কাজ করে, আল্লাহই তার জন্য এ নিঃস্বার্থ

ভালোবাসাগুলো মজুদ করে রাখেন। চোখের পানিটা সংবরণ করে করিম চাচাকে বললাম, 'দুআ করবেন চাচা, আমাদের আড্ডাগুলোও যেন হয় মহান আল্লাহর জন্য, তার দ্বীনের জন্য।'

ভাইয়া, যদি তুমি সত্যিকারের মুক্তমনা হয়ে থাক, তাহলে একজন মানুষ বিশ্বাসী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। আর যদি মুক্তমনার ছদ্মবরণে ইসলাম বিদ্বেষী হও তাহলে আমার কিছুই বলার নেই। কারণ, তাতে তোমার সামনে যতই প্রমাণ উপস্থিত করি না কেন, তুমি বিশ্বাসী হতে পারবে না। তোমরা মুক্তমনা হতে গিয়ে এতটাই একপেশে হয়ে গেছ যে, ভিন্ন চিন্তাকে এতটুকু সহ্য করতে পার না।

ইসলামকে সাম্প্রদায়িক তকমা দিতে গিয়ে, নিজেরাই এত বেশি উগ্র ও সাম্প্রদায়িক মানসিকতা লালন করো যে, তোমাদেরকে 'সাম্প্রদায়িক স্কলার' বললে ভুল হবে না। আত্মস্বীকৃত নাস্তিক দাবি করার পরেও তোমরা যখন মূর্তির শরীরে রং ছিটিয়ে হলি উৎসবে মেতে ওঠো, স্বরস্বতির সাজানো মূর্তির পায়ে যখন বিদ্যা ভিক্ষা চাও, তখন তোমাদের নাস্তিকতার অঙ্গে কালিমা লেপন হয় না। কিন্তু মুসলিমরা যখন তাদের দ্বীন পালন করে তখন তোমরা শুধু তাকে কটাক্ষই করো না; বরং নোংরা ভাষায় আক্রমণ করে নিজেদের মুক্তমনার পরিচয় দাও। তোমরা যে কতটা সংকীর্ণমনা হয়ে গেছ তা নিজেরাই জানো না।

ভাইয়া, তোমার কাছে চিঠি লিখতে গিয়ে মনে হচ্ছে একটা পাণ্ডুলিপি লিখে ফেললাম। আমি জানি, লিখতে আমার যতটুকু না কষ্ট হয়েছে তার চাইতে বেশি কষ্ট হয়েছে তোমার পড়তে। চিঠিটা লিখতে গিয়ে আমার কয়েক রাত সময় লেগেছে। সময় একটু বেশি লাগলেও মনের জমানো কথাগুলো তোমাকে বলতে পেরে একটু হালকা লাগছে। অবশ্য এটা সম্ভব হয়েছে আমাদের পিচ্চি ফারিহার কারণে। তুমি তো জানো, সে আগে থেকেই একটু বেশি দুষ্ট। গত চার বছরে সে এ ব্যাপারে আরও দক্ষ হয়েছে। পরীক্ষা চলে এসেছে তবুও তার মধ্যে কোনো সিরিয়াসনেস নেই। গত কয়েকদিন ধরে আমি তাকে পড়াচ্ছিলাম আর ফাঁকে ফাঁকে এই চিঠি লিখছিলাম। এই ফাঁকে সে আমাকে ফাঁকি দিয়ে দেখো কী লিখেছে,

এই বুঝি এলো ঘুম, এই ওঠি আঁতকে!
সময় নেই খুঁজে নেওয়ার ভেঙে পড়া দাঁতকে,
চারদিকে হিম শীত, শীত নেই মাথাতে
আতঙ্ক বাপ্রে... গেঁথে আছে বুকে যে!
ধুর ছাই, কী চাই? ধুর মাথা মুণ্ড-
এক্সাম! এক্সাম! লঙ্কা কাণ্ড।

অনেক রাত হয়েছে। আম্মু যদি বুঝতে পারে এখনও জেগে আছি, তাহলে আরেক লঙ্কা কাণ্ড শুরু হবে। তাই এখানেই শেষ করতে হলো। আল্লাহ হাফেজ।

তোমার আদরের ছোটো ভাই

মিরাজ

গির্জা থেকে বাসায় ফিরছে জেনেফা। দূর থেকেই লক্ষ করল, অ্যান্টনি খুব দ্রুত বাসা থেকে বের হয়ে একটা রিক্সায় উঠে পড়ল। এত রাতে তড়িঘড়ি করে কোথায় যাচ্ছে সে? নিশ্চয়ই কিছু একটা হয়েছে। ডাকতে চাইলে দূরত্বটা বেশি হওয়ায় ডাকতেও পারছে না। বাধ্য হয়ে ফোন দিলো জেনেফা।

'হ্যাঁ জেনেফা বলো।'

'কী হলো... এই রাতে কোথায় যাচ্ছ? জ্বর কমেছে তোমার...? কোনো সমস্যা...?' একটানা প্রশ্নগুলো করে গেল জেনেফা।

'না, কিছু হয়নি। আর জ্বরও কমে গেছে।'

'কিন্তু এত রাতে যাচ্ছটা কোথায়?'

'কেন? রাতের বেলা কোথাও যাওয়া তোমার শাস্ত্রে নিষেধ আছে নাকি? তুমি বাসায় যাও। আমি ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে আসছি।' বলেই অ্যান্টনি লাইন কেটে দিলো।

জেনেফা বুঝতে পারল এন্টনি কোনো কারণে ক্ষিপ্ত। বাসায় প্রবেশ করেই খাটের ওপর কিছু কাগজপত্র অগোছালো অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখল। কৌতূহলবশত হাতে তুলে নিতেই বুঝতে পারল এটা একটা চিঠি। পাশেই পড়ে থাকা খামটির দিকে চোখ পড়তেই নিশ্চিত হলো, এই চিঠি মিরাজ লিখেছে। বেশ অবাক হয়ে নামটির দিকে তাকিয়ে থাকল জেনেফা। কারণ, বিয়ের পর অ্যান্টনি পরিবারের কারও সঙ্গে তার কখনোই যোগাযোগ হয়নি। বেশ আগ্রহ সহকারে চিঠির পাতাগুলো উলটাতে থাকল।

এ এক অদ্ভুত চিঠি। দুই-তিন পৃষ্ঠা পড়তেই ঘটনা বুঝতে পারল জেনেফা। আনমনে বলে উঠল, তাহলে এই চিঠিই অ্যান্টনির মেজাজ খারাপের কারণ। লম্পঝম্প টোটাল ভূমিকম্প টাইপের কয়েকটা ফ্রেন্ড আছে অ্যান্টনির।

সম্ভবত তাদেরকে নিয়ে এখন টেবিলছাড়া আলোচনায় বসবে। কীভাবে এই যুক্তিগুলোর পালটা জবাব দেওয়া যায়, সেই চিন্তায় নিমগ্ন হবে। তারপর বাসায় এসেই যত্তসব অখাদ্য কুখাদ্য গিলে ঝড় তুলবে কি-বোর্ডে। কিছু লাইকার ফলোয়ার আছে, তারা এই কি-বোর্ডের তৈরি অখাদ্য গিলে তৃপ্তির ঢেকুর তুলে শুয়ে পড়বে। আর যেদিন মুসলমানদের নবি মুহাম্মদ বা কোরান আলোচনায় থাকবে, সেদিন তো কোনো কথাই নেই। পুরো সময় অবধি চলবে অকথ্য গালিগালাজ। এটা অবশ্য ঠিক, নবি মুহাম্মদ বাইবেল থেকে কপি করে নিজের নামে চালিয়ে দিয়েছে। আর অন্ধ মুসলমানরা সেটা মাথায় তুলে রেখেছে।

সে যাহোক, অ্যান্টনি দুই ঘণ্টার কথা বললেও কখন আসবে তার কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। এখন বাজে রাত নয়টা। অন্তত সাড়ে বারোটার আগে বাসায় আসবে না এটা নিশ্চিত। ততক্ষণে চিঠিটা পড়ে শেষ করা যাবে। সোফায় শরীরটা এলিয়ে দিয়ে কফিতে চুমুক দিতে দিতে চিঠিতে মনোনিবেশ করল জেনেফা। কী অদ্ভুত ধরনের এক চিঠি। যতই পড়ছে ততই আশ্চর্য হচ্ছে। চিঠির প্রত্যেকটি বিষয় তাকে শিহরিত করছে। বিশেষ করে মহিউদ্দিনের করা অভিযোগ, কোরান বাইবেল থেকে কপি করার বিষয়ে মিরাজের দেওয়া উত্তর, যতই পড়ছে ততই কপালে ভাঁজ পড়তে শুরু হলো জেনেফার।

কলিং বেলের শব্দ শুনে দরজা খুলে দিলো জেনেফা। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল দশটা পঞ্চান্ন। আজব ব্যাপার, দুঘণ্টার আগেই ফিরে এলো অ্যান্টনি। দুহাতে বড়ো বড়ো দুইটা বইয়ের বান্ডিল। কথা না বলেই হনহন করে বেডরুমে ঢুকে পড়ল। খাটের ওপর বান্ডিলটা রেখে বাঁধন খুলতেই সবগুলো বই এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। আজব কাণ্ড! মুসলমানদের কোরান, ডিকশনারি-অ্যারাবিক টু ইংলিশ, অ্যারাবিক টু বেঙ্গলি সঙ্গে অনেকগুলো বিজ্ঞানের বই। বেশিরভাগ বই-ই বিদেশি লেখকদের। এর মধ্যে কিছু আছে অনুবাদ করা। জেনেফা B.B.A-এর স্টুডেন্ট হওয়ায় কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না।

কৌতূহলবশত বইগুলো মনোযোগ সহকারে উলটে-পালটে দেখতে লাগল জেনেফা। অ্যান্টনির দিকে খেয়াল করতেই দেখল, সে কম্পিউটারে উবু হয়ে আছে। কঠিন ব্যস্ত মনে হলো। নতুন কেইস পেয়েছে; মিরাজের চিঠি। প্রতিউত্তর না দেওয়া পর্যন্ত আর শান্তিতে ঘুমাতে পারবে না লোকটি। সেলফ থেকে বাইবেলটা নিয়ে মুছতে মুছতে চেয়ারে বসল জেনেফা। মিরাজের দেওয়া রেফারেন্সগুলো চেক করবে এক্ষুনি। বাইবেল হাতে নিয়ে ভাবছে, মিরাজের কথাগুলো যদি সত্য হয় তাহলে কীসের ওপর ভিত্তি করে টিকে আছে খ্রিষ্টান ধর্ম? সত্যিই কি এই বাইবেল যিশুর প্রচার করা বাণী নয়?

বিবর্তনবাদের ব্যবচ্ছেদ

অনবরত বেজেই চলছে ফোনটা। রিসিভ করা দরকার বুঝেও কেন জানি রিসিভ করতে পারছে না মিরাজ। কেউ যেন হাত দুটোকে বিছানার সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে রেখেছে। কিন্তু মোবাইলের বিরক্তিকর শব্দে শেষ পর্যন্ত বিছানার বাঁধন ছিঁড়ে রিসিভ করতে বাধ্য হলো সে। ফজরের নামাজের পর তার ঘুমানোর অভ্যাস নেই। কিন্তু গতকাল শেষ রাত পর্যন্ত বিবর্তনবাদ নিয়ে স্টাডি করায় আজকে তার ব্যতিক্রম হয়েছে। ফোনটা কানে ধরতেই অপর প্রান্ত থেকে কণ্ঠ শোনা গেল জাকির ভাইয়ের।

'কি রে, তোর সমস্যা কী? এতক্ষণ ধরে ফোন দিচ্ছি রিসিভ করছিস না কেন? কোনো খবর রাখিস তুই?'

'কেন ভাইয়া, কী হয়েছে?'

'কী হয়েছে মানে? তোর ভাইয়া, মানে অ্যান্টনি, তোর নতুন ভাবিকে নিয়ে গ্রামে আসছে। স্টেশনে তাদের রিসিভ করতে যেতে হবে।'

'মানে? ভাইয়া গ্রামে!'

'মানে, মানে বন্ধ কর। তাড়াতাড়ি স্টেশনে চলে আয়। আমিও আসতেছি।' বলেই ফোনটা কেটে দিলো জাকির।

নিজের কানকে যেন বিশ্বাসই করতে পারছে না মিরাজ। স্মৃতির কোণে অখণ্ড কিছু চিত্র ভাসতে থাকল।

সেই যে চার বছর আগে চলে যাওয়া, তারপর এদিকে আর একটিবারের জন্য আসেনি। প্রথম দিকে যোগাযোগ করলেও পরে সেটিও বন্ধ হয়ে যায়। চিঠি দিয়েছি আজ প্রায় পাঁচ মাস হলো, কোনো উত্তর আসেনি। আজ এরকম হঠাৎ করে সবাইকে অবাক করে দেবে, চিন্তাও করিনি। ভাইয়ার প্রতি আম্মু প্রচণ্ড অসন্তুষ্ট। কারণ, একটা না দুটো। প্রথমত, ভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার পর পরই মাথায় দানা বেধেছিল নাস্তিকতা। নিজে তো নাস্তিক হয়েছে আবার এলাকাতেও প্রচার করেছে। সেই সুবাদে জাকির ভাই তাঁর যোগ্য শিষ্য। দ্বিতীয়ত, আম্মুর খুব ইচ্ছা ছিল ধার্মিক একটা মেয়ে দেখে ভাইয়াকে বিয়ে করাবে। যাতে করে সেই মেয়ে ভাইয়াকে পরিবর্তন করতে পারে। কিন্তু ভাইয়া সব আশার মুখে গুড়েবালি ছিটিয়ে জুনিয়র এক খ্রিষ্টান মেয়েকে বিয়ে করেছে। আজ সেই ভাবিকে নিয়ে ভাইয়া বাড়িতে ফিরছে। না জানি আব্বু-আম্মু বিষয়টা কীভাবে নেবে। সে যাই হোক, এখন তাড়াতাড়ি স্টেশনের দিকে যেতে হবে।

বাজার পার হওয়ার সময়েই পেছন থেকে ডাক দিলেন জমির চাচা,

‘এই যে মিরাজ, বহুদিন হয়ে গেল তোমারে দেখি না। তয় বাবা, জাকিররে যা দিছ, এরপর থাইকা সে আর বেশি ফাল পাড়ে না। বাজারে আসলেও চুপ কইরা বইয়া থাকে। হা হা হা...’ চাচার সেই বিখ্যাত পান খাওয়া মুখের হাসি।

‘নানান ব্যস্ততায় এদিকে আসা হয় না। আমার পরীক্ষা, ছোটো বোনের পরীক্ষা, আম্মুর অসুখ, সব মিলিয়ে খুব ব্যস্ত সময় পার করলাম।’

‘তা এখন যাও কই?’

‘ভাইয়া ভাবিসহ গ্রামে আসছে। তাকে নিয়ে আসতে স্টেশনে যাচ্ছি।’

‘তোমার ভাই? ওই নাস্তিকটা? শুনলাম সে নাকি বিধর্মীরে বিয়া করছে?’

চাচার কথায় অনেকটা ইতস্তত বোধ করল মিরাজ। কোনো কিছু না বলেই চাচার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে স্টেশনের পথ ধরল। মনে মনে ভাবল, জাকির ভাই আর তার মহান গুরু অ্যান্টনি আজকে Evolution theory আর Big-Bang নিয়ে আমাকে জিলাপির প্যাঁচ দেবে। সেসব বিষয়ে উত্তর দিতে পারব না এমন না, কিন্তু এই মুহূর্তে প্রস্তুতি খুব একটা ভালো না। দেখা যাক কী হয়... তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহ। তবে এটা ভেবে ভালো লাগছে যে, অনেকদিন পর আবার তাদের দাওয়াত দেওয়ার একটা চান্স পেলাম, আলহামদুলিল্লাহ।

যদিও এগুলো ক্রিটিক্যাল টপিক, কিন্তু সাহস হারালে চলবে না। আল্লাহ বলেন, 'যখন তোমাদের দুটো দল সাহস হারাবার উপক্রম হলো, অথচ আল্লাহ তাদের সাহায্যকারী ছিলেন, আর মুমিনদের উচিত আল্লাহর ওপরই ভরসা করা।'[১৭৭] 'ইনশাআল্লাহ, তিনিই সাহায্য করবেন।'

মনে মনে কুরআনে বর্ণিত মূসা (আ.)-এর করা দুআটি পড়ল মিরাজ, 'হে আমার পালনকর্তা, আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিন এবং আমার কাজ সহজ করে দিন এবং আমার জিহ্বা থেকে জড়তা দূর করে দিন। যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে এবং আমার পরিবারবর্গের মধ্য থেকে আমার একজন সাহায্যকারী করে দিন।'[১৭৮]

ভাইয়া-ভাবি এখন বাড়িতে। আম্মু খ্রিষ্টান পুত্রবধূকে দেখে প্রথম প্রথম ক্ষোভ প্রকাশ করলেও ছেলে ফিরে আসার আনন্দে তা কিছুটা চাপা পড়ে গেল। আব্বু রাগ করে সেই যে সকালেই কোথায় যেন চলে গেছেন আর ফেরেননি। খুব সম্ভবত ভাইয়ার খ্রিষ্টান মেয়ে বিয়ে করার ব্যাপারটি কেউই মেনে নিতে পারেনি। ফারিহাও ভাইয়ার আসার খবর শুনে যতটা নাচানাচি শুরু করেছিল ভাবিকে দেখার পর তা খানিকটা কমে গেছে। তবে সেটা তার চঞ্চলতার ওপর প্রভাব ফেলতে পারেনি।

নাস্তা করতে করতে বিভিন্ন খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে। যেহেতু বড়ো বড়ো দায়িত্ব অসম বণ্টন ছোটোদের মধ্যে চলে আসে সেহেতু নাস্তা আনা নেওয়ার দায়িত্ব ন্যস্ত হলো ছোটো ভাই আবরারের ওপর। ভাবির কাছ থেকে ডেইরিমিল্ক পাওয়ার পর ফারিহা তাকে অনেকটা আপন করে নিয়েছে। হাতের চকলেটগুলো নিয়ে ভাইয়ার কোল ঘেঁষে বসে আছে। তবে তার নড়াচড়ার ধরন দেখে মনে হচ্ছে যেকোনো সময় সে ভাইয়ার উদ্দেশে প্রশ্নের অ্যাটম বোম ছুঁড়ে দেবে।

'ভাইয়া তুমি এতদিন পর এলে, আমার জন্য চকলেট আননি কেন?' ফারিহার প্রশ্ন?

'কে বলেছে আনিনি? তোমার হাতে যে চকলেটগুলো আছে, সেগুলো তো আমিই এনেছি।' ভাইয়ার উত্তর।

'দেখো ভাইয়া, তুমি কিন্তু একদম মিথ্যা বলবে না। আমি কিন্তু মিথ্যা বলা পছন্দ করি না। চকলেট তো ভাবি দিয়েছে।'

---

১৭৭. সূরা আলে ইমরান-৩ : ১২২
১৭৮. সূরা ত-হা-২০ : ২৯

তার পাকা পাকা কথা শুনে আমরা সবাই মিটমিট করে হাসতে লাগলাম। ফারিহার একটা বৈশিষ্ট্য হলো কথা বলার সময় সে মুখের ভঙ্গিটা এমন করবে, তাতে যে কেউ হাসতে বাধ্য।

এবার জাকির ভাই ফারিহাকে প্রশ্ন করল, আচ্ছা ফারিহা, মিথ্যা বললে কী হয়?'

'কি হয় তুমি জানো না? মিরাজ ভাইয়া বলেছে, মিথ্যা বলা মহাপাপ। যারা মিথ্যা বলে আল্লাহ তাদের কঠিন শাস্তি দেয়।' বলেই সে ভাইয়ার কাছ থেকে দৌড়ে বাহিরে চলে গেল। বুঝলাম, বাহিরে আম্মু পিঠা তৈরিতে তার নজর গেছে। এরপর আম্মুকে কিছু প্রশ্ন করে আবার রুমে চলে আসবে।

জাকির ভাইয়ের মুচকি মুচকি হাসি পরিবেশের মোড় ঘুরে যাওয়ার আগাম বার্তা। তা ছাড়া আজকে তো গুরুজি স্বশরীরে উপস্থিত। তর সইতে না পেরে অনতিবিলম্বে প্রশ্ন শুরু হলো...

'মিরাজ, তুই তো দেখছি ছোটো বাচ্চাদেরও ভালোই ব্রেন ওয়াশ করতে পারিস! আচ্ছা, আমার কাছে মনে হয় ফারিহা বয়সের তুলনায় বেশি পাকনা কিন্তু বাচ্চামো স্বভাব যায়নি, কি বলিস?'

'আল্লাহ তো সবাইকে এক রকম করে সৃষ্টি করেন না ভাইয়া। চেয়ার টেনে বসতে বসতে বলল আবরার।'

'ওহ, ভালো কথা। আচ্ছা মিরাজ, তুই তো তোর আল্লার প্রমাণ এখনও দিতে পারিসনি।'

জাকির ভাই এই প্রশ্ন করবে এটা আমি আগে থেকেই জানতাম। কারণ, অনেকদিন পর তিনি তার গুরুকে কাছে পেয়েছেন। কিন্তু এত দ্রুতই আমাকে আক্রমণ করবে তা বুঝাতে পারিনি। বললাম,

'ভাইয়া, আল্লাহ আবার অপ্রমাণিত হলো কবে?'

'ইভ্যুলুশন আর বিগব্যাং থিওরি কি আর তোদের স্রষ্টার অস্তিত্ব রেখেছে? বিজ্ঞানের কালজয়ী এই দুই থিওরির আবিষ্কারে মানুষ অন্ধকার থেকে মুক্তি পেয়ে আলোতে এসেছে। বিজ্ঞানীরা এখন ক্লিয়ার যে, স্রষ্টা বলে কেউ ছিল না, নেই। ধর্মান্ধ মানুষেরা নিজেদের স্বার্থে বিশ্বাস এনেছে নিজেদের কাল্পনিক স্রষ্টায়...'

'বোগাস, টোটাল বোগাস।' জাকির ভাইয়ের কথার মাঝখানে বেশ রাগত স্বরে কথা বলে উঠল ভাইয়া।

আমরা সবাই ভূত দেখার মতো চমকে উঠে ভাইয়ার দিকে তাকিয়ে আছি। কয়েক সেকেন্ড কারও মুখ থেকে কোনো কথা বের হলো না। ব্যাপার কি! ভাইয়া যে কথাগুলো এই জাকির ভাইসহ অন্যদেরকে গুলে খাইয়েছে, যে কথাগুলোর সঙ্গে আমরা একমত না হওয়ায় প্রচণ্ড রেগে গিয়ে বাড়ি থেকে চলে গেছে, সেই কথাগুলোকেই টোটালি বোগাস বলে উড়িয়ে দিলো? সারা ঘরে পিনপতন নীরবতা। পাশের রুম থেকে আম্মু আর ভাবিও কথা বলা বন্ধ করে দিয়ে এই দিকে কান পেতে আছে। জাকির ভাইয়ের মুখ যেন কিছুক্ষণের জন্য প্যারালাইসড আকার ধারণ করল। খানিক পর নীরবতা ভাঙলেন জাকির ভাই।

'বলছিস কি অ্যান্টনি! তুই ঠিক আছিস তো?'

'আমার নাম জানা নেই তোর?'

অস্পষ্ট গলায় জাকির ভাই উত্তর দিলেন 'হুম।'

'কী?' প্রশ্ন করল ভাইয়া।

'সরফরাজ।' জাকির ভাইয়ের উত্তর।

'এখন থেকে এই নামেই আমাকে ডাকবি। দ্বিতীবার যেন না বলতে হয়।' ভাইয়ার কড়া গলার আদেশ।

'তোর তো কিছুই বুঝতেছি না। আর বোগাস বললি কেন? তুই কি বলতে চাস স্রষ্টা সত্যিই আছে?'

'হুম, বিজ্ঞানও তাই বলছে।'

আমি আশ্চর্য হয়ে ভাইয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। জাকির ভাইয়ের উত্তেজিত কণ্ঠ শুনে আবার তার দিকে ফিরলাম।

'তার মানে বিবর্তনবাদের থিওরি ভুল? বিগব্যাং ভুল?' কপালে কয়েকটি ভাঁজ ফেলে আশ্চর্য ভঙ্গিতে প্রশ্ন করলেন জাকির ভাই।

'এত উত্তেজিত হওয়ার দরকার নেই, নরমালি বল তো বিবর্তনবাদ বলতে তুই কী বুঝিস?'

'কেন? সেটা কি তুই জানিস না? আমার কাছ থেকে জানতে চাচ্ছিস কেন?' বেশ ঝাঁজ মেশানো কণ্ঠে জাকির ভাই তার ক্ষোভ ঝাড়লেন। মনে হলো ভাইয়ার পরিবর্তনের জন্য জোড়ালো একটা প্রতিশোধ নিলেন।

'আহ হা, এত চটে যাচ্ছিস কেন? বললেই তো হয়ে যায়।' ভাইয়া জবাব দিলেন।

'আদি অবস্থায় জড়বস্তু থেকে প্রাণের উৎপত্তি, প্রাকৃতিক নির্বাচন, টিকে থাকার লড়াই।' মনে হলো অনেকটা বাধ্য হয়েই উত্তর দিলেন জাকির ভাই।

'ভাইয়া, বিবর্তনবাদ থিওরি কী?' প্রশ্ন করল আবরার।

'আহা! নাইনে পড়ছিস এখনও বিবর্তনবাদের থিওরি জানিস না? আচ্ছা, বুঝিসনি যখন পরে বুঝিস এখন চুপ করে থাক। ঝামেলা করিস না।' কিছুটা নরম গলায় বললেন জাকির ভাই।

আবরার খুবই মার্জিত এবং স্বল্পভাষী স্বভাবের একটি ছেলে। পড়াশুনায় খুবই মনোযোগি হলেও একটু চাপা স্বভাবের। অধিকাংশ সময়ই একাকী থাকতে পছন্দ করে। সেও ভাইয়ার মতো মেধাবী। ছোটোবেলায় ভাইয়ার সঙ্গে আমার যেমন দহরম-মহরম সম্পর্ক ছিল, তার সঙ্গে অবশ্য সেরকমটা গড়ে ওঠেনি। পরবর্তীকালে ভাইয়ার অনুপস্থিতির কারণে তার ওপর বড়ো ভাই সুলভ প্রভাব খাটাতে গিয়ে সম্পর্কটা আরও ফরমাল হয়ে গেছে। কিন্তু ফারিহার ক্ষেত্রে হয়েছে তার উলটোটা। কেউ তার ওপর প্রভাব খাটাতে পারে না। সেই সবার ওপর বীর প্রতাপে প্রভাব খাটিয়ে নিজের ক্ষমতা পাকাপোক্ত করে। এক নিমিষেই সবার মনের কোঠরে একটা জায়গা দখল করে নেয়। এক্ষেত্রে কারও অনুমতিরও প্রয়োজন হয় না। ওজর আবদারে সে সবার ছোটো হলেও ভাবসাব আর ক্ষমতায় সবার বড়ো ।

ভাইয়া চায়ের কাপ রেখে শান্ত গলায় বলল, 'শোন জাকির, যে অখাদ্যের বিষক্রিয়া আমাদের মস্তিষ্কের নার্ভগুলোকে অকেজো করে দিচ্ছে, সেই অখাদ্য গলাধঃকরণ করার আগেই ওদের চিনে রাখা দরকার। যেন হজমের আগেই উগরে দিতে পারি।'

ভাইয়া আবরারকে উদ্দেশ্য করে বলা শুরু করল, 'শোন, আল্লাহর সৃষ্টিজগৎ নিয়ে তো মানুষের চিন্তা ভাবনার শেষ নেই। কারণ, পুরো বিষয়টা জটিল রহস্যে ঘেরা। সৃষ্টি নিয়েই সৃষ্টি হলো অনেক রূপকথার গল্প, নানা জনের নানা মত। সে যাই হোক, সামান্য কিছুসংখ্যক লোক আছে, যারা এই সৃষ্টির

স্রষ্টাকে মানতে চায় না। স্রষ্টাকে অস্বীকার করার জন্য তারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন তত্ত্ব উপস্থাপন করে। এক তত্ত্ব ভুল প্রমাণ হলে আরেক তত্ত্ব নিয়ে আসে। তেমনি এক তত্ত্ব নিয়ে হাজির হয়, বিজ্ঞানী ল্যামার্ক। তাঁর নামানুসারে এই তত্ত্বকে ল্যামার্কিজম বলা হয়। তাঁর ধারণার মূল ভিত্তি ছিল Inheritance of acquired Characteristics। সে বলেছিল, প্রতিটি জীবের মধ্যে একটি জীবনীশক্তি কাজ করে। ফলে বংশ পরম্পরায় জীবের গাঠনিক পরিবর্তন হয়। উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি জিরাফের ঘাড় লম্বা কেন এই বিষয়টি তুলে ধরেন।'

'সেটা কী রকম?'

'সেটা এরকম, ধর জিরাফের ঘাড় প্রাথমিক অবস্থায় এমন লম্বা ছিল না। কিন্তু তাদের কোনো এক প্রজাতি ঘাস খাওয়া আর পছন্দ করল না। তখন তারা ঘাঁড় উঁচু করে গাছের পাতা খেতে চেষ্টা করল। এভাবেই জিরাফের ঘাঁড় লম্বা হতে শুরু করল। সেই প্রজাতির ওই বংশ থেকে পরের বংশে, তার পরের বংশ থেকে পরের বংশে, এভাবে জিরাফের ঘাঁড় বর্তমান অবস্থায় পৌছেছে। একে বলে, ইনহেরিটেন্স অব অ্যাকুয়ার্ড অব ক্যারেক্টারিস্টিক্স।

'বুঝতে পারছি না ভাইয়া।' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল, আবরার।

'আচ্ছা, তোকে বোঝানোর জন্য একটা উদাহরণ দিচ্ছি। ধর, আমাদের দাদা পান খেতে খেতে শক্ত সুপারির সঙ্গে লড়াইয়ে টিকতে না পেরে, তাঁর চিবুকের দাঁত পড়ে গেল। এবার সুপারি কুঁচিকাটা করে দেওয়ার জন্য দাদাকে আরেকটি বিয়ে দেওয়া হলো। সৌভাগ্যক্রমে নতুন দাদির কোলে আমাদের একজন চাচা আসলো। তাহলে ল্যামার্কিজম অনুযায়ী নতুন চাচারও চিবুকের দাঁত থাকবে না। মানে তার চিবুকে জীবনে কখনো আর দাঁতই ওঠবে না। এভাবে বংশ পরম্পরায় গিয়ে দেখা যাবে, চাচার বংশের লোকদের আর দাঁতই উঠে না। এটাই হলো বেসিক্যালি ইনহেরিটেন্স অব অ্যাকুয়ার্ড অব ক্যারেক্টারিস্টিক্স। বিজ্ঞানী ল্যামার্ক তাঁর এই তত্ত্ব প্রথম ১৮০৯ সালে *ফিলোসফি অব জুলজি* নামক বইয়ে তুলে ধরেন।

এই উদাহরণে রুমের মধ্যে আমরা সবাই হাসাহাসি করলেও জাকির ভাই দোটানার মধ্যে পড়ে গেল। অনেকটা জোর করে হাসার ভঙ্গি করলেন মাত্র। সম্ভবত গুরুর এহেন আজব পরিবর্তন এখনও হজম করতে পারেনি।

'এই তত্ত্ব কি ঠিক?'

'আরে না। পরবর্তীকালে বিজ্ঞানী মেন্ডেলের চিপায় পড়ে বেচারা ল্যামার্কের ত্রাহী ত্রাহী অবস্থা। মেন্ডেলকে চিনতে পারছিস তো?'

'হুম পেরেছি। গ্রেগর জোহান মেন্ডেল কাজ করেছিলেন জেনেটিক্স মানে বংশগতি বিদ্যা নিয়ে। এই মেন্ডেলের হাত ধরেই আমাদের আধুনিক বংশগতি বিদ্যা উঠে আসা; বায়োলজি বইয়ে আছে।'

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছিস। তিনি প্রমাণ করে দিয়েছেন, কখনোই একটি প্রজাতি (Species) পরিবর্তিত হয়ে অন্য প্রজাতিতে পরিণত হয়ে যায় না।[১৭৯] অর্থাৎ ধরে নিলাম, জিরাফ গাছের পাতা খেতে চেষ্টা করতে করতে ঘাড় কিছুটা লম্বা হয়ে গেছে, কিন্তু তা পরের বংশের ঘাড়ে প্রভাব ফেলতে পারবে না।'

'ইন্টারেস্টিং ব্যাপার তো! তারপর?' প্রশ্ন করল আবরার।

'এর পরেই এলেন চার্লস ডারউইন। তিনি বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের বৈচিত্র্য লক্ষ করেন। বিশেষ করে সমুদ্র ভ্রমণের সময় তিনি গ্যালাপ্যাগোস দ্বীপপুঞ্জে ফিঞ্চ নামক পাখির বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে বিভিন্ন আকৃতির ঠোঁট দেখেন এবং লন্ডনে দেখেন যে, ব্রিডারসরা সংকরায়নের মাধ্যমে নতুন ধরনের গরুর উৎপাদন করছে।[১৮০] এখানে থেকে তিনি সিদ্ধান্ত নেন, পৃথিবীর সকল প্রজাতি একটি কমন পূর্বপুরুষ থেকে এসেছে।'

বলেই ভাইয়া তার স্মার্টফোনটি বের করে আমাদের ছবি দেখালেন। দেখানোর পর আবারও বলতে শুরু করলেন,
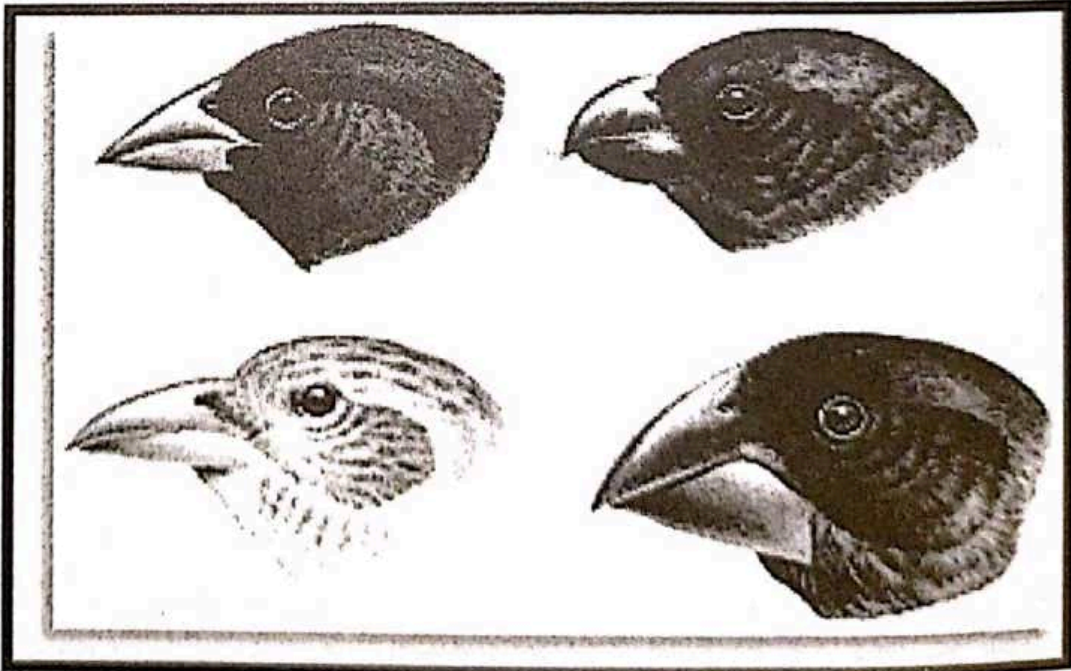
Finch পাখির ঠোঁটের বিভিন্ন ভ্যারিয়েশন

---

[১৭৯]. A New World View, 1980, p. 6

[১৮০]: On the origin of species, Charles Darwin, 11th edition, p, 15-17

'এইসব অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে তিনি *দ্যা অরিজিন অব স্পিসিস* নামে একটি বই প্রকাশ করেন। তাঁর মতে, প্রকৃতিতে বিভিন্ন সময়ে ন্যাচারাল সিলেকশনের মাধ্যমে আলাদা আলাদা প্রজাতির উৎপত্তি হয়। এসব প্রজাতির মধ্যে থেকে যেসব প্রজাতি প্রকৃতিতে টিকে থাকার লড়াইয়ে সমর্থ হবে, তারা টিকে থাকবে, অন্যরা বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

'বিবর্তনবাদের মূল বিষয়টা কী?' প্রশ্ন করল আবরার।

'মূল বিষয় হলো, যেহেতু সব প্রজাতিই এসেছে একটি কমন পূর্বপুরুষ থেকে, সেহেতু পেছনের দিকে যেতে যেতে দেখা যায়, প্রথম প্রাণ সৃষ্টি হয়েছে নিষ্প্রাণ জড় পদার্থ থেকে। অর্থাৎ আদি পরিবেশে অলৌকিকভাবে আপনাআপনি আদি প্রাণ উৎপন্ন হয়েছে। তারপর ধীরে ধীরে সময়ের ব্যবধানে এই আদিপ্রাণ থেকে বহুকোষী প্রাণী, তারপর মাছ, কুমির, ব্যাঙ, সাপ, পাখি, হাতি, বানর, সিম্পাঞ্জি, মানুষসহ সম্পূর্ণ প্রাণীজগৎ বিবর্তনের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্য এই ধারণা ডারউইনের একার না। তাঁর আগেও গ্রিসের বিজ্ঞানী থেলিসসহ অনেকে এই ধারণা করত।'

'তুই কি বলতে চাস এটা ভুল?' নীরবতা ভেঙে বললেন জাকির ভাই।

'আগে আমি তোকে এর কয়েকটা ফাঁক ফোঁকর দেখাব, তারপর তুই বলবি এটা ভুল না ঠিক।'

আবরার বলল, 'কী বলো ভাইয়া? এটা কী করে সম্ভব? নিষ্প্রাণ থেকে অটোম্যাটিক্যালি প্রাণের সৃষ্টি! এ ব্যাপারে কোনো প্রমাণ দেখাতে পেরেছে বিজ্ঞানীরা?'

'পেরেছে, কিন্তু পোড়া কপাল। তাদের এই প্রমাণ বিজ্ঞানের সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। সেই সময় মনে করা হতো গম থেকে ইঁদুরের উৎপত্তি হয়। এক্সপেরিমেন্টের জন্য একটি কম্বলের ওপর কিছু গম ছড়িয়ে দিয়ে তারা দেখতে পেলেন যে, গম থেকে ছোটো ছোটো কীট সৃষ্টি হয়েছে। এতেই মহাশয়েরা বেজায় খুশি।'

'ঘটনা কি সত্যি?'

'আরে নাহ, পরবর্তী সময়ে অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখা গেল যে, গমগুলোর সঙ্গে আগেই লার্ভা লেগেছিল। সেই লার্ভা থেকেই কীটের উৎপত্তি।[১৮১] প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত উৎপত্তিকে বলা হয়, স্পনটেনিয়াস জেনারেশন। কিন্তু এই থিওরি প্রদানের পাঁচ বছর পর বিজ্ঞানী লুই পাস্তুর প্রমাণ করে দিলেন, কোনো কিছুই আপনাআপনি সংগঠিত হতে পারে না। অর্থাৎ নিষ্প্রাণ হতে কোনোভাবেই নিজে নিজে প্রাণের উৎপত্তি সম্ভব নয়।'[১৮২]

'ওহ! তারপর?'

'এরপর এলেন আধুনিক এক্সপেরিমেন্ট নিয়ে বিজ্ঞানী মিলার। যাকে আমাদের হুমায়ূন আহমেদ স্যারও "ছাগল টাইপ" বিজ্ঞানী উপাধি দিয়েছেন।'

'হুমায়ূন আহমেদ...মিলার... ছাগল টাইপ বিজ্ঞানী? ওহ! মনে পড়েছে, *দিঘীর জলে কার ছায়া গো* বইতে পড়েছি। হা হা হা... । তারপর আর নতুন কিছু আনেনি?'

'আবার জিগায়, স্পনটেনিয়াস জেনারেশন থিওরি ভুল প্রমাণ হওয়ার পর বিবর্তনবাদীরা নতুন থিওরি নিয়ে আসল যে, বিবর্তনের সঙ্গে প্রাণের উৎপত্তির কোনো সম্পর্ক নেই। একে বলে অ্যাবায়োজেনিসিস।'

'এটা কী করে সম্ভব!'

'কোনোভাবেই সম্ভব নয়। হাঁটে হাঁড়ি ভাঙ্গা কাজ করে বসেছে বিবর্তনবাদী বিজ্ঞানী ওপারিন। তিনি স্বীকার করেন, কোষের উৎস এখনও পর্যন্ত বিবর্তনবাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তিনি বলেন, দুর্ভাগ্যজনকভাবে কোষের উৎপত্তিগত বিষয়টি পুরো বিবর্তনবাদের জন্য এখনও একটি প্রশ্ন হয়ে আছে।[১৮৩] মূলত ডারউইনের সময় বিজ্ঞান কোষ সম্পর্কে তেমন কিছুই জানতে পারেনি। কারণ, অতি সরল অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে কোষের জটিল গঠনের তেমন কিছুই দেখা যায় না।

ফলে, সেই সময়ে এই ধারণা করা সহজ ছিল যে, স্বয়ংক্রিয়ভাবে কোষ উৎপন্ন হতে পারে। কিন্তু পরবর্তীকালে কোষের গাঠনিক জটিলতা আবিষ্কারের ফলে

---

১৮১. Plants: An Introduction to Modern Biology, 1967, p. 585

১৮২. Plants: An Introduction to Modern Biology, p. 585

১৮৩. Origin of life, Alexander oparin, p, 196)

বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত যে, কোষের গঠন এতটাই জটিল যা কখনো নিজে নিজে সৃষ্টি হতে পারে না। আচ্ছা বল তো, প্রাণীকোষের রাসায়নিক গঠনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান কী?'
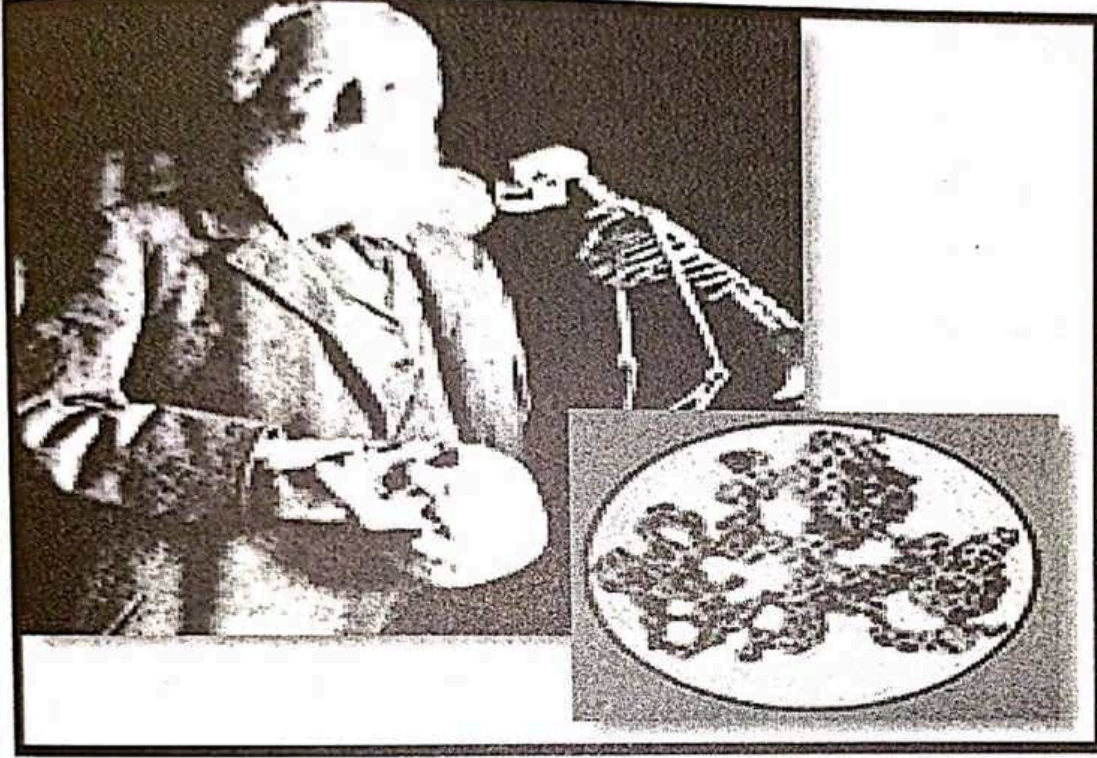
ডারউইনের সময় কোষের অণুবীক্ষণিক চিত্র

'প্রোটিন।' নিমিষেই উত্তর দিলো আবরার।

'ঠিক বলেছিস। প্রোটিন ছাড়া প্রাণ সম্ভব নয়। মানুষের জিনোমে প্রায় ২০০০০০ প্রোটিন কোডিং থাকে।[১৮৪] সবার আলাদা আলাদা ধরনের কাজ আছে। সম্পূর্ণ কোষ তো বহু দূর, একটি প্রোটিন অনু বাই চান্সে অর্থাৎ আপনাআপনি তৈরি হওয়ার সম্ভবনা কতটুকু? প্রথমে বল, একটি প্রোটিন অনু কয়টি মৌলিক উপাদান দিয়ে গঠিত?'

'পাঁচটি।'

'কী? কী?'

'হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন আর অ্যামাইনো এসিড।' ঝড়ের বেগে বলে ফেলল আবরার।

[১৮৪]. http://sandwalk.blogspot.com/2015/12/how-many-different-proteins-are-made-in.html

'হুম, এই উপাদানগুলো প্রোটিনের মধ্যে সুনির্দিষ্ট এবং সুশৃঙ্খলভাবে সজ্জিত থাকে। একটি উপাদান কম কিংবা অন্য একটি উপাদান বেশি হয়ে গেলে প্রোটিন অনু তৈরি হবে না। আচ্ছা এবার বল তো, প্রকৃতিতে মৌলিক উপাদান কয়টি?'

'বর্তমান পর্যায় সারণী অনুযায়ী ৯২টি।' বলল আবরার।

'ওকে। ৯২টি মৌলিক উপাদান থেকে বাই চান্সে অর্থাৎ আপনাআপনি পাঁচটি উপাদান একত্রিত হয়ে সুশৃঙ্খলভাবে সজ্জিত হয়ে একটি প্রোটিন অনু তৈরি হওয়ার সম্ভবনা কত?'

'তা তো জানি না?' এবার সোজা-সাপ্টা উত্তর দিলো আবরার। এটা অবশ্য তার একটা ভালো দিক। কেননা আর যাই হোক, সবাই স্পষ্টভাষী হতে পারে না।

'1 in 10 to the power 160 ($1/10^{160}$)। আচ্ছা, তুই কি সম্ভাব্যতার থিওরি বুঝিস?' জিজ্ঞেস করল ভাইয়া।

'কিছুটা বুঝি, আমাদেরকে প্যাটার্নের অধ্যায় করানোর সময় স্যার বলেছিলেন। এক্ষেত্রে পয়সা আর লুডু দিয়ে উদাহরণ দিয়েছিলেন।' বলল আবরার।

'তাহলে বল, 1 in 10 to the power 160 ($1/10^{160}$) মানে কত?'

'উ...ম... 1 in 10 to the power 2 ($1/10^{2}$) মানে হচ্ছে ১ এর পর ২টা শূন্য। অর্থাৎ ১০০ দিয়ে ১-কে ভাগ দিলে হবে ০.০১। $1/10^{3}$ অর্থাৎ ১ এর পরে ৩ টা শূন্য অর্থাৎ ১০০০ হাজার দিয়ে ১-কে ভাগ। তাহলে $1/10^{160}$ হবে ১-এর পরে ১৬০টি শূন্য বসালে যে সংখ্যা হয়, তা দিয়ে ১-কে ভাগ দিলে যা হয় সেটাই। ওরে বাবা... এই হিসেব আমি মুখে কেমনে করব! একটু ওয়েট, ক্যালকুলেটর নিয়ে আসি।'

'আরে দাঁড়া দাঁড়া। আগে বল, ক্যালকুলেটরের পাওয়ার কত?'

'570MS...'

'কোনো লাভ নেই। ওটাতে এই হিসেব করার ক্যাপাসিটি নেই। Math error আসবে। ব্যাপারটা বুঝিস কিনা সেটা দেখলাম। রেজাল্ট আসবে ০.০০০০০... সামথিং। অর্থাৎ শূন্যই। এটা তো সিম্পল হিসেব।'

আবরারের ক্যালকুলেটর আনার প্রচেষ্টা শুরুতেই থেমে গেল। আমি বারবার আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। ভাইয়া যদি আজকে এই অবস্থানে না থাকতেন, তাহলে আমি হয়তো এত সহজ করে বলতে পারতাম না।

এবার জাকির ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে ভাইয়া বলল, 'মানবদেহের প্রোটিনগুলোর মধ্যে শুধু অ্যামিনো এসিডের কম্বিনেশনের হিসেব দেখিয়েছেন Doug Axe। চিনিস তাকে?'

জাকির ভাই বললেন, 'হুম চিনি। তিনি একজন পি.এইচ.ডি হোল্ডার, ক্যালটেকের ক্যামব্রিজে কাজ করেছেন ১৪ বছর ধরে।'

'গুড, তুই দেখি ভালোই খোঁজ-খবর রেখেছিস। তার হিসেব অনুযায়ী, অ্যামিনো এসিডের কম্বিনেশন হতে পারে 10^{77}টি, যার মধ্যে মাত্র একটি হবে কার্যকর। তার মানে এখানেও সম্ভবনা $(1/10^{77})$[১৮৫] অর্থাৎ শূন্য।'

'এত জটিল?' চোখ দুটো বড়ো বড়ো করে প্রশ্ন করল আবরার।

আমি আবরারের প্রশ্ন করার গতি দেখে অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। চাপা স্বভাবের ছেলেটির হঠাৎ উপর্যপুরি প্রশ্ন করার ধরন দেখে অবাক না হয়ে পারলাম না।

'জটিল না কুটিল, তা আপাতত তোর গবেষণার জন্য রেখে দে। এখন আরও কিছু শোন। সম্ভব হলে নোট করেও রাখতে পারিস।'

আবরার দৌড়ে গিয়ে খাতা কলমের সঙ্গে তার সখের 570MS ক্যালকুলেটর নিয়ে এলো। ভাইয়া আবার শুরু করল,

'বাই চান্সে ২০০০ এনজাইম দিয়ে প্রোটিন অনু তৈরি হয়ে প্রাণ তৈরি হওয়ার হিসেব করেছিলেন দুজন বিজ্ঞানী। তাদের নাম চন্দ্র ভিক্রমসিং এবং ফ্রেড হোয়েল। যারা নিজেরাও ছিলেন বিবর্তনবাদী। তাদের হিসেব অনুযায়ি এই সম্ভবনা 1 in 10 to the power 40,0000 $(1/10^{40000})$ ।[১৮৬] অর্থাৎ ১ এর পরে চল্লিশ হাজার শূন্য বসালে যে সংখ্যা হবে, তা দিয়ে ১-কে ভাগ করলে যা পাওয়া যাবে ততটুকু।'

'দ্যাট মিনস, স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রাণ তৈরি হওয়ার কোনো সম্ভবনাই নেই?' ভ্রু কুঁচকিয়ে বললেন জাকির ভাই। কিছুক্ষণের জন্য তার ঠোঁট দুটো পরস্পর থেকে ইঞ্চিখানেক দূরুত্ব বজায় রাখল।

---

[১৮৫]. https://pandasthumb.org/archives/2007/01/92-second-st-fa.html

[১৮৬]. Evolution from Space, Fred Hoyle and *Chandra Wickramasinghe, 1981, p. 28)

'সেটা কি আর বলার অপেক্ষা রাখে? এই হিসেব প্রকাশ করার পর তারা বলেন, প্রাণহীন উপাদান থেকে রাসায়নিকভাবে প্রাণসম্পন্ন কোষ উৎপত্তি হওয়ায় বিশ্বাস করা, আর একটি পুরোনো লোহা লক্কড়ের স্তুপের মধ্যে দিয়ে একটা টর্নেডো যাওয়ার সময় স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি বোয়িং-৭৪৭ বিমান তৈরি হয়ে যাওয়ায় বিশ্বাস করা, একই কথা।'[১৮৭]

'হা হা হা..., খুবই চমৎকার একটা উদাহরণ দিয়েছ তো। এই কথার পরে আর কি কিছু বলার থাকে?' হাসতে হাসতে বলল আবরার।

'আরে পাগল, বর্তমানে বিজ্ঞান আরও এগিয়েছে। বর্তমান হিসেব অনুযায়ী, একটি প্রোটিন অনুতে ১৫০টি অ্যামিনো এসিড থাকে। এদিক থেকে হিসেব করলে আপনাআপনি প্রাণ তৈরি হওয়ার সম্ভবনা দাঁড়ায় 1 in 10 to the power 3,28,000 ($1/10^{328000}$)। অর্থাৎ ১-এর পরে ৩ লাখ ২৮ হাজার শূন্য বসালে সংখ্যাটা কত হবে কল্পনা করতে পারবি? এই সংখ্যাটা দিয়ে ১-কে ভাগ করলে আর কোনো সম্ভবনা অবশিষ্ট থাকে?'

'না...' বললেন জাকির ভাই। গুরুজির কথা এত সহজভাবে মেনে নিয়ে মুখে মুখে "না" বলতে দেখে আমার খুব হাসি পেলেও তা চেপে রেখে ভাইয়ার কথায় মনোযোগ দিলাম।

'যেখানে একটা অনু সম্ভব না, সেখানে হাজার রকমের অনু মিলে জটিল জটিল কোষ, অঙ্গ তৈরি হওয়া কীভাবে সম্ভব? অর্থাৎ মাইটোকন্ড্রিয়া, সাইটোপ্লাজম, গলগি বডি, নিউক্লিয়াস ইত্যাদি বাই চান্সে সৃষ্টি হওয়া সম্ভব না। শুধু একটি কোষের সবকিছুর আলাদা আলাদা হিসেব করলে সম্ভাব্যতার মহাভারত তৈরি হয়ে যাবে। তাহলে একজন মানুষের শরীরে যে ৩৭ ট্রিলিয়নের বেশি কোষ আছে, [১৮৮] এ ছাড়াও সব অর্গানিক সিস্টেম, মলিকুল সিস্টেম, অ্যানাটমি অ্যান্ড ফিজিক্যাল সিস্টেম এবং সমগ্র জীবজগৎ আপনাআপনি সৃষ্টি হওয়া কি সম্ভব? এটা পাগলের প্রলাপ বই কিছু না।'

'৩৭ ট্রিলিয়ন মানে কত ভাইয়া?' প্রশ্ন করল আবরার।

'এই সিম্পল বিষয়টা জানা না থাকাটা খুবই দুঃখজনক। আর তোর ক্ষেত্রে তো এটা একেবারেই বেমানান।'

---

[১৮৭]. Science magazine, Fred Hoyle, November 12, 1981, p. 105

[১৮৮]. https://www.smithsonianmag.com/smart-news/there-are-372-trillion-cells-in-your-body-4941473/

ভাইয়ার কথা শুনে আবরার একটু লজ্জা পেয়ে মাথা নিচু করে থাকল। ভাইয়া বুঝতে পেরে গলায় কিছুটা ঠাট্টার ভাব এনে বলল,

'কিরে, নতুন বরের মতো মাথা নিচু করে আছিস কেন? আরে লজ্জার কী আছে? শোন, না জানাটা দোষের কিছু নয়; বরং না জেনেও জানার ভান করে থাকাটাই দোষের। আর তুই তো জানতে চেয়েছিস, তাই না? এটা লজ্জার না, আনন্দের বিষয়। কারণ, একমাত্র মূর্খরাই সব প্রশ্নের উত্তর জানে। আর জ্ঞানীরা জানার চেষ্টা করে।'

আবরার এবার মাথা তুলে ভাইয়ার দিকে তাকাল। ভাইয়া তার দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ রেখেই বলা শুরু করল, '১০ লাখে হয় ১ মিলিয়ন। ১০০০ মিলিয়নে হয় ১ বিলিয়ন। ১০০০ বিলিয়নে ১ ট্রিলিয়ন। এই ১ ট্রিলিয়নকে ৩৭ দিয়ে গুণ করলে হবে ৩৭ ট্রিলিয়ন (৩৭০০০০০০০০০০০০০), ৩৭-এর পরে ১২টি শূন্য বসাবি।'

'একজন মানুষের শরীরে এ...ত্ত...গু...লো কোষ? আল্লাহু আকবার।' কিছুক্ষণের জন্য মুখটা হা হয়ে থাকল আবরারের। তার সঙ্গে বড়ো বড়ো দুটো চোখ মুখের অবয়বে আশ্চর্যের ছাপগুলো সুনিপুনভাবে এঁকে দিলো।

এতক্ষণে সবার সামনে বাটি ভর্তি পিঠা চলে এসেছে। চালের আটার সঙ্গে ময়দা, সুজি আর ডিম দিয়ে ছোটো ছোটো করে তেলে ভেজে এই পিঠা বানানো হয়। সঙ্গে যদি তাল কিংবা কাঠালের রস দেওয়া হয় তাহলে তো কোনো কথাই নেই। তার ঘ্রাণ আর বৈচিত্র্যময় স্বাধে পিঠার নামটাও মনে করার দরকার পড়ে না। এখন যেহেতু তাল কিংবা কাঠালের সময় না, তাই পিঠায় ঘ্রাণের পরিমাণ অতটা নেই। ফলে মুখের সামনে পিঠার বাটি থাকার পরেও আবরারের নাকে এর ঘ্রাণ পৌঁছাল না। এটা তার হা করা মুখ আর চোখ দেখেই স্পষ্ট হয়ে গেল। ফারিহা এই সুযোগটা কোনোভাবেই হাতছাড়া করল না। খপ করে একটা গরম পিঠা আবরারের মুখে ঢুকিয়ে দিলো। সবেমাত্র গরম তেল থেকে মুক্তি পাওয়া গরম পিঠা তার জিহ্বার মধ্যে নিজের ঝাঁজ বসিয়ে দিলো। আচমকা লাফিয়ে উঠল আবরাব। এতক্ষণে হয়তো জিহ্বাটাও পুড়ে গেছে তার। পরক্ষণে সে ফারিহাকে শায়েস্তা করার জন্য উদ্ধত হলে আশেপাশে তাকে কোথাও পাওয়া গেল না। নিমিষেই সে উধাও হয়ে গেছে। আমি চিৎকার করে বললাম,

'তাড়াতাড়ি পানি খা।'

কিন্তু হাতের কাছে পানি পাওয়া গেল না। এমন অস্থিরতার মধ্যে কোমল ভেজা হাতের আলতো ছোঁয়ায় পেছন ফিরে তাকাল আবরার। এক গ্লাস পানি হাতে মলিন মুখে দাঁড়িয়ে আছে ফারিহা। তার ভেজা হাত আর জামার নিম্নাংশ ভেজা দেখে কারও বোঝার বাকি থাকল না যে, সে নিজেই চাপা কল চেপে পানি এনেছে। পানিটুকু পান করে আবরার খুব দ্বিধার মধ্যে পড়ে গেল। জিহ্বা পোড়ানোর জন্য তাকে শাস্তি দেবে নাকি পানি আনার জন্য পুরস্কার দেবে! এমন চিন্তার দোলাচলের মধ্যে অবশেষে আবরারের কোল ঘেষে বসে পড়ল ফারিহা।

পিঠা খাওয়ার ধুম চলছে। নতুন করে আরও কিছু গরম পিঠা বাটিতে চলে এসেছে। মুখের ভেতর একটা গরম পিঠা পুরে দিয়ে চোয়াল দুটো একটা বিশেষ ভঙ্গিতে ঘুড়িয়ে পেচিয়ে গরম ভাপগুলো বের করে দেওয়ার চেষ্টা করছে ভাইয়া। কোনো রকমে গিলে আবরারকে উদ্দেশ্য করে বলা শুরু করল,

'DNA কি জানিস?'

'হুম, জানি।' মাথা নেড়ে উত্তর দিলো আবরার।

জাকির ভাই বললেন, 'ডারউইনিজমের মতো সহজ বিষয়ই জানে না, সে আবার DNA সম্পর্কে জানে!

কথাগুলো বেশ তাচ্ছিল্যের স্বরেই বললেন জাকির ভাই। আমার কাছে মনে হলো জাকির ভাই তার গুরুকে কিছু না বলতে পেরে সেই ঝাল মেটালেন আবরারের ওপর। ব্যাপারটা ভাইয়া এবং আমি টের পেলেও কিছু না বলে চুপ থাকলাম। কিন্তু অপমানে আবরারের বদনখানি রক্তিম বর্ণ ধারণ করল।

'আবরার, তুই বলে যা। আমি শুনছি।'

জাকির ভাইয়ের দিকে না তাকিয়ে, DNA সম্পর্কে বলতে শুরু করল আবরার,

'পৃথিবীর যেকোনো কোষ, হোক প্রোক্যারিওটিক অথবা ইউক্যারিওটিক, সব ধরনের কোষে প্রধান চারটি অংশ থাকবেই। সাইটোপ্লাজমিক মেমব্রেন, সাইটোপ্লাজম, রাইবোজম, ক্রোমোজোমের জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল।

এই জেনেটিক ম্যাটেরিয়ালের মূল হলো DNA। যাকে বংশগতির ধারক বাহক বলা হয়। অর্থাৎ আমরা যেমন বলে থাকি, আমার চোখ দেখতে আমার মায়ের মতো, অথবা ভাইয়ার চুলগুলো ঠিক আব্বুর মতো ইত্যাদি। এই বৈশিষ্ট্যগুলো- আমরা পেয়ে থাকি DNA-এর মাধ্যমে।

DNA ডাবল হেলিক্স দেখতে অনেকটা পেঁচানো সিঁড়ির মতো। এর গঠনে পাঁচ কার্বন যুক্ত শর্করা, নাইট্রোজেন গঠিত বেস আর অজৈব ফসফেট থাকে। এই তিনটিকে একত্রে বলে নিউক্লিওটাইড। নাইট্রোজেন বেস চারটি, এডিনিন (A), গুয়ানিন (G), সাইটোসিন (C), থায়ামিন (T)।'

'ওকে ওকে, বুঝতে পেরেছি, তুই ভালো জানিস। এখন, জাস্ট বন্ধনটা বল।' আবরারকে থামিয়ে দিয়ে বললেন ভাইয়া।

'বন্ধন আবার ভিন্ন। A, T-এর সঙ্গে যুক্ত থাকে ২টি হাইড্রজেন বন্ডে। G, C-এর সঙ্গে যুক্ত থাকে ৩টি হাইড্রোজেন বন্ডে। এই DNA কিন্তু একটি হাইড্রোজেন অনুর থেকে কয়েক কোটি গুণ বড়ো । DNA আবার একাই সব কাজ করতে পারে না। তার সহায়ক হিসেবে থাকে RNA। RNA আবার তিন প্রকার। তাদের মধ্যে মেসেঞ্জার আর.এন.এ, RNA-কে প্রাণীর জেনেটিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মেসেজ করে। আবার...'

'হয়েছে, আর বলা লাগবে না। এটা সেমিনার না। পরীক্ষার খাতায় লিখতে পারলেই চলবে।' আবরারকে থামিয়ে দিয়ে হাসি মাখা মুখে বললেন ভাইয়া।

'আপনার বন্ধুকে জিজ্ঞেস করেন উনাকে আরও কিছু শেখাতে হবে কিনা।' অপমানের প্রতিশোধটা বেশ গরম গরম ভাবেই নিল আবরার।

'হা হা হা... আর শেখাতে হবে না, ও এমনিতেই এসব জানে। তোকে ক্ষ্যাপানোর জন্য এভাবে বলেছে। আচ্ছা, কাজের কথা শোনো। এই DNA আবিষ্কারের পর আমাদের নিউ ডারউইনিস্টরা তো একেবারে মাঠে মারা। ওই যে বললি চারটি A, G, C, T বেস, এই বেসগুলি কাজ করে কোডিং সিস্টেমে।'

'কোডিং সিস্টেমে মানে? বুঝলাম না।' অনেক্ষণ পর জাকির ভাইয়ের প্রশ্ন।

ভাইয়া তার বন্ধুর দিকে তাকিয়ে বলা শুরু করল,

'ফিজিক্সের স্টুডেন্ট হয়ে কোডিং সিস্টেম গিলে বসে আছিস? যেমন, আমরা কি-বোর্ডে A,B,C...Z বর্ণমালা দিয়ে টাইপ করি। কিন্তু কম্পিউটার এই বর্ণমালাগুলো চেনে না। সে চেনে শুধু 0, 1। এই দুটো সংখ্যা দিয়ে বাইনারি কোডিং সিস্টেমে কম্পিউটার তার সব কাজ করে।'

'তাই? তার মানে কম্পিউটারের আলাদা একটি ভাষা আছে?' জানতে চাইল আবরার।

'একদম তাই। তুই যখন ইন্টারে পড়বি তখন বাইনারি সম্পর্কে ভালোভাবে জানতে পারবি। ধর, আমরা কি-বোর্ডে টাইপ করলাম A, বাট কম্পিউটার তো A চেনে না। তাহলে ডিসপ্লেতে কীভাবে A শো করল?

ব্যাপারটা হলো, মনে কর A-কে কম্পিউটারে 01 দিয়ে কোডিং করা আছে। সুতরাং, আমরা যখন A টাইপ করলাম তখন কম্পিউটার ইনপুট পেল 01। পরে প্রসেস করে আউটপুট হিসেবে মনিটরে A শো করে। ঠিক একই রকম কোডিং সিস্টেমেই প্রাণীকোষে কাজ করে DNA। সকল তথ্য, ইনপুট, প্রোসেসিং, আউটপুট সব। সকল ইনফরমেশন A-T-G-C...... এরকম কোডিং করে সাজানো থাকে।'
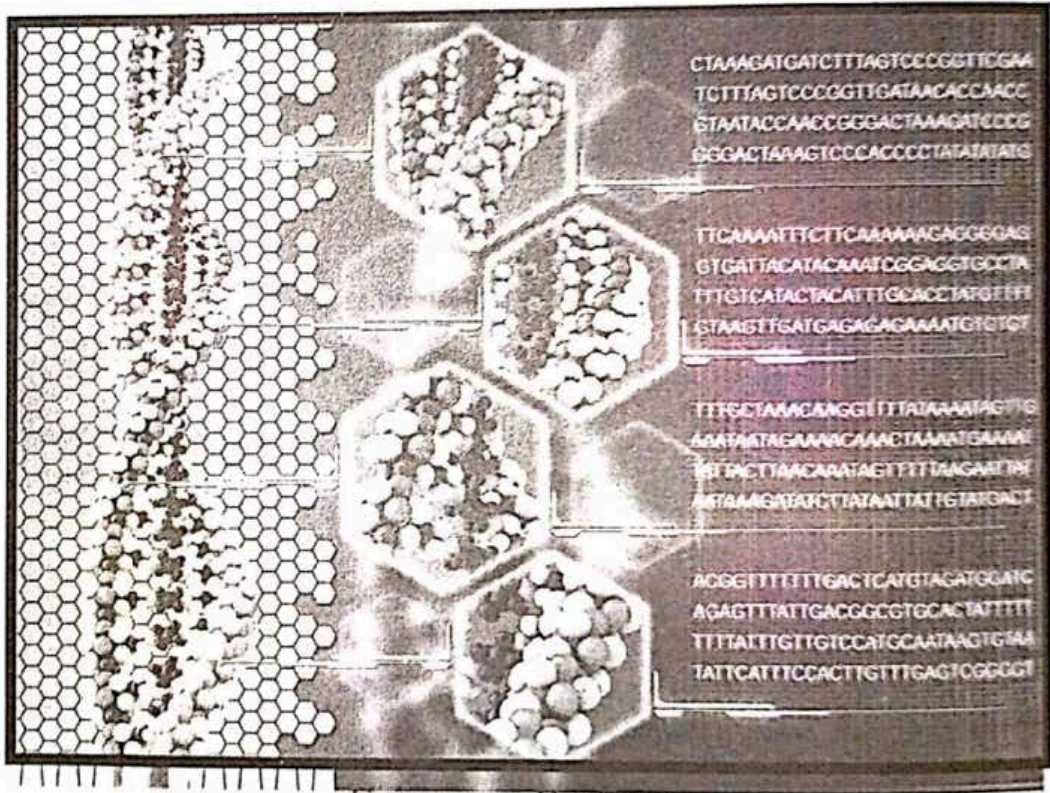
ডি.এন.এ-এর অতি জটিল গঠন

এবার ভাইয়া তার ফোন থেকে আর একটি পিকচার দেখালেন। আগে থেকে এ ব্যাপারে কিছুটা জানা থাকায়, আমি বসেই থাকলাম কিন্তু বাকিরা মোবাইলের ওপর হুমরি খেয়ে পড়ল। ভাইয়া আবার বলা শুরু করল,

প্রতিটি কোষে আছে ৬ বিলিয়ন ক্ষার যুগল! বলতে পারিস ছয়শো কোটি বর্ণ দ্বারা গঠিত ইয়া... বিশাল একটি বাক্য।[১৮৯] একটি কোড এদিক-সেদিক হলেই শেষ। তা আর প্রাণীকোষে সঠিকভাবে কাজ করবে না। একটা সিঙ্গেল DNA মলিকুল

---

১৮৯. http://www.nature.com/scitable/nated/article?action=showContentInPopup&contentPK=310

গঠনের জন্য দুশো কোটি এটমকে কেমিক্যালি কম্বাইন্ড হতে হয়। যদি প্রতি সেকেন্ডে একটি করে এটম প্রসেস করা যায়, তাহলে দৈনিক আট ঘণ্টা করে কাজ করলে মোট সময় লাগবে বিশ হাজার বছরের বেশি।

মানুষের একটি কোষে প্রায় দুই লক্ষ জিন থাকে, প্রায় দুই লক্ষ প্রোটিন কোড বহন করে। একটি মাঝারি ধরনের প্রোটিনে প্রায় তিনশত অ্যামাইনো এসিড থাকে। এটাকে যে DNA বহন করে তার চেইনে চার প্রকারের মোট এক হাজার নিউক্লিওটাইড থাকে। এই চার প্রকারের নিউক্লিওটাইড বিন্যস্ত হতে পারে 4^{1000} রকমের।[১৯০] এখন আমরা একটা হিসেব করে দেখি যে, এই ইনফরমেশন কোডিংগুলো বাই চান্সে হওয়ার সম্ভবনা কতটুকু।'

'আমরা এতগুলো হিসেব করতে পারব?' জানতে চাইল আবরার।

'পুরোপুরি না। জাস্ট হিসেবের ধরনটা বুঝতে পারব। ধরা যাক, আমরা একটি হলরুমে আটকানো। হাত পা সব বাঁধা। তবে বেঁচে যাওয়ার জন্য আমাদের একটি মাত্র চান্স আছে। চান্সটি হলো, একটি কি-বোর্ড এবং আমাদের পোষা একটি বানর সেখানে আছে। আমরা জানি, হলরুম থেকে বের হওয়ার পাসওয়ার্ড হচ্ছে, I HAVE A PEN। আমরা বানরটাকে ইশারা করে কি-বোর্ড দেখিয়ে দিলাম। এখন বানর যদি কি-বোর্ডে আন্দাজে টাইপ করে I HAVE A PEN পাসওয়ার্ডটি ওঠাতে পারে, তাহলে আমরা এই হলরুম থেকে উদ্ধার পাব। আর না হলে সেখানেই মারা পড়ব।'

'বানর লিখবে I HAVE A PEN, আর আমরাও উদ্ধার হব! হা হা হা... মজার ব্যাপার তো!' বেশ উৎপুল্ল হয়ে বলল আবরার।

'আগে হিসেব দেখ, আন্দাজে টাইপ করে বাই চান্সে I HAVE A PEN বাক্যটি মেলানোর সম্ভবনা কত। প্রথমত, একটি কি-বোর্ডে A-Z পর্যন্ত ব্লক থাকে ২৬টি। সেন্টেন্সে স্পেসবার লাগবে। স্পেসবারসহ ২৭টি ব্লক। হিসেব সহজ করার জন্য আমরা কি-বোর্ডের অন্য ব্লকগুলো বাদই দিয়ে দিলাম। ওকে?'

'মানে ০-৯, শিফট, কন্ট্রোল, অল্টার ইত্যাদি ব্লকগুলো বাদ?' আবরার সহজভাবে জানতে চাইল।

---

[১৯০]. The miracle of creation DNA, Harun Yahya, p.27-29

'হ্যাঁ, সেগুলো বাদে হিসেব করব। এগুলোসহ হিসেব করলে আরও অনেক জটিল হয়ে যাবে। এখন দেখ, এই ২৭টি ব্লক দিয়ে ১২ ব্লকের বাক্য I HAVE A PEN আন্দাজে মেলাতে হবে। প্রথমে দেখি, কম্বিনেশন কত করা যায়। আমরা লিখলাম P,E,N তিনটি ব্লক দিয়ে PEN। এই তিনটি ব্লককে আরও কম্বিনেশন করা যায় PNE, ENP, NPE...'

'হ্যাঁ, অনেকভাবেই সাজানো যায়।' বললেন জাকির ভাই।

এরকম ২৭টি ব্লক ব্যাবহার করে তিন ব্লকের শব্দ সাজানো যাবে 27^3= 19683টি। এই ছোটো সেন্টেন্সে আমাদের ব্লক লাগবে কয়টি?'

'I HAVE A PEN তাহলে ব্লক লাগবে A, E, H, I, N, P, V এবং স্পেসবার মোট ৮টি। কিন্তু পুরো বাক্য ১২ ব্লকের।[১৯১] তাহলে ছোটো একটা হিসেব কর। ৮টি ব্লক প্রতিবার ইচ্ছামতো ১২ বার চেপে কত কম্বিনেশন করা যাবে?'

আবরার খটাখট ক্যালকুলেটর টিপে বলল, '8^{12} অর্থাৎ = 68719476736টি।'

'এবার মধ্যের হিসেব কর। এরকম ২৭ ব্লক দিয়ে ১২ ব্লকের কম্বিনেশন করা যাবে কতটি?'

আবরার আবারও খটাখট করে ক্যালকুলেটর টিপে দেখাল, '27^{12} = 150094635296999121 (১ হাজার ৫০০ কোটি কোটি ৯৪ লক্ষ কোটি ৬৩ হাজার কোটি ৫২৯ কোটি ৬৯ লক্ষ ৯৯ হাজার ১২১)টি।'

'এই এতগুলো কম্বিনেশনের মধ্যে একটি মাত্র কম্বিনেশন হবে সঠিক I HAVE A PEN, তাহলে বানরের হাতে শুধু ২৭ ব্লকের একটি কি-বোর্ড দিয়ে আমাদের বেঁচে আসার সম্ভবনা কত?'

আবরার বলল, 'সহজ হিসেব। যে সংখ্যাটি আমরা পেলাম তা দিয়ে ১-কে ভাগ...'

'ওমা! তাহলে কিছু থাকে নাকি? শূন্যই তো। মানে কোনো সম্ভবনা নেই।[১৯২] আমি বাপু এই বানরের পাল্লায় পড়তে চাই না।' বললেন জাকির ভাই।

---

[১৯১]. [I(1), HAVE(4), A(1), PEN(3), 1+4+1+3=9+3(space-bar)=12]

[১৯২]. বিবর্তনবাদ ও তার সমস্যা, পৃ : ১২০-১২৬

'তুই তো নিজেই বানর, আবার বানরের পাল্লায় পড়বি কী? বরং তোর পাল্লা থেকে আমাদেরকে সাবধানে থাকতে হবে।' বলেই হেসে উঠলেন ভাইয়া। আমরাও তার সঙ্গে শরিক হলাম। ভাইয়া ঠান্ডা হয়ে যাওয়া চায়ের কাপটি হাতে নিয়ে বলল, ওয়েট, একটু শরবত খেয়ে নিই, এক নিমিষেই পুরোটা সাবাড় করে দিলো। কাপটা টেবিলের ওপর রেখে, আবার বলা শুরু করল,

'D.N.A-এর জটিলতা সম্পর্কে একটু ধারণা দিয়ে রাখি। মাইক্রোসফটের প্রতিষ্ঠাতা বিলগেটস DNA সম্পর্কে কি মন্তব্য করেছেন, জানিস?'

'না বললে জানব কীভাবে?' জাকির ভাই বললেন।

'নিজেকে মুক্তমনা দাবি করবি, অথচ এসব খোঁজ-খবর রাখবি না? বিলগেটস বলেছেন, "DNA কোডিং কম্পিউটার সিস্টেমের মতো। কিন্তু এখন পর্যন্ত আমাদের তৈরিকৃত সকল সফটওয়্যারের চেয়ে অনেক অনেকগুণ বেশি জটিল।"'[১৯৩]

আবরার বলল, 'এত্ত জটিল?'

'এত্ত জটিল না। বলতে পারিস এত্ত... এত্ত... এত্ত... জটিল। তাহলে DNA-এর মতো জটিল অকল্পনীয় ইনফরমেশন বাই চান্সে আসার ব্যাপারে কিছু বলার প্রয়োজন আছে?'

আচ্ছা ভাইয়া, 'একটা DNA-এর মধ্যে কী পরিমাণ ইনফরমেশন জমা থাকে?' প্রশ্ন করল আবরার।

'এই যা... আসল কথাই তো বলা হয়নি। জাকির, রিচার্ড ডকিন্সকে তো চিনিস?'

'হুম চিনি, অ্যাথেইস্ট বায়োলজিস্ট।'

'তিনি DNA স্টোরেজ সম্পর্কে বলেন, "লিলি ফুলের একটি বীজে কিংবা স্যালম্যান্ডার মাছের একটি স্পার্মে ইনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকার ৬০ গুণ বেশি তথ্য ধারণ করার মতো পর্যাপ্ত জায়গা আছে। কিছু প্রজাতির অ্যামিবা আছে, যাদের DNA-এর মধ্যে ইনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকার ১০০০ গুণ বেশি ইনফরমেশন থাকতে পারে।"[১৯৪] অন্য একটি হিসেবে দেখা যায়, একটি আলপিনের

---

[১৯৩]. Microsoft Mr.Bill Gates DNA is like computer program, but far, far more advanced than any advanced than any software we've ever created"

[১৯৪]. http://quotes.yourdictionary.com/author/richarddawkins/539718#QZZHXU4pDcofF8Os.99

মাথায় মানুষের যেটুকু DNA ধারণ করা যায়, সেই পরিমাণ DNA-এর মধ্যে, যতগুলো তথ্য জমা রাখা যেতে পারে, তা যদি কাগজে লেখা হয় এবং একটার সঙ্গে আরেকটি কাগজ লম্বা করে সাজানো হয়, তাহলে কাগজগুলো যে দূরত্ব অতিক্রম করবে, তা এত এত লম্বা হবে যে, পৃথিবী থেকে চাঁদের যে দূরত্ব তার চেয়ে ৫০০ গুণ বড়ো হবে।'[১৯৫]

'রিয়েলি স্ট্রেইঞ্জ!' বিস্মিত হয়ে বললেন জাকির ভাই!

'আরও শোন, রিচার্ড ডকিন্স মানুষের DNA ক্যাপাসিটি সম্পর্কে বলেন, মানুষের একটি কোষে যে পরিমাণ তথ্য আছে, তা ৩০ ভলিউমের তিন থেকে চারটি ইনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকার তথ্যের সমান।[১৯৬] আরও মজার ব্যাপার হলো, বর্তমানে বিজ্ঞানীরা DNA-তে তথ্য সংরক্ষণ করার চেষ্টা করছে। কেননা, এক গ্রাম DNA-এর মধ্যে যে পরিমাণ তথ্য সংরক্ষণ করা যাবে, তা প্রায় ২১৫ পেটা বাইটের সমান। অর্থাৎ ২১৫০০০০০০০ (২১৫ মিলিয়ন) গিগাবাইট![১৯৭] আর একজন মানুষের শরীরে এ ধরনের DNA সংখ্যা ৩৭ ট্রিলিয়নেরও বেশি।'

'ও... মাই গড!'

'জাকির, তুই গডের স্বীকৃতি দিয়েছিস?'

'ওহ, না, না। মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে।' অবচেতন মন থেকে... অপ্রস্তুতভাবে বললেন জাকির ভাই। আমরা মিটিমিটি হাসতে লাগলাম।

'দুআ করি, আল্লাহ যেন তোর অবচেতন মনকে সচেতন করে দেন।'

আমি, ভাইয়া আর আবরার সমস্বরে বলে উঠলাম, 'আল্লাহুম্মা আমিন!'

'জাকির, ডকিন্স কিন্তু স্বীকৃতি দিয়েছে, অবশ্যই এই ডিজাইন, কোডিং কোনো এক ইন্টেলিজেন্ড সত্তার করা।[১৯৮] অন্যদিকে বিবর্তনবাদীদের আতঙ্ক স্টিফেন

---

১৯৫. The 10 things you should know about the CREATION vs. EVOLUTION BY Ron Rhoders, p.-126

196. The 10 things you should know about the CREATION vs. EVOLUTION BY Ron Rhoders, p.-126

১৯৭. http://www.sciencemag.org/news/2017/03/dna-could-store-all-worlds-data-one-room

১৯৮. https://www.youtube.com/watch?v=t09Pzg9MSZ8

মেয়ারও দেখিয়েছেন, DNA-এর মেকানিজম এতই জটিল যে, বাই চান্সের কোনো সম্ভবনাই নেই। অবশ্যই একজন ইন্টেলিজেন্ট সত্তা এই মেকানিজম ডিজাইন করে দিয়েছেন।'[১৯৯]

'সত্যি!'

'যেখানে একটা মাত্র কোষের DNA-তে অগনিত তথ্য সুশৃঙ্খলভাবে সাজানো থাকে। তাহলে ৩৭ ট্রিলিয়ন কোষের মধ্যে সংরক্ষিত তথ্যের পরিমাণ কত হতে পারে, তুই চিন্তা করতে পারিস? আর এই বিশাল তথ্যভান্ডার কোনো একজন ইনটেলিজেন্স সত্তা ছাড়া আপনাআপনিই গচ্ছিত হয়েছে? এটা কি কখনো সম্ভব? আমি শুধু সত্য আর অকাট্য যুক্তিগুলো তোর সামনে উপস্থাপন করলাম। এখন মানা, না মানা তোর ব্যাপার।'

জাকির ভাইয়ের নির্বাক মুখের চাহনিই বলে দিলো, তার চিন্তার রাজ্যে কতটা ঝড় বইছে।

'জাকির, তোর জন্য আরও একটি চমকপ্রদ তথ্য আছে। গুরু অ্যান্টনি ফ্লিউ-এর নামেই তো আমাকে অ্যান্টনি ডাকতি, তাই না?'

'হ্যাঁ, তো?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন জাকির ভাই।

'তোর অ্যান্টনি ফ্লিউ এখন নিজেই একজন স্রষ্টায় বিশ্বাসী।'

'কী! অ্যান্টনি ফ্লিউ স্রষ্টায় বিশ্বাস করেছে? ফাও কথা বলার আর জায়গা পাস না। চাপা মারা বন্ধ কর।' চোখ দুটো বড়ো বড়ো করে বিস্ময় প্রকাশ করলেন জাকির ভাই।

'এখানে চাপা মারার কিছু নেই। এটাই সত্য, একটা সময় ডকিন্স আর অ্যান্টনি ফ্লিউ ছিল বির্বতনবাদী নাস্তিকদের রেফারেন্স। নাস্তকিকূল তাদের কথা ওহির মতো বিশ্বাস করত। কিন্তু যখনি তাঁরা দুজনই স্রষ্টার অস্তিত্ব স্বীকার করে নিলেন, তখনই নাস্তকিকূল তাদেরকে আর পাত্তা দেয় না।'

ভাইয়ার মুখেও তাদের ডাবল স্টান্ডার্ডবাজির কথা শুনে আমার খুব হাসি পেল। জাকির ভাই কিছু একটা বলতে চেয়েও পরিণাম ভেবে আবার চুপ করে গেলেন।

---

[১৯৯]. https://www.youtube.com/watch?v=dN5uo0TBd

'অ্যান্টনি ফ্লিউ শুধু স্বীকার করেনি, রীতিমতো গ্রন্থ রচনা করে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। বইয়ের নামও ইয়া বিশাল *There is a GOD: How the worlds most notorious atheists changed his mind* তিনি DNA মেকনিজম দেখে স্রষ্টার অস্তিত্ব স্বীকার করেন। তিনি বলেন, "DNA ম্যাটেরিয়ালের গঠন এত অবিশ্বাস্য রকমের জটিল, এর গঠনের জন্য অবশ্যই একজন অতিপ্রাকৃতিক বুদ্ধিমান সত্তা আছেন।"'[২০০]

এবার জাকির ভাই সত্যিই বড়ো একটা চমক পেয়ে বললেন, 'কিন্তু তুই তো একসময় বলেছিলি, বিজ্ঞান বলে র‍্যান্ডমলি প্রাণ সৃষ্টি সম্ভব! এখন আবার উলটো কথা বলছিস কেন?'

'হ্যাঁ, বলেছি। কিন্তু দুটো অক্ষর কম বলেছি, অ আর প।'

'বুঝলাম না।'

'মানে আমি যেটা বলেছি, সেটাকে বিজ্ঞান বলে না, অপবিজ্ঞান বলে। অপবিজ্ঞান বলে র‍্যান্ডমলি সম্ভব কিন্তু বিজ্ঞান বলে, সম্ভব না। এতক্ষণ ধরে একটা কোষের অতি সামান্য দুটো উপাদান নিয়ে কথা বলে শেষ করতে পারলাম না। যা বলেছি তাও অতি সামান্য। এই অতি সামান্যই র‍্যান্ডমলি সম্ভব না। তাহলে কি সমগ্র প্রাণীজগৎ র‍্যান্ডমলি পসিবল? আমরা প্রাণীজগতের কতটুকু রহস্য জানি?

- প্রতিটি কোষে আলাদা আলাদা জেনেটিক ব্লুপ্রিন্ট, আলাদা আলাদা সিস্টেম কন্ট্রোল করে। যেমন, স্কিন কন্ট্রোল করে ২৫৫৯ জিন। ব্রেন কন্ট্রোল করে ২৯৯৩০ জিন। ১৭৯৪ জিন চোখকে। স্যালিব্যারি গ্ল্যান্ড ১৮৬, হার্ট ৬২১৬, চেস্ট ৪০০১, ফুসফুস ১১৫৮১ জিন দ্বারা কন্ট্রোল হয়ে থাকে।
- একটি ব্যাকটেরিয়া DNA -তে ১,০০০০০ শব্দের ২০টি বইয়ের সমান তথ্য সংরক্ষণ করা সম্ভব।
- মাইট্রোকন্ড্রিয়া; যাকে পাওয়ার হাউস অফ সেল বলা হয়ে থাকে তা ১ মিলিমিটারের ১০০ ভাগের ১ ভাগের চেয়ে বড়ো না। এই মাইট্রোকন্ড্রিয়া আধুনিক হাইড্রোলিক স্টেশনের চেয়ে অনেক বেশি জটিল।
- কোষের চারপাশে প্রায় মিলিয়ন সংখ্যক ওপেনিং এবং ক্লোজিং সিস্টেম আছে, যা একটি বৃহৎ স্পেসশিপের চেয়ে জটিল।

---

[২০০]. There is a GOD: How the worlds most notorious atheists changed his mind by Antony flew, page-75

- পাকস্থলির এসিড এতই জটিল যে, কোনো প্রকার ক্ষতি না করেই একটি রেজার ব্লেডকে গলিয়ে ফেলতে পারে।
- গর্ভাবস্থায় একটি শিশুর ব্রেনের সঙ্গে কোষের প্রায় ১২০ ট্রিলিয়ন ইলেকট্রিক্যাল কানেকশন থাকে কোনো প্রকার ত্রুটি ছাড়াই।
- একজন মানুষের ৫ বিলিয়নের বেশি কৈশিক শিরা আছে। যেগুলো একটির পর একটি সাজালে লম্বায় ৯৫০ কিলোমিটার হবে। এই কৈশিক শিরাগুলো এতই সূক্ষ্ম যে, ১০০০০ শিরা পাশাপাশি রাখলে একটি পেন্সিলের সিস (গ্রাফাইট দন্ড)-এর চেয়ে মোটা হবে না।
- শরীরের কোথাও রক্তপাত হলে, রক্ত জমাট বাঁধতে সহায়তা করার জন্য অটোম্যাটিক্যালি ২০-এর চেয়ে বেশি ধরনের এনজাইম জমা হয়।
- মানুষের চোখে প্রায় ৪০টি আলাদা অংশ কাজ করে আলাদা জটিল সিস্টেমে। একটি অংশ কাজ না করলে আমরা দেখতে পারব না। এই অংশগুলোর আছে আলাদা ফাংশন। যেমন শুধু রেটিনার আছে আলাদা আলাদা গঠনের ১১টি ফাংশন। রেটিনা মাত্র ১ সেকেন্ডের ১০ ভাগের এক ভাগেরও কম সময়ে একটি ছবি ক্যাপশন করতে পারে। স্পেস লাগে ১ স্কয়ার মিলিমিটার (০.০০১৫৫ স্কয়ার ইঞ্চি)-এরও কম। চোখের মেকানিজম এবং কাজের স্পিড আধুনিক ৬৪ কম্পিউটারের চেয়ে ফাস্টার।
- মানুষের ব্রেনে গড়ে ১০০ বিলিয়ন নিউরন থাকে। সেকেন্ডে একটি করে স্পিডে গণনা করে শেষ করতে সময় লাগবে ৩১৭১ বছর। ১০ মাইক্রোনের ১০০ বিলিয়ন নিউরন একটির শেষ প্রান্তের সঙ্গে আরেকটির শুরুর প্রান্ত দিয়ে সাজালে, দূরত্ব হবে ১০০০ কিলোমিটার।
- মানুষের নাকে ১০০০০ ভিন্নধরনের সেন্ট রিসেপ্টর আছে যা দিয়ে প্রায় ১০০০০ ভিন্ন ধরনের ঘ্রাণ চিনতে পারে।
- মাত্র কয়েক সেকেন্ডে আমরা একটি পূর্ণ বাক্য পড়ে ফেলতে পারি। কিন্তু যদি শরীরের একটি এনজাইম কাজ না করে একটি বাক্য পড়তে সময় লাগবে ১৫০০ বছর।
- স্নায়ু আমাদের শরীরে তৎক্ষণাৎ নয় কিলোমিটার বেগে সিগন্যাল পাঠাতে পারে। ফলে আমরা হঠাৎ কোনো সমস্যা দেখলে তৎক্ষণাৎ আত্নরক্ষা করতে পারি।
- মানুষের ব্রেনে ১ কোয়াড্রিলিয়ন (1000000^4) সিন্যাপ্স আছে যা অন্যান্য কোষের সঙ্গে ১০০০০০০০০০০০০০০০ কার্যকলাপীয় যোগাযোগ করতে সক্ষম।
- কম্পিউটার সেকেন্ডে 10^9টি ক্যালকুলেশন করতে সক্ষম। আর মানব মস্তিষ্ক সক্ষম 10^{15}টি ক্যালকুলেশনে।

- প্রত্যেকদিন হার্ট ৭২০০ লিটার পাম্প করে যা দৈর্ঘ্য হিসেবে প্রায় ১০০০০০ কিলোমিটার (৬১১৪০ মাইল)।
- পড়ার সময় ১ সেকেন্ডে আমাদের রেটিনা প্রায় ১০ বিলিয়ন ক্যালকুলেশন করে।
- লিভারের একটি কোষে প্রায় ৫০০ অতি জটিল ফাংশন আছে। প্রত্যেকটি কোষ প্রায় ৫০০ ভিন্ন ভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ প্রসেস করতে সময় লাগে মাত্র মিলিসেকেন্ড।
- মানুষের কিডনির সাইজ মাত্র ১০ সেমি, ভর ১০০ গ্রাম। এই কিডনিতে মাইক্রো পিউরিফিকেশন প্ল্যান্ট আছে ১ মিলিয়ন।

'এই রকম কোটি কোটি জটিল মেকানিজম র‍্যান্ডমলি সম্ভব? আর কিছু শুনবি?'

জাকির ভাই যেন এতক্ষণ অন্য জগতে ছিলেন। নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'তথ্যগুলো আসলেই অন্যরকম, আরও জানা থাকলে বল।'

ভাইয়া এক শ্বাসে আবার কয়েকটি বলে গেলেন...

- একটি ড্রাগনফ্লাইয়ের ডানার দৈর্ঘ্য ১/৩০০০ মিলিমিটার বা ১/১১৮ ইঞ্চি। এই ডানা দিয়ে অত্যন্ত জটিল মেকানিজমে ঘণ্টায় ৪০ কিলোমিটার বেগে চলতে পারে।
- এবোমবার্ডিয়ার বিটল ১০০ ভিন্ন ধরনের কেমিক্যাল ব্যবহার করে আত্মরক্ষার জন্য নিজ শরীরে টক্সিন তৈরি করে।
- মাছি অত্যন্ত জটিল মেকানিজম ব্যবহার করে পার সেকেন্ডে ১০০০ বার ডানা ঘোরাতে সক্ষম। ৪০০০ করে দুচোখে লেন্স আছে ৮০০০ হাজার।
- সামুদ্রিক ইল মাছ পানির মধ্যে নিজের শরীরে যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারে তা তৎক্ষণাৎ একজন মানুষের মৃত্যুর জন্য যথেষ্ট। কিন্তু এতে ইলের কোনো ক্ষতি হয় না। মেকানিজম এখনও বিজ্ঞানীদের কাছে রহস্য।
- আমাদের চোখের ফটোরিসেপ্টর মাত্র তিনটি যা দিয়ে আমরা বর্ণালি চিনি, আর চিংড়ির চোখে ফটোরিসেপ্টর আছে ১৬টি করে যা দিয়ে আল্ট্রাভায়োলেট রে সিলেক্ট করতে পারে।
- ফটোসিন্থেসিসের মাধ্যমে পাতা বছরে ৩০০ বিলিয়ন টন সুগার উৎপন্ন করতে পারে, যা পৃথিবীর কোনো ল্যাবরেটরিতে উৎপাদন সম্ভব নয়।
- পৃথিবীতে প্রায় ৫০০০০০ ভ্যারিয়েশনের গাছ আছে, যাদের প্রত্যেকের সিস্টেম আলাদা আলাদা।[২০১]

---

২০১. What Darwinists Fail To Consider by Harun Yahya, p; 13-36

'এতক্ষণ আমি যা বললাম তা কি সব র‍্যান্ডমলি এসেছে?' বলেই ভাইয়া তার বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল।

ভাইয়ার মুখে এতগুলো তথ্য এক নিমিষে শুনে জাকির ভাই কতটুকু আশ্চর্য হলো তা হয়তো বলতে পারব না। কিন্তু আমার বিশ্বাসের পাতগুলো পরস্পরকে এত বেশি আকড়ে ধরল যে, মুখ দিয়ে শুধু একটি শব্দই বের হয়ে আসলো, 'আল্লাহু আকবর'।

....কিছুদিন আগেই শীত বিদায় নিয়েছে। তবে তার রেশটা এখনও কাটেনি। বসন্তের বিকালে ধুলোয় মলিন রাস্তার বুক চিরে আটটি পা সমান্তরাল গতিতে চলছে। পুকুর পাড়ে আম আর লিচু গাছগুলোর মাথায় দুলতে থাকা নতুন পাতাগুলোই বলে দিচ্ছে কয়েকদিনের মধ্যেই তারা নতুন মুকুলে সাজবে। রূপের মৌ মৌ গন্ধে চতুর্দিক বিমোহিত করে জানান দেবে, তাদের গুণাগুণ আর স্বাধ বৈচিত্র্যের কথা। ভাইয়ার সঙ্গে ঠিক কবে এইভাবে একসঙ্গে মসজিদে গিয়েছি মনে নেই।

তারপরে তো অতিক্রান্ত হয়েছে এক সুদীর্ঘ অমানিষা। আজকে আবার তিন ভাই একসঙ্গে আসরের সালাত পড়তে যাচ্ছি। এটা সত্যিই একটা স্বাপ্নিক ব্যাপার ছিল। জাকির ভাই যদি ঈমান আনতেন, তাহলে চারজনেরই গন্তব্য হতো মসজিদ। কিন্তু জাকির ভাই আমাদের চলার সহযাত্রী হলেও গন্তব্যের সহযাত্রী না হওয়ায় তিনি হয়তো নামাজের সময়টুকু বাইরে বসেই কাটাবেন। আল্লাহর কাছে দুআ করি, বসন্তের মুকুলের সঙ্গে তার অন্তরেও যেন তিনি ঈমানের রেণু ফুটিয়ে দেন।

অনেকক্ষণ ধরে চলা নীরবতায় ছন্দপতন ঘটালো ভাইয়া।

'কি রে জাকির, কিছু ভাবছিস মনে হচ্ছে?'

'হুম? হ্যাঁ, একটা বিষয় নিয়ে ভাবছি।' সংবিৎ ফিরে পেয়ে বললেন জাকির ভাই।

'এমন ঝিম ধরে কী এত ভাবছিস?'

'আচ্ছা একটু ক্লিয়ার করত। মানলাম, প্রাণের সৃষ্টি হওয়া বাই চান্স অর রেন্ডমলি কুড নট পসিবল বাট প্রাণীকোষের এই যে জটিল অবস্থা, এটা তো প্রাথমিক অবস্থায় ছিল না। এর থেকে অনেক অনেকগুণ সরল ছিল। প্রকৃতিতে টিকে থাকার প্রয়োজনে মিলিয়ন মিলিয়ন বছর ধরে মিউটেশনের ফলে বিভিন্ন অভিযোজন,

শারীরিক পরিবর্তন অর্থাৎ অর্গানিক ইভ্যুলুশন হয়। বংশ পরম্পরায় আসতে আসতেই তো বর্তমানে এই কঠিন অবস্থায় পৌঁছেছে, তাই না?'

'দ্যাট মিন্স ম্যাক্রো অর্গানিক ইভল্যুশন, এই তো?'

'হ্যাঁ।'

'ঠিক আছে, আগে সালাতটা সেরে নিই, তারপর এ ব্যাপারে তোকে বিস্তারিত বলছি।'

ততক্ষণে আমরা মসজিদ প্রাঙ্গণে চলে এসেছি। মসজিদের সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটি নারিকেল গাছ। ছোটো বড়ো আম গাছও আছে কয়েকটা। একটু দূরেই পাশাপাশি দুইটা কাঁঠাল গাছ। তার নিচে বসার জন্য কয়েকটা পাকা বেঞ্চ। সালাত শেষে অথবা অবসর সময়ে মুসল্লিরা এখানে বসে আলাপচারিতা করেন। গরমের সময় এই জায়গাটার গুরুত্ব বেশ বেড়ে যায়। সেদিকে ইঙ্গিত করে জাকির ভাই বললেন,

'তোরা যা, আমি এখানে বসছি।'

ভাইয়া তার দিকে ফিরে বলল,

'তুই যদি আমাদের সঙ্গে আসতি, খুব ভালো লাগত। আল্লাহর কাছে মাথা নোয়ানোয় যে কী প্রশান্তি, তা তুই এই অবিশ্বাসের জায়গা থেকে বুঝতে পারবি না।'

জাকির ভাই কিছু না বলে একটা রহস্যজনক মুচকি হাসি দিয়ে কাঁঠাল তলায় গিয়ে বসলেন।

ভাইয়াকে মসজিদে দেখে অনেক মুসল্লির চোখ কপালে ওঠার অবস্থা হলো। সালাত শেষে বের হওয়ার সময় জমির চাচাকে দেখলাম জুতো জোড়া হাতে নিয়ে বের হচ্ছেন। তাকে মসজিদে দেখে অনেকটা আশ্চর্য হলাম। তবে আমি জমির চাচাকে দেখে যতটা না আশ্চর্য হয়েছি, চাচা তার চেয়েও হাজারগুণ বেশি আশ্চর্য হলেন ভাইয়াকে দেখে। ভাইয়ার কাছে গিয়ে খুব ভালো করে পরখ করে নিলেন, কোনো ভুল হচ্ছে কিনা। তারপরেও সন্দেহ কিছুটা অবশিষ্ট থাকায় সরাসরি জিজ্ঞেস করলেন,

'এই বাবা, তুমি মহসিন ভাইয়ের ছেলে না?'

ভাইয়া হাসি মুখে উত্তর দিলেন, 'জি, চাচা।'

চাচা যেন কিছুক্ষণের জন্য গোলকধাঁধার মধ্যে পরে গেলেন। সন্দেহ ভরে ডানহাতের তর্জনি আঙুলটি ভাইয়ার দিকে হালকা তুলে বললেন, 'তুমি তো...'

'হ্যাঁ, আমি বিপদগামী ছিলাম। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ আমার অন্তরচক্ষু খুলে দিয়েছেন।'

চাচা অবাক দৃষ্টিতে তার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকলেন। কী যেন ভেবে জড়িয়ে ধরলেন ভাইয়াকে।

ভাইয়ার কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে অনেক দাওয়াতি কাজ করেছি। কিন্তু চাচাকে তো সরাসরি তেমন কিছুই বলিনি। শুধু মুআমালাতেও যে এতটা কার্যকর দাওয়াতি কাজ হতে পারে, তা সত্যিই আমার জানা ছিল না। যে লোকটি সারা দিন চায়ের দোকানে আড্ডা দিয়ে সময় কাটাত, তিনি আজকে মসজিদে। ভাইয়ার সঙ্গে চাচাকে এই অবস্থায় দেখে আমার আবেগ কন্ট্রোল করা সত্যিই কঠিন হয়ে পড়ল। কাঁঠালতলায় আসতেই জাকির ভাইকে একা বসে থাকতে দেখে চাচা বললেন,

'আল্লাহ তোর মনটারে নরম কইরা দিক, বাবা।'

জাকির ভাই চাচার কথার কোনো উত্তর না দিয়ে ভাইয়াকে উদ্দেশ্য করে বললেন,

'ওই, এতক্ষণ লাগে নামাজ পড়তে? আমি একা একা এখানে বিরক্ত হয়ে যাচ্ছি! এবার বল, অর্গানিক ইভল্যুশন নিয়ে তোর মন্তব্য কী?'

'এত তাড়ার কী আছে? আগে একটু আরাম করে বসতে দে, তারপর বলছি।'

বসার জায়গাটা বেশ বড়ো হওয়ায় একসঙ্গে অনেক মানুষ এখানে বসতে পারে। আমরা সবাই বেঞ্চের ওপর বসলাম। ভাইয়ার একপাশে জাকির ভাই, অন্যপাশে আবরার, তার পাশে জমির চাচা। আর জাকির ভাইয়ের অন্যপাশে আমি। ভাইয়া বলা শুরু করল,

'শোন, অর্গানিক ইভল্যুশনকে সাইন্স সম্পূর্ণ নাকচ করে দিয়েছে। ধর, যদি কাল্পনিকভাবে জিরাফের ক্ষেত্রে এমন হয় যে, হঠাৎ গলা লম্বা হওয়া জিরাফের DNA (বিশেষ করে শুক্রানু এবং ডিম্বানুতে অবস্থিত) র‍্যান্ডমলি বুঝতে পারল, টিকে থাকার জন্য পরবর্তী প্রজন্মের ঘাড় লম্বা হতে হবে। এরপর DNA নিজ থেকে মিউটেশন করল যেন পরবর্তী প্রজন্মের ঘাড় লম্বা হয়, এমন হলেই সমস্যা শেষ নয় বরং শুরু।'

'কেন?' আবরার বলল।

'কারণ, ঘাড় লম্বা হলে মাথায় রক্ত পৌঁছানোর জন্য ক্যারোটিড আর্টারিও লম্বা হতে হবে। উঁচুতে ব্লাড পাম্প করার জন্য হার্টও বড়ো হতে হবে। আবার জিরাফ পানি খাওয়ার জন্য যখন মাথা নিচু করত, তখন রক্ত হার্টে নিয়ে আসার জন্য যে রক্তনালী জুগুলার ভেইন আছে তা দিয়ে রক্ত মাথায় চলে আসত। যার ফলে, উচ্চ রক্তচাপের কারণে মাথায় রক্তক্ষরণ হতো। এটাকে ঠেকানোর জন্য জুগুলার ভেইনে ভাল্ব বসাতে হতো।'

'ওহ...'

'শুধু ভাল্ব বসানোই সমাধান নয়। মাথার সঙ্গে শরীরের অন্যান্য অঙ্গের সংযোগ রক্ষার জন্য নার্ভ ফাইবারগুলো লম্বা হতে হবে। দেহের বিশাল আকৃতি ধারণ করার জন্য পায়ে হুফ তৈরি হতে হবে। ইত্যাদি কারণে এই তত্ত্ব সম্পূর্ণ বাতিল হলো।[২০২] বুঝতে পেরেছিস জাকির?'

'হুম বলে যা।'

'ওকে, পরবর্তী সময়ে নিউ ডারুউইনিস্টরা এনেছে মিউটেশনের থিওরি। প্রথম কথা হলো প্রকৃতিতে মিউটেশন পাওয়া খুবই কষ্টকর এবং যে কয়টি মিউটেশনের ঘটনা পাওয়া গেছে বেশিরভাগই ক্ষতিগ্রস্থ। এমনকি র‍্যান্ডমলি যদি হাইলি অর্ডারের মিউটেশন হয় তাহলেও তা হয় বিকলাঙ্গ ও ক্ষতিগ্রস্ত। আচ্ছা, তোকে কয়েকটি মিউটেশনের রেজাল্ট দেখাচ্ছি।'

ভাইয়া পকেট থেকে ট্যাবটা বের করে কয়েকটা মিউটেশনের রেজাল্ট দেখালেন...

---

[২০২]. Evolution theory and its problems; p,170

মানুষের বিকৃত পা
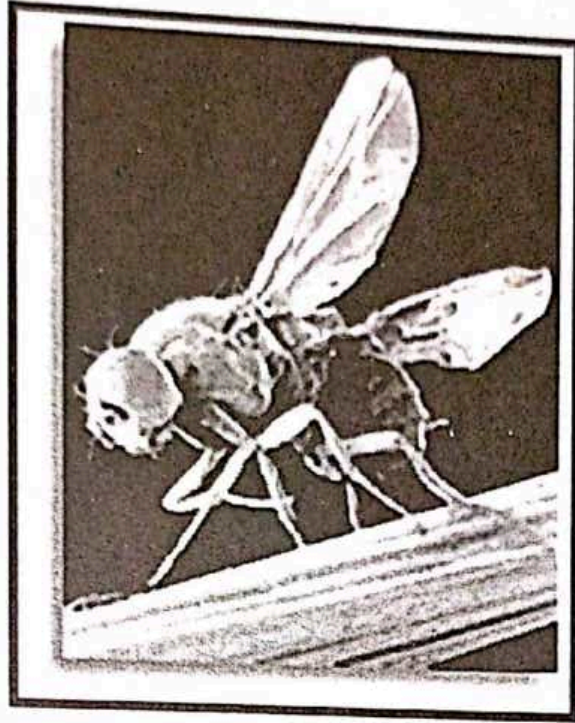
মৌমাছির বিকৃত পাখা

অস্বাভাবিক বিকলাঙ্গ ব্যাঙ
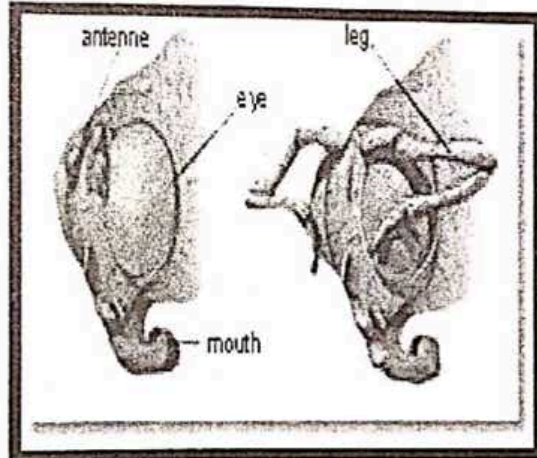
মৌমাছির চোখ দিয়ে বের হওয়া পা

'ছবিগুলো দেখে কী বুঝলি?'

'কিছুই বুঝলাম না।' বলল আবরার।

'আরে, এইগুলো সব মিউটেশনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া। এমন শত শত উদাহরণ আছে। বায়োলজিস্ট বি.জি. রঙ্গনথন মিউটেশন সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন,

"একটি উচ্চ মাত্রার ভূমিকম্প বড়োজোর র‍্যান্ডমলি একটি বিল্ডিংয়ের কাঠামো পরিবর্তন করতে পারে, কিন্তু উন্নয়ন করার কোনো সম্ভবনা নেই।"[২০৩]

---

[২০৩]. The Banner Of Truth Trust, B. G. Ranganathan, Pennsylvania: 1988.

ওয়ারেন উইভার তাঁর *জেনেটিক ইফেক্ট অব এটোমিক রেড়িয়েশন* বইয়ে প্রশ্ন করেছেন, বাস্তব এক্সপেরিমেন্টের সকল মিউটেশন রেজাল্টগুলো অত্যধিক ক্ষতিগ্রস্থ। অন্যদিকে, অর্গানিক ইভ্যুলুশনের অন্যতম শর্ত হচ্ছে মিউটেশন। কীভাবে মিউটেশনের মাধ্যমে উচ্চতর প্রজাতির বিবর্তন সম্ভব হতে পারে?[২০৪] আবার ফ্রেঞ্চ একাডেমি অব সাইন্সের প্রেসিডেন্ট, যিনি নিজেই একজন ইভল্যুশনিস্ট।'

'কে, পিয়ারে পল?' বললেন জাকির ভাই।

'হুম... পিয়ারে পল। তিনি ক্লিয়ার কাট স্টেটমেন্ট দেন যে, কতবার মিউটেশন হতে পারে এটি কোনো বিষয় নয়, যতই মিউটেশন হোক না কেন, এর ফলে কোনো প্রকার বিবর্তন সম্ভব নয়।[২০৫] সোজাসপটা কথা এটাই যে মিউটেশনের ফলে Macro organic evolution সম্ভব নয়।'

আবরার বলল, 'তাহলে, ডারউইন ফিঞ্চ পাখির যে ডকুমেন্ট দিয়েছিলেন?'

'আরে তিনি ফিঞ্চ পাখির ঠোঁটে যে বৈচিত্র্য দেখেছিলেন সেটা হচ্ছে একই প্রজাতির (Species) মধ্যে বিভিন্ন ভেরিয়েশন। তা বিবর্তিত হয়ে অন্য স্পেসিস হয়ে যায়নি। ফিঞ্চ পাখি তো ফিঞ্চ পাখিই ছিল, উটপাখি তো হয়ে যায়নি। তা ছাড়া, যদি অর্গানিক ইভল্যুশনের মাধ্যেমে প্রজাতি পরিবর্তিত হয়ে অন্য প্রজাতিতে আসত, তাহলে অনেক ট্রানজিশনাল ফর্ম বা মধ্যবর্তী অবস্থা পাওয়া যেত।'

'ডারউইন কি এই মধবর্তী অবস্থা সম্পর্কে জানতেন না?'

'আরে ডারউইন নিজেই তো প্রশ্নবিদ্ধ ছিলেন। তিনি নিজেই বলেন, এই থিওরি অনুযায়ী অবশ্যই অসংখ্য মধ্যবর্তী ফর্ম থাকতে হবে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত পৃথিবীতে এদের কোনো সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না কেন?'[২০৬]

'কোনো ফসিল রেকর্ড পাওয়া যায়নি?' বললেন জাকির ভাই।

'না। ডারউইনের শর্তের কোনো রেকর্ড পাওয়া যায়নি। এমনিতে, পৃথিবীতে এখন পর্যন্ত বিলিয়ন পরিমাণ ফসিল পাওয়া গেছে।[২০৭] তার মধ্যে ২৫০০০০

---

২০৪. Genetic Effects of Atomic Radiation, Warren Weaver, Science, vol. 123, June 29, 1956, p. 1159

২০৫. Evolutionist and former president of the French Academy of Sciences Pierre-Paul Grassé, Evolution of Living Organisms, New York: Academic Press, , 1977, P,88

২০৬. The Origin of Species, Charles Darwin, 11th Edition, p. 179

সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতি, যাদের মধ্যে ১.৫ মিলিয়ন ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতি এখনও পৃথিবীতে জীবিত। কিন্তু জীবিতদের বর্তমান অবস্থার সঙ্গে প্রাচীন ফসিলগুলোর কোনো পার্থক্য নেই।[২০৮] কয়েকটি ফসিল দেখ...'
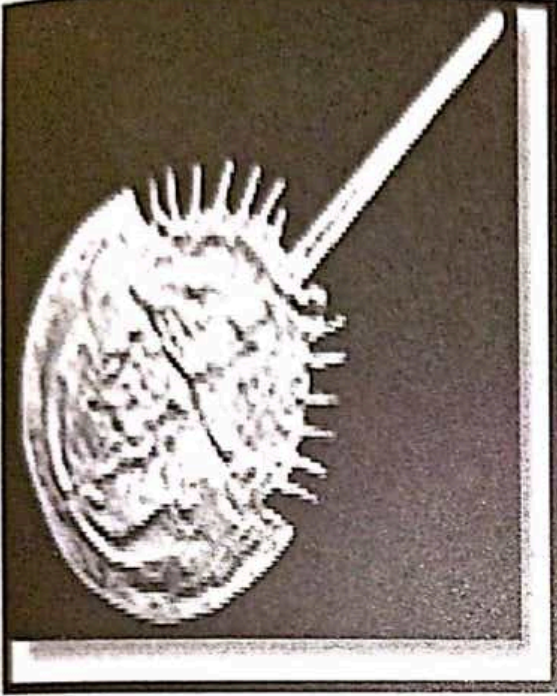
৪৫০ মিলিয়ন বছর আগের হর্স-শো ক্রাবের ফসিল
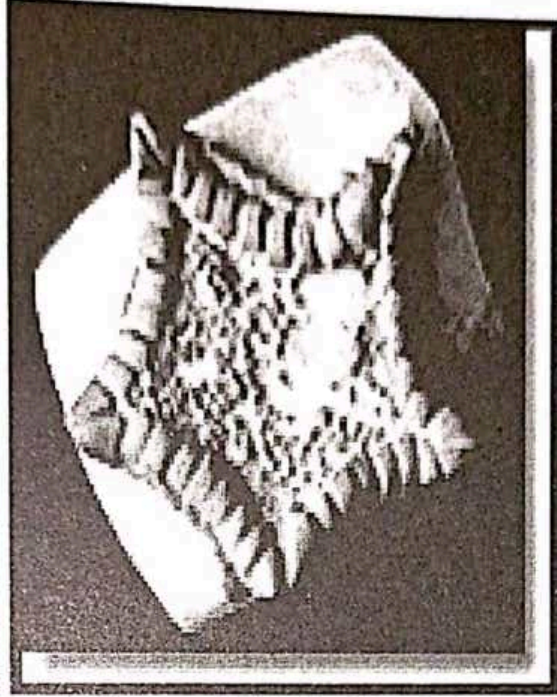
১৫০ মিলিয়ন বছর আগের স্টারফিশের ফসিল

৪৫০ মিলিয়ন বছর আগের ওয়েস্টারের ফসিল
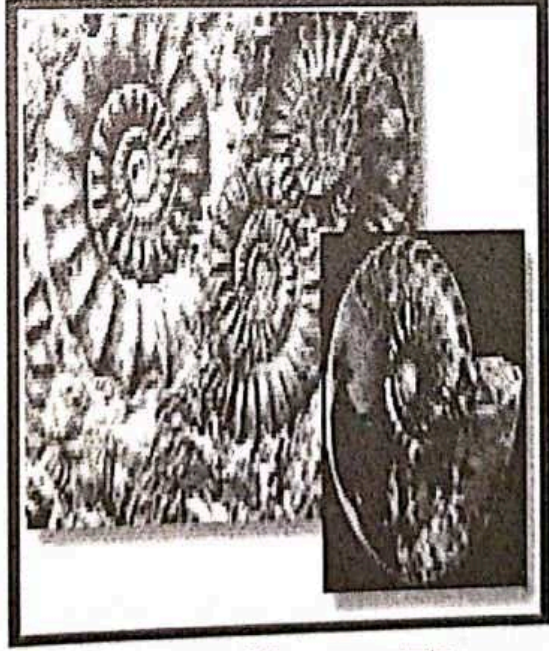
৩০০-৩৫০ মিলিয়ন বছর আগের শামুকের ফসিল

[২০৭]. Evolution: Fossils Still Say No, Duane T. Gish, CA, 1995, p. 41
[২০৮]. Vanished Species, David Day, Gallery Books, New York, 1989.
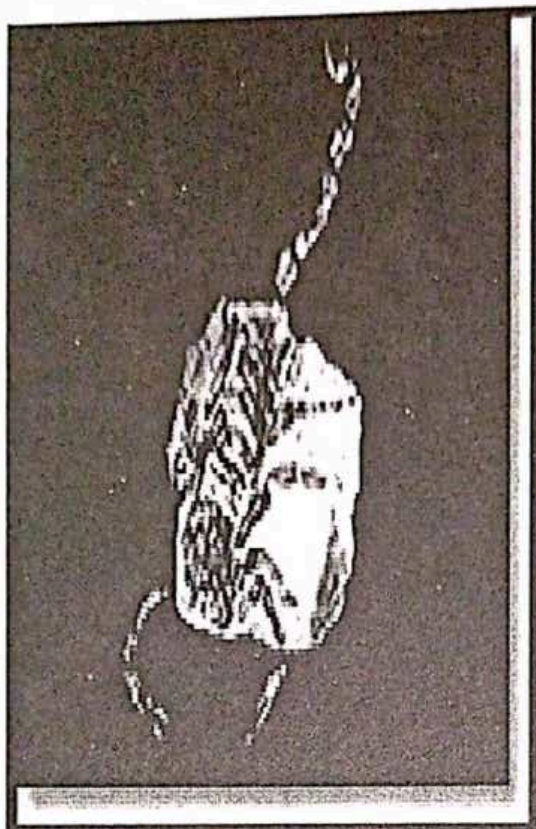
৩২০ মিলিয়ন বছর আগের
পালমোনস্করপিয়াসের ফসিল
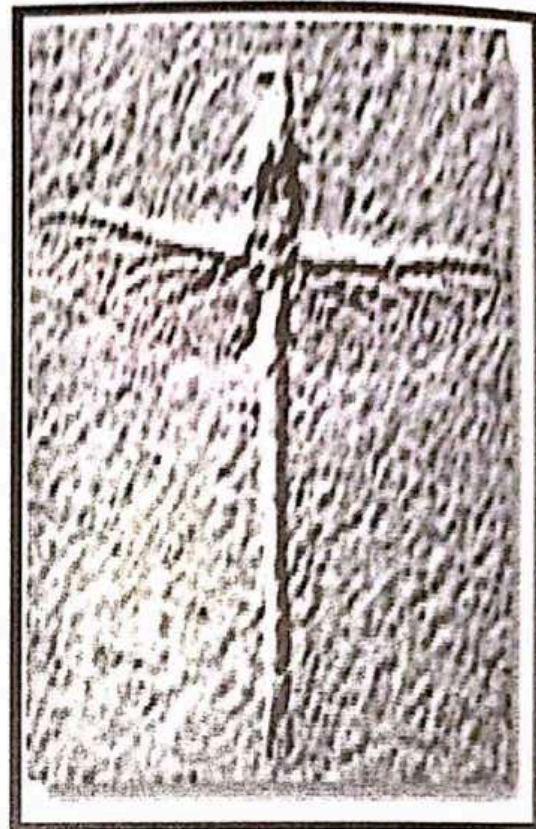
১৪০ মিলিয়ন বছর আগের
ড্রাগন-ফ্লাইয়ের ফসিল

৩৫ মিলিয়ন বছর আগের
মৌমাছির ফসিল

১৭০ মিলিয়ন বছর আগের চিংড়ি-
এর ফসিল

১৭০ মিলিয়ন বছর আগের ফড়িং-এর ফসিল
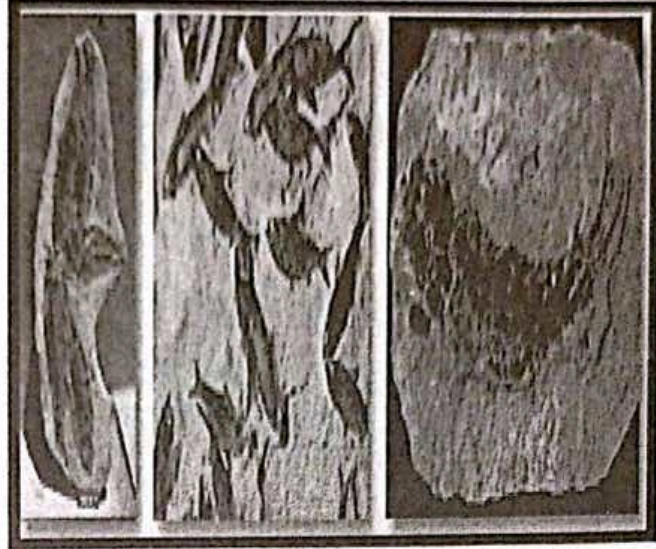
৩৬০ মিলিয়ন বছর আগের মাছের ফসিল*

এই ধরনের ১.৫ মিলিয়ন প্রজাতি এখনও বর্তমান, কিন্তু বর্তমানের সঙ্গে মিলিয়ন মিলিয়ন বছরের পুরোনো ফসিলের কোনো পার্থক্য নেই। কোনো মধ্যবর্তী অবস্থা নেই। ডারউইন নিজেই বলেছেন, যদি প্রজাতি সমূহের পরম্পরায় পরিবর্তনের প্রমাণে পর্যাপ্ত পরিমাণে মধ্যবর্তী অবস্থা না পাওয়া যায় তাহলে, আমার থিওরি মূল্যহীন হয়ে যাবে।[২০৯] আসলেও তাই।'

এতক্ষণে মসজিদের ইমাম সাহেবও আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। প্রথমে ভাইয়া কোন পক্ষের বুঝতে না পারলেও এখন অনেকটা স্পষ্ট হয়েছে তার অবস্থানটা কোন দিকে। ভাইয়ার প্রশ্নবাণে একসময় তাকে বেশ ঘাম ঝরাতে হয়েছিল। কিন্তু সেই আজকে তার নিজের প্রশ্নগুলোর উত্তর অন্যজনকে বেশ ভালোভাবেই ফিরিয়ে দিচ্ছে। ব্যাপারটা ইমাম সাহেবের কাছে বেশ আশ্চর্যজনক মনে হলো। আমার দিকে কৌতূহলি চোখে তাকালে আমার চোখের ভাষাই তাকে বুঝিয়ে দিলো, মাঝখানে কী ঘটেছে। হঠাৎ চাচা উচ্চস্বরে বললেন,

'শুনলাম এই ডারুন বেটা নাকি কইছে মানুষ হইছে বান্দর থাইকা। মানুষ কেমনে বান্দর থাইকা হয়, এইটা আমার মাথায় ঢোকে না। কই, একদিনও তো একটা বান্দররে দেখলাম না মানুষ হইয়া যাইতে। মানুষ হওয়া তো দূরের কথা বান্দরের লেজখান খুইল্যা পড়ছে এটাও তো দেখলাম না। এমনকি বাপদাদার মুখেও তো কোনো দিন এমন গল্প শুনলাম না।'

---

* DarwinismRefuted, Harun Yahya, Pg-28-29, Evolution of LivingOrganisms, Pierre-Paul Grassé, Academic Press, New York, 1977, p. 88. (emphasis added), Evolution: A Theory in Crisis, Michael Denton, Burnett Books Ltd., London, 1985, p.149.

২০৯. The Origin of Species, Charles Darwin: 11th Edition, p. 81

ভাইয়া বলল, 'চাচা, বিবর্তনবাদটাই আসলে মানুষের একটা কাল্পনিক চিন্তা মাত্র। আর মানুষ বানর থেকে এসেছে ঠিক এই দাবি করেছে, এমন না। সেটা একটু ভিন্ন ব্যাপার।'

চাচা মাথা নাড়াল। কিন্তু সেটা বুঝে নাকি না বুঝে, তা বোঝা গেল না।

'তাহলে কি এত দিনের পড়ে আসা হিউম্যান ডেভলপমেন্টের ৫টি স্তর, অস্ট্রালোপিথাকাস, হোমো হ্যাবিলিস, হোমো ইরেক্টাস, নিয়ানডার্থালম্যান, হোমো সেপিয়েন্স এসব ভুয়া?' বিস্ময়ের চোখে প্রশ্ন করলেন জাকির ভাই।

ভাইয়া একটু হেসে বলল, 'শোন জাকির, যদি সুনির্দিষ্ট কমন এনচেস্টর অর্থাৎ পূর্বপুরুষ থেকে ন্যাচারাল সিলেকশনের মাধ্যমে সব প্রাণী আসে, তাহলে প্রধান শর্ত হচ্ছে, অবশ্যই ট্রানজিশনাল ফর্ম থাকতে হবে। এটা আমি আগেও বলেছি। সো মানুষ (ডারউইনবাদীরা) এসেছে এপ[২১০] থেকে এটা প্রমাণের জন্য Transitional form অর্থাৎ মধ্যবর্তী অবস্থা থাকা আবশ্যক। কিন্তু তা নেই।'

'তাহলে মানুষ এসেছে এপ থেকে, এই দাবি কেন করা হয়েছে?' প্রশ্ন করল আবরার।

'এর কারণ হলো, বিবর্তনবাদীরা প্রথমে বলল, মানুষ এবং এপদের মধ্যে জেনেটিক মিল রয়েছে ৯৯%। পরে দেখা গেল আসলে ৯৯% নয়, কোনো হিসেবে ৯৬% মিল, আবার কোনো হিসেবে ৯৫% মিল।[২১১] আচ্ছা, আমরা বেশিটাই ধরে নিলাম যে, ৯৬% মিল। কিন্তু এই জেনেটিক মিল কোনো কাজেরই না। কেন কাজের না বলতে পারিস?' আবরারের দিকে তাকিয়ে বললেন ভাইয়া।

ঠোঁট ভেলসিয়ে 'না' সূচক মাথা নাড়াল আবরার।

'দুইটা কারণে। প্রথমত, ডি.এন.এ-এর ৯৬% বেস পেয়ারে মিল থাকাতে আমরা যদি এপ থেকে এসে থাকি, তাহলে তো আবিসিনিয়ান বিড়ালের সঙ্গেও DNA বেস পেয়ারে ৯০% মিল রয়েছে। এ ছাড়াও ইঁদুরের সঙ্গে মিল ৮৫% গরুর সঙ্গে মিল ৮০% ফ্রুট ফ্লাইয়ের সঙ্গে মিল ৬১%। মুরগির সঙ্গে মিল ৬০%, কলার সঙ্গে মিল ৬০% রয়েছে।[২১২] তাহলে কি বিবর্তনবাদীরা ইদুঁর, বিড়াল, গরু, বলদ থেকেও কিছু পেয়েছে?'

---

[২১০]. বিবর্তনবাদীদের মতে 'এপ' এক প্রজাতির প্রাণী। যাদের থেকে দুটো নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হয়েছে। এক প্রজাতি শিম্পাঞ্জি বা আধুনিক এপ, আরেক প্রজাতি মানুষ।

[২১১]. https://news.nationalgeographic.com/news/2002/09/0924_020924_dnachimp.html

[২১২]. http://genetics.thetech.org/ask-a-geneticist/human-seal-shared-dna, http://www. businessinsider. com/comparing-genetic-similarity-between-human-and-other-things-2016

সবাই হাসতে থাকল। হঠাৎ চাচা বলল, 'আমার মনে হয় শেষেরটাই ঠিক। এরা বলদ থাইক্যাই কিছু পাইছে। বলদ থাইক্যা মাথার বেরেন পাইছে, বেরেন। এর লাইগা জ্ঞান বুদ্ধি বলদের মতোন।'

চাচার কথায় আমাদের হাসির মাত্রা আরেকটু বৃদ্ধি পেল। একটু পর ভাইয়া হাসি থামিয়ে আবার বলতে শুরু করল,

'আর দ্বিতীয়ত, এপ-এর সঙ্গে ৯৬% মিল মানে বাকি ৪% অমিল। এই ৪% অমিল কিন্তু মামার বাড়ির আবদার না যে, এদিক-সেদিক করেই মিলে যাবে। আমাদের শরীরের DNA-এর সংখ্যার হিসেবে এই ৪% হচ্ছে ১২ কোটি ৮০ লক্ষ বেস পেয়ার।[২১৩]'

'বলিস কি!' চোখ দুটো বড়ো বড়ো করে বললেন জাকির ভাই।

'হুম, এপদের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য আছে ১২ কোটি ৮০ লক্ষ বেস পেয়ারের। সম্প্রতি টেড টকে বিজ্ঞানী রিকার্ডো একটি হিসেব দেখান, যদি আমাদের DNA কোডকে প্রিন্ট করা হয়, তাহলে ২৬২০০০টি পাতা কিংবা বড়ো আকৃতির ১৭৫টি গ্রন্থ হবে। অন্য যেকোনো প্রাণী থেকে মানুষ ইউনিক হওয়ার জন্য এর মধ্যে মাত্র ৫০০টি শব্দের অমিল থাকাই যথেষ্ট। তাহলে এপদের সঙ্গে মানুষের ১২ কোটি ৮০ লক্ষ বেস পেয়ারের অমিল থাকা স্বত্ত্বেও আমরা মানুষরা এপদের থেকে এসেছি, এই দাবি কতটা হাস্যকর, চিন্তা করতে পারিস?'

কোনো উত্তর না দিয়ে, চুপ করেই থাকল জাকির ভাই।

'এবার আমরা এপদের কাছে যাই। এই এপদের প্রথম ক্যাটাগরি হচ্ছে অস্ট্রালোপিথাকাস অর্থাৎ সাউথার্ন এপ। এরা আফ্রিকাতে আবির্ভূত হয়েছিল ৪ মিলিয়ন বছর আগে। আর টিকে ছিল ১ মিলিয়ন বছর। এদের আবার প্রজাতি ভিন্নতা ছিল জানিস কিনা?'

'জানতাম, এখন মনে নেই।'

'সমস্যা নেই। এদের কয়েকটি প্রজাতি ছিল। যেমন : সবচেয়ে পুরোনো প্রজাতি এপারেন্সিস। তারপর এসেছে আফ্রিকানাস এবং রোবাসটাস। মজার ব্যাপার হলো, ফসিল রেকর্ডে দেখা গেল সব প্রজাতিই বর্তমান এপদের সঙ্গে

---

[২১৩]. অ্যান্টিডোট, আশরাফুল আলম, পৃ : ২৬

মিলে গেছে। তারপরেও বিবর্তনবাদীদের দাবি অস্ট্রালোপিথাকাস মানুষের মতোই চলাফেরা করত। বিবর্তনবাদীদের সবচেয়ে টপ মডেল কী ছিল বলত?'

'লুসি (Lucy)।'

'হুম ঠিক। কিন্তু আবারো তাদেরকে হতাশ করে দিয়ে ইংল্যান্ডের বিজ্ঞানী লর্ড সলি জাকারম্যার ম্যান এবং ইউ.এস.এ-এর প্রফেসর চার্লস অক্সনার্ড অকাট্য প্রমাণ করে দিলেন যে, অস্ট্রালোপিথাকাস মানুষের মতো চলাফেরা করত না। এমনকী তারা দ্বিপদী বা দুই পা বিশিষ্টও ছিল না। ব্রিটিশ গভমেন্টের অনুদানে ফসিল নিয়ে দীর্ঘ ১৫ বছর গবেষণা করার পর লর্ড জাকারম্যান এবং তাঁর টিমের ৫ জন বিশেষজ্ঞসহ এই সিদ্ধান্তে উপসংহার টানেন, অস্ট্রালোপিথাকাস শুধু বর্তমান এপদের একটি উপপ্রজাতি ছিল।[২১৪] অথচ, তারা দুজনই বিবর্তনবাদী বিজ্ঞানী।'

ভাইয়া আবারও ট্যাব থেকে কিছু ছবি দেখিয়ে বললেন,
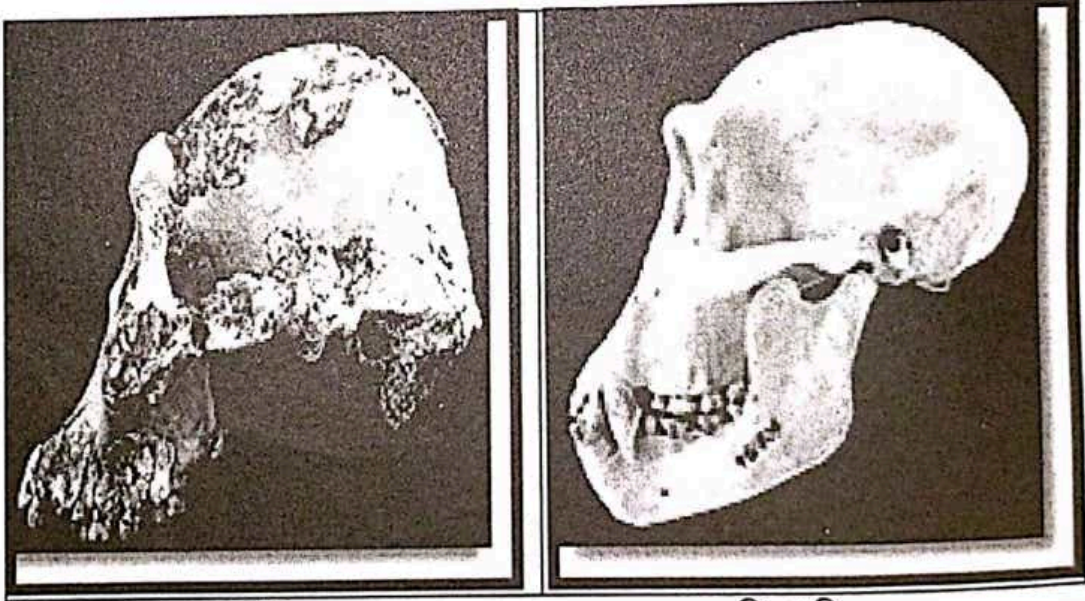
এপারেন্সিস

শিম্পাঞ্জি

'ছবিগুলো দেখ, বাম পাশেরটি এপারেন্সিস অর্থাৎ অস্ট্রালোপিথাকাসের খুলি এবং বাম পাশে আধুনিক সিম্পাঞ্জির খুলির মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। তুই কি এই দুটো খুলির মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখতে পাচ্ছিস?'

'কই! না তো, উল্লেখযোগ্য কোনো পার্থক্য দেখতে পাচ্ছি না।'

---

[২১৪]. Beyond The Ivory Tower, Solly Zuckerman, pp. 75-94

'দেখবিও না। কারণ, এরা আসলে সিম্পাঞ্জির একটি উপপ্রজাতি মাত্র। মানুষের সঙ্গে-এর কোনো মিল নেই। ১৯৯৯ সালে বিখ্যাত ফ্রেঞ্চ সাইন্স ম্যাগাজিন *Science et Vie* তাদের ম্যাগাজিনে Adieu Lucy শিরোনামে এ তত্ত্বের খেল খতম করে দেন। সেখানে বলা হয় যে, অস্ট্রালোপিথাকাস মানুষের কোনো পূর্বসূরি নয়।'

'তাই? তাহলে তো অস্ট্রালোপিথাকাসের দফারফা হয়ে গেল। আর গুরু হ্যাকেলের লাইফ ট্রি-এর কী হলো?' আমি জানতে চাইলাম।

'অস্ট্রালোপিথাকাস অবৈজ্ঞানিক, ভিত্তিহীন প্রমাণিত হওয়ার পরই হেকেল তাঁর কল্পিত লাইফ ট্রি থেকে সুকৌশলে এদের নাম মুছে দিলেন।'

'এরা তো তাহলে আস্ত জোচ্চরও।' ঈষৎ হেসে বলল আবরার।

'আর হোমো হ্যাবিলিস?' অত্যন্ত উৎসাহ নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন জাকির ভাই।

'বলছি, হোমো হ্যাবিলিস। হোমো অর্থ মানুষ। ১৯৬০ সালে বিজ্ঞানী লেকিস এবং তার ফসিল খোঁজকারী দল এই প্রজাতির সন্ধান পান। তখন ঘটা করে প্রচার করা হয় এই প্রজাতি হলো মানুষের পূর্বসূরি। এদেরকে মানুষের এনচেস্টর হিসেবে প্রমাণ দেখানো হয় কত বছর ধরে, জানিস?'

'না।'

'এক দু বছর নয়, ২০ বছর ধরে।'

'তারপর কী হলো?'

'কী আর হবে, বিবর্তনবাদীদের ঘুম নষ্ট করার জন্য এলেন বিজ্ঞানী বার্নার্ড উড এবং সি. লরিং ব্রেস। তাঁরা তাদের গবেষণার রেজাল্টে দেখান, হোমো হ্যাবিলিস, যাদেরকে Skillful man নামে চিহ্নিত করা হয়েছে, অর্থাৎ যারা মানুষের মতো যন্ত্র ব্যবহার করতে পারত বলে ধারণা করা হয়েছে। আসলে তাদেরকে চিহ্নিত করা উচিত অস্ট্রালোপিথাকাস হ্যাবিলিস অথবা স্কিলফুল সাউথার্ন এপ নামে। কারণ, এরা বর্তমান এপদেরই একটা প্রজাতি। ১৯৯৪ সালে আমেরিকান ফসিল বিজ্ঞানী, হলি স্মিথ বলেন, "Homo habilis was not Homo।"'

'কি বলিস!'

'তারপর শুন, তিনি তাঁর গবেষণার উপসংহারে বলেন, "প্রজাতিগত মান, মুষ্টিবদ্ধতার পরিমাপ, দাঁতের গঠন, শারীরিক বৃদ্ধিসহ সকল প্রকার বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায়, হোমো হ্যাবিলিস নামে পরিচিত এপরা বর্তমান এপদেরই একটি উপপ্রজাতি।"[২১৫] একই বছর তিনজন এনাটমি স্পেশিয়ালিস্ট ফ্রেড স্পোর, বার্নার্ড উড এবং ফ্রান্স জনভেল্ড ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে গবেষণা করে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হন।

'ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে গবেষেণা করেও একই রেজাল্ট পেয়েছেন?'

'সেটাই তো জানান দিলেন তাঁরা। তারা তিনজন যৌথভাবে একই উপসংহার টানেন, "...from southern Africa attributed to Australopithecus and Paranthropus resemble those of the extant great apes"[২১৬] সব মিলিয়ে হোমো হ্যাবিলিসকেও মানুষের মিসিং লিংক বা মধ্যবর্তী পর্যায় হিসেবে পাত্তা দেওয়া গেল না।'

'পরের স্টেপ অর্থাৎ হোমো ইরেক্টাস?'

'হ্যাঁ, বলছি। হোমো ইরেক্টাস। যেহেতু, অস্ট্রালোপিথাকাস এবং কথিত হোমো হ্যাবিলিস একই প্রজাতির সেহেতু, হোমো ইরেক্টাসও একই প্রজাতির হওয়ার কথা ছিল, তাই না? কিন্তু না। এই হোমো ইরেক্টাস আসলে মানুষেরই প্রজাতি।'

'হোমো ইরেক্টাস মানুষেরই প্রজাতি মানে?' বিস্ময়ের সুরে বললেন জাকির ভাই।

'হ্যাঁ, আগে শুন, গবেষণায় দেখা গেছে এদের কঙ্কাল সোজা। অস্ট্রালোপিথাকাসের চেয়ে এদের ক্রনিয়াল ক্যাপাসিটি বা খুলির আকার দ্বিগুণ বেশি বড়ো এবং এরা দুই পা বিশিষ্ট প্রাণী। যে রকম অস্ট্রালোপিথাকাস এবং সিম্পাঞ্জি একই প্রজাতির। একইভাবে হোমো ইরেক্টাস এবং হোমো সেপিয়েন্স বা আধুনিক মানুষ সমপ্রজাতির। এদের কঙ্কালের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

---

২১৫. American Journal of Physical Antropology, Holly Smith, vol. 94, 1994, pp. 307-325

২১৬. Implications of Early Hominid Labyrinthine Morphology for Evolution of Human Bipedal Locomotion, Fred Spoor, Bernard Wood & Frans Zonneveld. Nature, vol 369, 23 June 1994, p. 645
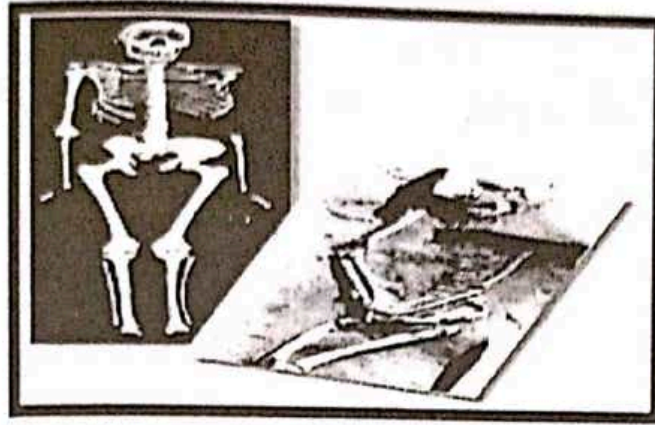
১.৬ মিলিয়ন বছর পুরোনো হোমো ইরেক্টাস এবং বর্তমানের মানুষের সঙ্গে তেমন কোনোই পার্থক্য নেই।'

'কিন্তু হোমো ইরেক্টাসকে তো প্রাইমেটিভ বা মানুষের আদিরূপ ধরা হতো!'

'হোমো ইরেক্টাসকে প্রাইমেটিভ ধরার কারণ হলো, এদের ক্রনিয়াল ক্যাপাসিটি বা খুলির আকার একটু ছোটো (৯০০-১১০০ সি.সি) যা, গড়ে আধুনিক মানুষের চেয়ে কম, আর চোখের ভ্রু কিছুটা উঁচু।'

'কিন্তু এগুলো তো খুব স্ট্রং প্রমাণ...'

'আরে এ ধরনের খুলিবিশিষ্ট মানুষ আধুনিক বিশ্বে এখনও আছে। যেমন : বামনরা। আবার উঁচু ভ্রু সম্পন্ন মানুষও পৃথিবীতে বর্তমান আছে। যেমন : Native Australians। বিবর্তনবাদীরা কিছু পার্থক্যকে এখনও প্রমাণ হিসেবে দেখায়, অথচ আধুনিক মানুষদের বিভিন্ন উপজাতির কঙ্কালের মধ্যেও একই রকম পার্থক্য বিদ্ধমান আছে। এই ছবিটা দেখ...
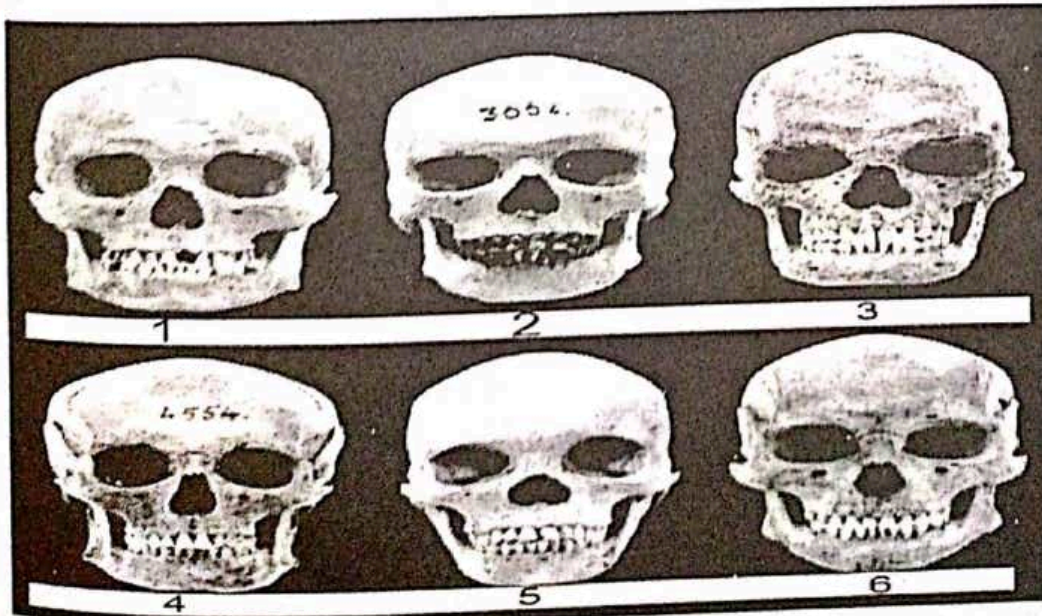
সিরিয়াল অনুযায়ী খুলিগুলো হচ্ছে,

- ১ম ছবিটা পনেরো শতাব্দীর পেরুভিয়ান আদিবাসীদের মাথার খুলি।
- ২য় ছবিটা মধ্যবয়সী বাঙ্গালির।
- ৩য় খুলিটা সলোমন দ্বীপপুঞ্জের পুরুষের যিনি ১৮৯৩ সালে মারা যান।
- ৪র্থ খুলিটা ২৫-৩০ বছর বয়সী জার্মান পুরুষের।
- ৫ম খুলিটা ৩৫-৪০ বছর বয়সী একজন কঙ্গোলিয়ান পুরুষের। আর সর্বশেষ ছবিটা ৩৫-৪০ বছর বয়সী লুনাইট পুরুষের খুলির।

এইগুলো আসলে ফিঞ্চ পাখির মতোই সামান্য ভ্যারিয়েশন ছাড়া কিছুই নয়। সুতরাং আলাদা কোনো প্রজাতি ভাবার সুযোগ নেই। একটু আগে বিজ্ঞানী রিচার্ড লেকির কথা বলেছিলাম মনে আছে?'

'হ্যাঁ, বিবর্তনবাদী বিজ্ঞানী।'

'তিনি নিজে বিবর্তনবাদী হওয়া সত্ত্বেও বলেন, "মাথার খুলি, মুখের চোয়াল, কপালের গঠন ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, বর্তমান হোমো সেপিয়েন্স এবং হামো ইরেক্টাসের মধ্যে উল্লেখযোগ্য তেমন কোনো পার্থক্য নেই। আধুনিক মানুষ এবং হোমো ইরেক্টাসের একই প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত।"[২১৭] হোমো ইরেক্টাস আসলে আধুনিক মানুষের ভেরিয়েশন। তারা আলাদা কোনো প্রজাতি নয়।'

'তার মানে হোমো ইরেক্টাস মানুষের মিসিং লিঙ্ক বা মধ্যবর্তী পর্যায় নয়।'

'এইতো তোর ব্রেন কাজ করা শুরু করেছে।'

'ফাজলামো করিস না তো... পরের স্টেপ বল।'

'পরেরটা কী যেন?'

'নিয়ানরা...'

'ও..হ্যাঁ, নাটকের শেষ পর্ব নিয়ানডার্থালম্যান। বর্ণনা অনুসারে এদের আবির্ভাব হয় এক লক্ষ বছর আগে। এরা খুব দ্রুত অন্য জাতির সঙ্গে মিশে যায় এবং টিকে থাকে ৩৫০০০ বছর পর্যন্ত। আধুনিক মানুষ এবং নিয়ানডার্থালদের

---

২১৭. The Making of Mankind, Richard Leakey, p. 116

মধ্যে পার্থক্য হলো, তাদের কঙ্কাল আরও বেশি শক্তসমর্থ এবং খুলির আকার স্বাভাবিক মানুষের চেয়ে একটু বড়ো। বিবর্তনবাদীরা সর্বাত্মকভাবে চেষ্টা করে নিয়ানডার্থালদের আধুনিক মানুষের প্রিমিটিভ স্পেসিস বা আদিম প্রজাতী হিসেবে চালিয়ে দিতে। তাদের হিসেবে আধুনিক মানুষদের বয়স মাত্র ১০০০০ বছর, আমাদের আগেই এই নিয়ানদের অবস্থান। সেই সময়টাকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়। ফোর ফাইভের বিজ্ঞান বইয়েও এগুলো আমরা পড়েছি, তোর মনে আছে?'

'কী যে বলিস না তুই! ব্রেন কি এতোই শর্ট হয়ে গেছে নাকি? প্রথমে, প্রস্তরযুগ যে সময় মানুষ পশু শিকার করে জীবন বাঁচাত, পোশাক পরতে জানতো না, উলঙ্গ হয়ে ঘুরে বেড়াত। তারপর আসে ব্রোঞ্জ যুগ, লৌহ যুগ এরপর মানুষ আগুন জ্বালাতে শেখে, পোশাক বুনতে শেখে। এভাবেই মানুষ সভ্য হতে হতে বর্তমান পর্যন্ত এসছে।' এক নিমিষেই বলে ফেললেন জাকির ভাই।

'কিন্তু আসল সত্যটা তুই জানিস না। বিবর্তনবাদীরা নিজেদের পূর্ব-পুরুষদের অসভ্য ভাবে। অথচ আমাদের পূর্ব পুরুষরা কখনো অসভ্য ছিল না। আমরা সৃষ্টির শুরু থেকেই সভ্য। আমাদের পূর্ব-পুরুষরা বনে জঙ্গলে উলঙ্গ হয়ে ঘুরে বেড়ায়নি। বিবর্তনবাদীরা নিজেদের পূর্বপুরুষদের অসভ্য দাবি করলে তাদের নির্বুদ্ধিতা দেখে আফসোস করা ছাড়া আমাদের আর কিছুই করার থাকে না।'

'কীভাবে বুঝলি এটা তাদের নির্বুদ্ধিতা?'

'বর্তমানে বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন প্রমাণ করে দিয়েছে, আসলে তাদের পূর্বপুরুষের এমন মানহানি একেবারেই মিথ্যা। নিয়ানডার্থালরা আধুনিক সভ্য মানুষের অসভ্য আদি প্রজাতী নয় বরং তারাও সভ্য ছিল। আর তারা মানুষেরই একটি উপপ্রজাতি। এজন্য তাদেরকে এখন Homo sapiens neanderthalensis ডাকা হয়। তারা পোশাক পরতে জানত, কাপড় বুনতে জানত, জুতো পরতে জানত, গান গাইতে জানত, মিউজিক বাজাতে পারত, আঁকতে জানত এবং তারা সভ্য ছিল।'

'কী যে বলিস তুই, আমার কিছুই বুঝে আসছে না। কী পড়লাম এতবছর ধরে? রাত জেগে জেগে এসব মুখস্ত করতে করতে চোখে সরষে ফুল দেখলাম। এখন কিনা বলছিস সব ভুয়া!'

'তুই শুধু একাই মুখস্ত করেছি? আর আমি তো বই ভিজিয়ে রেখে সকালবেলা উঠে সেই জল গিলেছি। আমাদের বুকের ওপর পা দিয়ে চেপে ধরে এসব গেলানো হয়েছে। এখনও গেলানো হচ্ছে। তুই তো এখন একসঙ্গে সব

ভাওতাবাজি দেখতে পাচ্ছিস। আর তথ্য উদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে আমার জীবন তেজপাতা হয়ে গেছে। তোকে জাস্ট কয়েকটা ছবি দেখাচ্ছি। এগুলো দেখলেই নিয়ানদের ব্যাপারটা বুঝতে পারবি।'

ভাইয়া ট্যাবে কিছু পিকচার বের করে দেখাতে লাগলেন। জমির চাচা, জাকির ভাইসহ বাকিরা হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। আমি একটু মাথা হেলিয়ে দেখার চেষ্টা করতে লাগলাম।
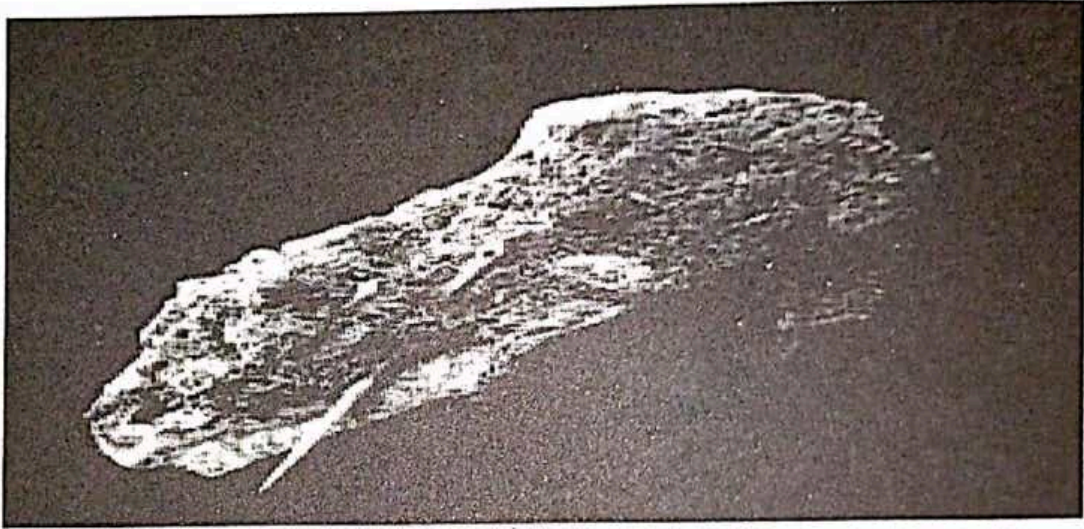
'এই দেখ, ২৬০০০ বছরের পুরোনো একটা সূচ। এটাই প্রমাণ করে নিয়ানডার্থালরা কাপড় বুনতে জানত।[২১৮]
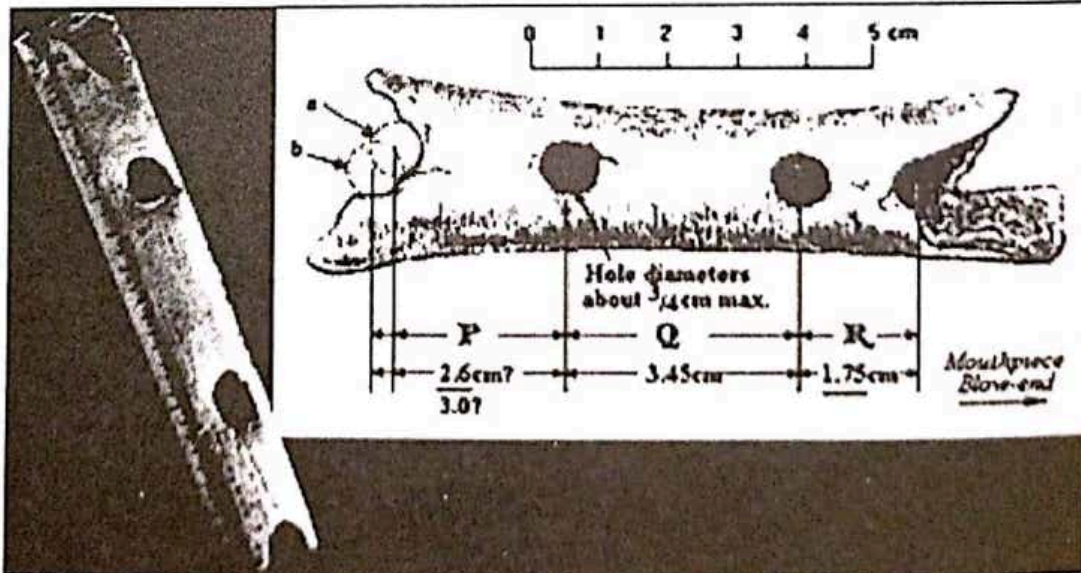
এরপরে দেখ, এটা হাড় দিয়ে তৈরিকৃত নিয়ানডার্থালদের ব্যবহৃত বাঁশি। এটা যেমন তেমন বাঁশি না। সঠিক হারমনিক হিসেবের বাঁশি। যেটা দিয়ে যেকোনো

[২১৮]. From Lucy to Language, page 99

স্কেলের সুর উঠানো যায়। সঙ্গিতত্ত্ববিদ বব ফিংক এই হাড়গুলোর রেড়িও কার্বন টেস্টিং করে জানান যে, এই বাঁশি তেতাল্লিশ হাজার বছর থেকে সাতষট্টি হাজার বছরের পুরোনো।[২১৯]
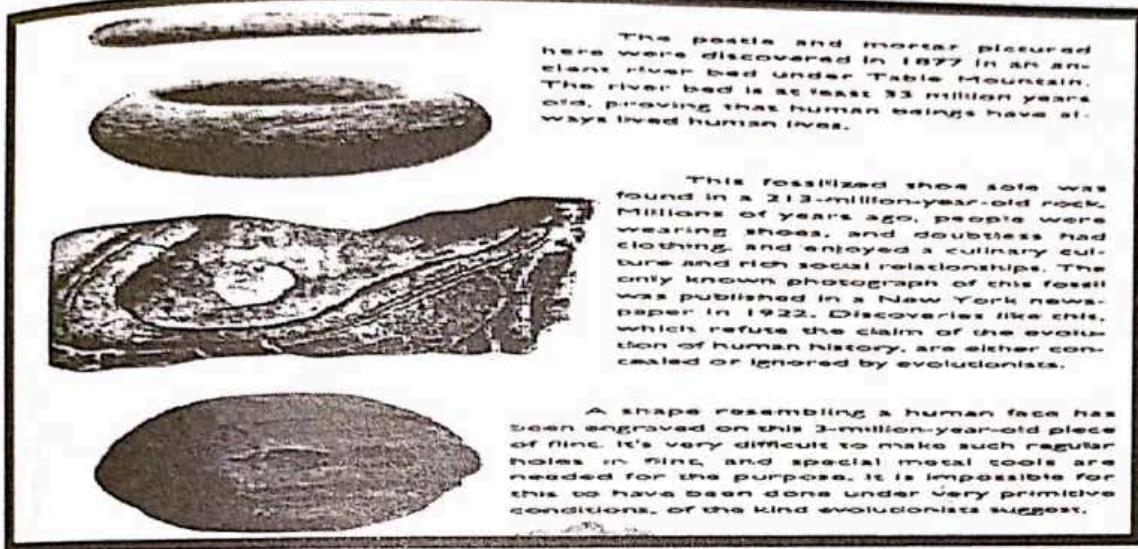
আবার এই ছবিটা দেখ, সবার ওপরের জিনিস দুটো হলো ৩৩ মিলিয়ন বছরের পুরোনো পাথরের তৈরি সরঞ্জাম। তার পরেরটা ২১৩ মিলিয়ন বছরের পুরোনো জুতোর সোল। আর শেষেরটা ৩ মিলিয়ন বছরের পুরোনো পাথরে খোঁদাই করা মানুষের মুখের শেপ। এই সকল প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন প্রমাণ করে যে, মানুষ মাত্র ১০০০০ বছরে সভ্য হয়নি বরং সৃষ্টির শুরু থেকেই সভ্য। সময়ের সাথে সাথে প্রযুক্তির উন্নয়ন হচ্ছে মাত্র।
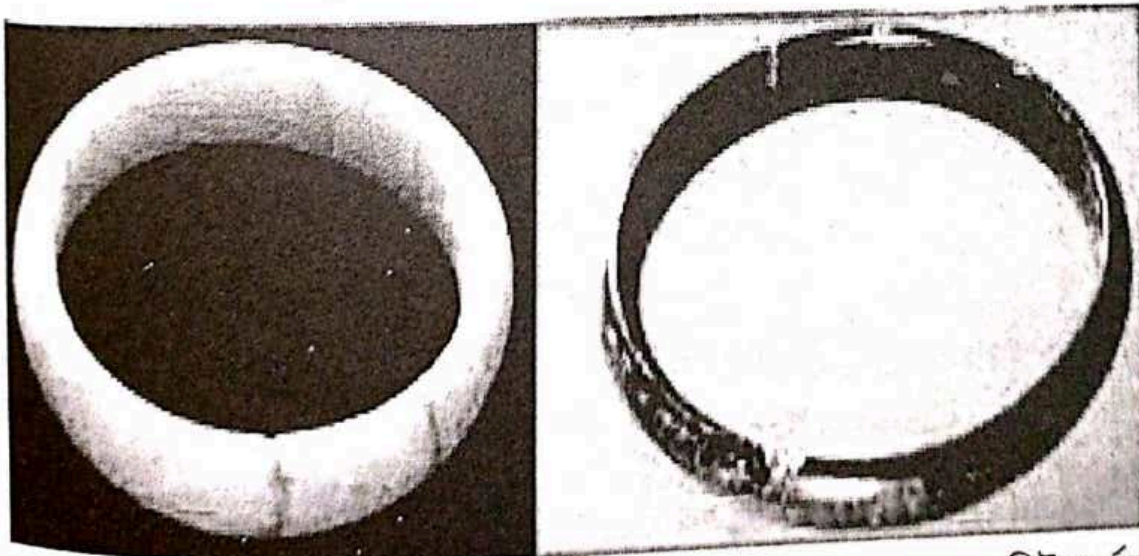
এর পরের ছবিটা দেখ। এই রিং দুটো হলো ৮৫০০ এবং ৯০০০ খ্রিষ্টপূর্বের সময়কার ব্রেসলেট। ডানপাশের ব্রেসলেটটি মার্বেলের তৈরি আর বামপাশেরটি

[২১৯]. The AAAS Science News Service, "Neanderthals Lived Harmoniously," April 3, 1997

ব্যাসাল্টের তৈরি। দুটোই অত্যধিক উচ্চ গলনাংকের কঠিন পদার্থ অর্থাৎ এগুলো গলানো কিংবা বাঁকা করার জন্য অনেক বেশি তাপ দরকার। এ ছাড়াও এগুলো কাটতে এবং বাঁকা করতে অবশ্যই স্টিলের ব্লেড এবং যন্ত্রপাতি লাগবে। বিবর্তনবাদীদের হিসেবে সেই সময়টা ছিল প্রস্তর যুগ। তারা পাথর ছাড়া অন্য কিছুর ব্যবহার জানত না। তাহলে তারা আগুন এবং যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেছিল কীভাবে? ব্রোঞ্জ-এর ব্যবহার লোহার থেকে অনেক বেশি কঠিন। তাহলে লৌহযুগ আসার আগে ব্রোঞ্জযুগ এলো কীভাবে?
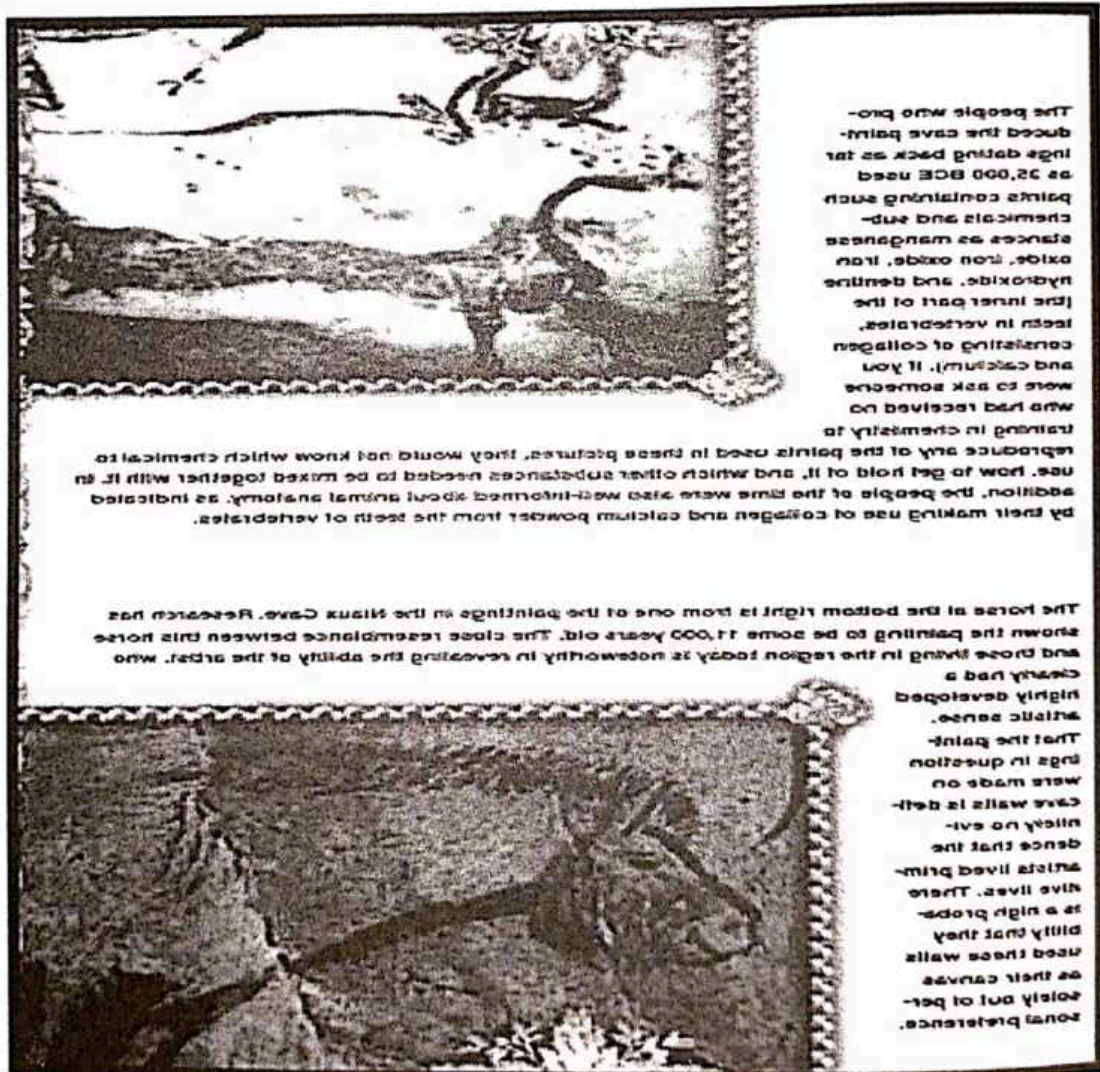
এর পরের পেন্টিংগুলো দেখ। এগুলো আঁকা হয়েছিল এখন থেকে প্রায় ২৭০০০ বছর আগে। এমন আরও অনেক পেন্টিং পাওয়া গেছে যেগুলোতে এমন কিছু কেমিক্যাল ব্যবহার করা হয়েছে, যা আজ পর্যন্ত পুনরায় প্রস্তুত করা সম্ভব হয়নি। এসকল তত্ত্ব ও নিদর্শন প্রমাণ করে, নিয়ানরা অসভ্য গুহামানব ছিল না বরং ছিল সভ্য মানুষ। *The OrDgin of Modern Humans* বইটির নাম শুনেছিস?'

'না।' বললেন জাকির ভাই।

ভাইয়া ট্যাবের স্ক্রিনটা বন্ধ করলে ট্যাব থেকে চোখ ফেরালে সবাই সোজা হয়ে বসল। ভাইয়াও একটা হাই তুলে, রিল্যাক্স মুডে আবার বলতে লাগলেন।

'১৯৯৩ সালে এই বইটি লিখেছিলেন রজার লিউয়িন। যেটা প্রকাশ করেছে সাইন্টিফিক আমেরিকান লাইব্রেরি।'

'নিউইয়র্ক?'

'হ্যাঁ, নিউইয়র্ক। বইটিতে তিনি সকল প্রকার প্রমাণাদি দিয়ে প্রমাণ করেন, নিয়ানডার্থালরা মানুষের আদি প্রজাতী নয় বরং আধুনিক মানুষেরই প্রজাতি। আর তারা অসভ্যও ছিল না। একেবারে লেটেস্ট তথ্য দিয়েছে নেচার।'

'কবে?'

'২০১৭ সালের জুন মাসে। মরক্কোতে হোমো সেপিয়েন্সের আরেকটি ফসিল পাওয়া যায়। এই ফসিল বিশ্লেষণ করে নেচার জানিয়েছে দশ হাজার বছর আগে নয়, প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ বছর আগেও হোমো সেপিয়েন্সের অস্তিত্ব ছিল।[২২০] একেবারে মরার ওপর খাড়ার ঘা যাকে বলে। এসকল তথ্য প্রমাণের পরেও তুই যদি বলিস বিবর্তনবাদের মাধ্যমে প্রাণীর উৎপত্তি হয়েছে! এভাবে বিবর্তিত হয়ে এপ থেকে আমরা এসেছি এক্ষেত্রে স্রষ্টার কোনো দরকার নেই, তাহলে আমার কিছুই বলার নেই। আমি শুধু সত্য উপস্থান করলাম। এবার তুই সিদ্ধান্ত নে, ডারউইনিজম ঠিক না ভুল।'

জোরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ওপর দিকে চোখ দুটো তুলে ক্ষীণ স্বরে বললেন,

'রাবিশ, মাই আন্সার টু ইউ, ইটস টোটাল রাবিশ!'

উত্তরটা শোনার পর আমরা সবাই হেসে উঠলাম।

---

২২০. https://www.nature.com/news/oldest-homo-sapiens-fossil-claim-rewrites-our-species-history-1.22114, https://www.nature.com/articles/546212a

তেতো কথা

মাগরিবের আজান হয়েছে। মুসল্লিদের আগমনে পুরো মসজিদ এখন মুখরিত। বাজার মসজিদ হওয়ায় মাগরিবের সময় মুসল্লিদের সংখ্যা একটু বেশিই হয়। আমরা নামাজের প্রস্তুতি নিলাম। এবার জাকির ভাই আর কাঁঠাল তলায় বসে থাকলেন না। ভাইয়াকে বললেন,

'তুই নামাজ পড়ে আয়, আমি বাজারে আছি। মাথাটা একটু ধরেছে, রিফ্রেশ করতে হবে। তোরা বের হলে ফোন দিস, একসঙ্গে যাব।'

'ভাইয়া কিছু না বলে, হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়াল।

নামাজের কাতারে আমরা তিন ভাই পাশাপাশি দাঁড়ালাম। ইমাম সাহেবের সুমিষ্ট তেলাওয়াত আর তেলাওয়াতকৃত আয়াতের ভাষ্যগুলো আমার হৃদয় ছুঁয়ে দিচ্ছিল। মানুষের ঈমান বাড়ে, আবার কমে। এই বাড়া-কমার আলামত বোঝা যায়। যখন ঈমানের লেভেল কিছুটা উঁচুতে থাকে তখন নামাজ, কুরআন তেলাওয়াত থেকে সব রকমের ইবাদতে এত প্রশান্তি লাগে যা, ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈমানের সর্বোচ্চ চূড়ায় ছিলেন বলেই ইবাদতে এত প্রশান্তি পেতেন যে, নামাজ পড়তে পড়তে পা ফুলে যেত। তারপরও পড়তেই থাকতেন। নামাজ শেষ হলে ইমাম সাহেব আমাদের কাছে এসে বসলেন। কুশল বিনিময় শেষে ভাইয়াকে উদ্দেশ্য করে বললেন,

'সরফরাজ, তোমাকে এ অবস্থায় পেয়ে আমার সত্যিই খুব ভালো লাগছে। সত্যি বলতে, তোমাদের মতো মেধাবীদের ইসলামে খুবই প্রয়োজন। হজরত উমর (রা.)-কে পেয়ে ইসলামের যেমন পুরো স্পিডটাই চেঞ্জ হয়ে গিয়েছিল,

তেমনি মেধাবীরা যখন ইসলামের দিকে ধাবিত হবে, ইসলামকে চর্চা করবে, ইসলামকে নিয়ে গবেষণা করবে তখন আমাদেরও সুদিন ফিরবে। আচ্ছা, আমার খুব জানতে ইচ্ছা করছে, যে তুমি আমাদেরকে বিভিন্ন প্রশ্ন করে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলতে, সেই তুমিই কীভাবে একই প্রশ্নগুলোর অসারতা প্রমাণ করছ?'

'ভাইয়া মুচকি হেসে বলল, আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহই আমাকে পথ দেখিয়েছেন। একটি চিঠিই আমার মোটিভ চেঞ্জ করে দিয়েছে। আমার করা বিভিন্ন প্রশ্নগুলোর তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করে মিরাজ আমাকে একটা চিঠি লেখেছিল। সেই চিঠিটা পড়ার পর আমার চিন্তার রাজ্যে আলোড়ন সৃষ্টি হলো। আর স্থির থাকতে পারলাম না। সত্য উৎঘাটন করার জন্য আদাজল খেয়ে লেগে পড়লাম। সরাসরি কুরআন অধ্যয়ন শুরু করলাম। বিভিন্ন তাফসির বিশেষ করে বিজ্ঞান সম্পর্কিত তাফসিরগুলো পড়ে ফেললাম। আমি আরবি জানতাম না। তাই আরবি ভাষার ওপর একজন বিজ্ঞ আলেমের কাছে প্রশিক্ষণ নিলাম। পাশাপাশি বিজ্ঞান সম্পর্কে পড়াশোনাও চালিয়ে গেলাম। আস্তে আস্তে নাস্তিকতার যত অপবিজ্ঞান আর চাতুরি আছে তা হাতে নাতে ধরা পড়তে থাকল।

ওপরন্তু দেখতে পেলাম, আমরা যাদের আদর্শে পথ চলছিলাম তারা নিজেরাই ছিলেন অন্ধকার জগতের মানুষ। শুধু কমিউনিজমকে মেনে না নেওয়ায় তারা লক্ষ লক্ষ মানুষ হত্যা করেছে। জরিপ অনুযায়ী শুধু ৫ বছরে কমিউনিস্ট লিডাররা নির্বিচারে হত্যা করেছে ১৮৬০০০০ মানুষ। যাদের মধ্যে ৬০০০ জন শিক্ষক এবং অধ্যাপক, ৮৮০০ জন ডাক্তার এবং মেডিসিন বিশেষজ্ঞ, ৫৪০০০ জন আর্মি অফিসার, ২৬০০০০ জন সৈনিক, ১০৫০০০ জন পুলিশ অফিসার, ৪৯০০০ জন সশস্ত্র পুলিশ, ১২,৮০০ জন সিভিল কর্মকর্তা, ৩৫৫০০০ জন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, ১৯২০০০ জন সাধারণ শ্রমিক, ৮১৫০০০ জন কৃষক।[২২১] দুর্ভিক্ষে ১৯২১/১৯২২ সালে মারা যায় প্রায় ৫২০০০০০ জন মানুষ। The great leap forward নীতির কারণে মাত্র ৪ বছরে মারা যায় ৪৫ মিলিয়ন মানুষ।[২২২]

বিপ্লবীদের মধ্যে চে গুয়েভারা মুখোশের আড়ালে লুকিয়ে থাকা এক নির্দয় খুনি, ধর্ষক। সে এতই নির্দয় ছিল যে, শুধু হত্যা ধর্ষণে শান্ত হতো না। প্রসূতি নারীদের পেটে গুলি করে সন্তান এবং মা উভয়কে একত্রে হত্যা করত।[২২৩]

---

২২১. https://www.deathofcommunism.com/communism-with-the-mask-off/

২২২. https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/books/news/maos-great-leap-forward-killed-45-million-in-four-years-2081630.html

২২৩. (1) http://www.independent.org/newsroom/article.asp?id=1535

মাও সে তুং, পলপট; এরা লাখো মানুষ হত্যা করেছে। নিজেদের স্বার্থের জন্য আন্দোলনের নামে ডাকাতি করে হাতিয়ে নিয়েছে কোটি কোটি টাকা। স্ট্যালিন স্টেট ব্যাংকে বোমা মেরে বহু মানুষকে হতাহত করে ২৫০০০০ রুবল একদিনেই পাঠিয়ে দেয় সুইজারল্যান্ডে।[২২৪] কিন্তু এসবের জন্য তারা অনুতপ্ত হতো না। তাহলে কোথায় আমাদের নৈতিকতা? দেখতে পেলাম তথাকথিত মানবধর্মে নৈতিকতা আসলে আপেক্ষিক। একজনের কাছে যা নৈতিক অন্যজনের কাছে তা অনৈতিক। কোনটা নৈতিক কোনটা অনৈতিক তা বিচার করবে কে?

'একারণেই আমাদের জন্য একজন সুপিরিয়র বিচারক আছেন আল্লাহ সুবহানু ওয়া তাআলা। যিনি শতভাগ নৈতিক বিচার কাঠামো তৈরি করে দিয়েছেন। মানুষ মানুক না মানুক, এই বিচার কাঠামোই শতভাগ শুদ্ধ।' বললেন ইমাম সাহেব।

ভাইয়া বললেন, 'জি মুহতারাম। ব্যাপারটা আমি বুঝেছি। কিন্তু বুঝতে অনেক দেরি করে ফেলেছি। মানবতার নামে মানব ধর্ম নয় বরং আল্লাহ প্রদত্ত ধর্মে রয়েছে সকল মানবতা। আজকের মানুষ নিজের বানানো মানবনীতির ফল ভোগ করছে। যেমন, মানবতাবাদী ইউনিসেফ-এর কর্মকাণ্ডও হৃদয় বিদারক।'

'কিন্তু আমরা তো জানি, ইউনিসেফ খুব ভালো ভালো কাজ করে।' আশ্চর্য হয়ে জানতে চাইলেন ইমাম সাহেব।

'জি, ভালো ভালো কাজ করে। কিন্তু ভালো কাজের জন্য মন্দ বিনিময় নিচ্ছে আমাদের চোখে ধূলি দিয়ে। রাতের আড়ালে করে চলছে ধর্ষণ। নারীদেহের বিনিময়ে সাহায্যের খেলা খেলে যাচ্ছে ইউএন কর্মকর্তারা। ইউএন-এর ইমার্জেন্সি কো-অর্ডিনেশন সেন্টারের চিফ অ্যান্ড্রিউ ম্যাকলিউডের রিপোর্ট অনুযায়ী বেশিরভাগ ধর্ষিতা আত্মসম্মান রক্ষার্থে ধর্ষণের কথা স্বীকার করে না। তবুও ইউএন-এর ৩৩০০ কর্মী দ্বারা ৬০০০০ ধর্ষণের ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে।[২২৫] ১৪ বছরের একটি মেয়ে তার কোলের সন্তান দেখিয়ে বলে, মাঝে মাঝে আমি যখন একা থাকি, তখন ইচ্ছা হয় আমার সন্তানকে হত্যা করে ফেলি। কারণ, তাকে দেখলে আমার ধর্ষকের কথা মনে পড়ে। চিন্তা করুন ১৪ বছরের মেয়ে!

---

(2) http://listverse.com/2009/05/24/top-10-things-you-didnt-know-about-che-guevara/
(3) The Bloody History of Communism
https://www.youtube.com/watch?v=3pzMHD0F4yQ&app=desktop

২২৪. https://www.deathofcommunism.com/communism-with-the-mask-off/

২২৫. http://www.thetimes.co.uk/article/un-staff-responsible-for-60-000-rapes-in-a-decade- c627rx239

একই ঘটনা ঘটেছে ১২ বছরের মেয়ের সঙ্গে। সামান্য কিছু খাদ্য এবং টাকার জন্য ধর্ষণের স্বীকার হয় নারী ও শিশুরা। একটি জরিপে অংশগ্রহণকারী ৫ জনের মধ্যে ৪ জন মেয়ে স্বীকার করেছিল তাদেরকে ধর্ষণের বিনিময়ে দেওয়া হয়েছিল মাত্র ৪ ডলার। কারও কারও স্বীকারোক্তিতে মাত্র ৫০ সেন্ট দেওয়া হতো।[২২৬] হাইতির অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে ফবি গ্রিনউড বলেন, ২০১০ সালে ভয়াবহ ভূমিকম্প ঘটে যাওয়ার কিছুদিন পর আমি পোর্ট-অ-প্রিন্সে যাই। এত বিভীষিকাময় ঘটনা আমি আর দেখিনি। মিলিয়ন মিলিয়ন মানুষ গৃহহারা হয়। ২২০০০০-এর বেশি মানুষ মারা যায়। ৩০০০০০-এর বেশি মানুষ মারাত্মক আহত হয়। এমন অবস্থার মধ্যেও প্রতিরাতে ঘটছিল অগণিত ধর্ষণের ঘটনা। এমনকি নিজেদের কর্মকাণ্ড চালিয়ে যেতে দখল করে নেয় দুস্থদের জন্য বরাদ্ধকৃত তাবু।[২২৭]

এরকম বহু ঘটনা লোকচক্ষুর অন্তরালে ঘটে যাচ্ছে দিনের পর দিন। বাংলাদেশি ইউএন কর্মকর্তারাও প্রতিনিয়ত ঘটিয়ে যাচ্ছেন এমন ন্যাক্কারজনক কর্মকাণ্ড।[২২৮] এই সম্পর্কে তৎকালীণ ইউএন সেক্রেটারি জেনারেল বান কি মুন বলেন, "A cancer in our system" কিন্তু কর্মকর্তরা এই ঘটনা অনৈতিক মনে করছে না। বরং তারা বলছে, "Those are not Rape but as transactional sex, in which acts are exchanged for money or food!"[২২৯]

এই যদি হয় অবস্থা তাহলে আমাদের নৈতিকতার সংজ্ঞাটা আসলে কী? এই সবকিছু চিন্তা করে পরক্ষণে বুঝতে পারলাম, মিথ্যার অন্ধকারে এমন ডুব দিয়েছি যে, সত্যের উজ্জ্বল দীপ্তিকে চিনতে পারার ক্ষমতাও আমার লোপ পেয়েছে। অবশেষে আলহামদুলিল্লাহ, সত্যকে গ্রহণ করতে পেরেছি।'

ইমাম সাহেব ভাইয়ার পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, জাজাকাল্লাহু খাইরান, এমন অজানা তথ্য দেওয়ার জন্য। আর শোনো, ইমাম মুসলিম তাঁর সহিহ হাদিসগ্রন্থে তওবা অধ্যায়ে একটি হাদিস নিয়ে এসেছেন। আবু হুরাইরা (রা.) বর্ণনা করেছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে— "একজন পথভ্রষ্ট বান্দা যখন নিজের ভুল বুঝতে পেরে আল্লাহর দিকে ফিরে আসে তখন আল্লাহ ঠিক ততটাই খুশি হন;

---

[২২৬]. http://www.washingtonpost.com/sf/world/2016/02/27peacekeepers/?utm_term=.b7635d9436

[২২৭]. http://www.theguardian.com/global-debelopment/2018/feb/13/aid-worker-haiti-quake-debauchery-shoking?CMP=fbgu

[২২৮]. http://www.dhakatribune.com/bangladesh/2016/01/30/bangladeshi-un-troops-accused-of-sexual-abuse/

[২২৯]. http://www.washingtonpost.com/sf/world/2016/02/27peacekeepers/?utm_term=.b7635d9436

একজন ব্যক্তি মরুভূমিতে তার একমাত্র বাহন হারিয়ে যাওয়া উটকে আবার ফিরে পেয়ে যতটা খুশি হয়।”[২৩০] তোমার এই প্রত্যাবর্তনে আমরা যতটা না খুশি হয়েছি তার চেয়ে বেশি খুশি হয়েছেন মহান আল্লাহ। কুরআনে সূরা বাকারায় আল্লাহ বলেন— “যারা ঈমান এনেছে এবং সৎ কাজ করেছে তারাই জান্নাতের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।” যাহোক, তোমাদের সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ থাকতে পারলে ভালো লাগত কিন্তু আমাকে একটু ফজলের বাড়িতে যেতে হবে। লোকটার ভীষণ অসুখ। হাসপাতালে নিয়ে যাবে। তার আগে একটু খোঁজ-খবর নেওয়া দরকার। একটু দেখে আসি। বারাকাল্লাহ ফিহ।’

ইমাম সাহেবের চলে যাওয়ার পথে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকলাম। মনে একটা প্রশান্তির ছোঁয়া লেগে গেল। ইমাম তো এমনই হওয়া উচিত। যিনি মিথ্যা বানোয়াট কিচ্ছা কাহিনি না বলে, কুরআন-হাদিসের দলিল দিয়ে মানুষকে আল্লাহর দ্বীন বুঝাবেন। তা ছাড়া শুধু মসজিদেরই দায়িত্ব পালন করবেন না, সামাজিক দায়িত্বগুলোও সুন্দরভাবে পালন করবেন।

মসজিদের গেট থেকে বের হয়েই পেয়ে গেলাম জাকির ভাইকে। তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। আমাদেরকে দেখে তিনি আবারও বলে উঠলেন,

‘নামাজ পড়তে তোদের এত সময় লাগে কেন? লোকজন সব সেই কখন বের হয়েছে।’

ভাইয়া বলল, ‘হয়েছে, হয়েছে, এখন তো বের হয়েছি। চল, পুকুরপাড়ে গিয়ে বসি। কতদিন হলো সেদিকে যাই না।’

আমি আর আবরার থমকে দাঁড়ালাম। দুইবন্ধু পুকুরপাড়ে যাচ্ছে, পারসোনাল অনেক কথাই তাদের মধ্যে হতে পারে। সেখানে আমাদের দুজনের যাওয়া কি উচিত হবে?

ভাইয়া আমাদের ভাবগতি বুঝতে পেরে বলল, ‘কিরে, তোরা দাঁড়ালি কেন? আয়, কোনো সমস্যা নেই।’

এটি অনেক পুরোনো পুকুর। শুনেছি ইংরেজ আমলে নাকি কোনো এক জমিদার এটি খনন করেছিল। বেশ খান্দানি করে শানও বেঁধেছে। কিন্তু এখন আর তাদের

---

২৩০. সহিহ মুসলিম (ইফা), হাঃ ৬৭০০

সোনালি দিন অবশিষ্ট না থাকায় পরিত্যক্ত অবস্থায় আছে। উপজেলা পরিষদ এটার তত্ত্বাবধান করে। বসন্তকাল হওয়ায় অনেক নতুন সিঁড়ি জেগেছে। সেগুলোর শেওলা আর পিচ্ছিলভাব এখনও যায়নি। আমরা ওপর দিকের একটা সিড়িঁতে বসলাম। মধ্যেখানে জাকির ভাই আর ভাইয়া, তাদের দুইপাশে আমরা দুইভাই।

ভাইয়া বললেন, 'ফজল চাচার কী অসুখ হয়েছে রে?'

বললাম, 'অ্যাপেন্ডিসাইটিসের ব্যথা। অনেকদিন ধরেই ভোগাচ্ছে, এখন সেটারই অপারেশন করাবে।'

কী একটা ভেবে জাকির ভাইয়ের চোখদুটো যেন জ্বলজ্বল করে উঠল। চাঁদের স্নিগ্ধ আলোয় তার মুখখানি বেশ উজ্জ্বল মনে হলো। উচ্ছসিত কণ্ঠে বলে উঠল, অ্যাপেণ্ডিক্স, খুব ভালো একটা পয়েন্ট মনে করে দিয়েছিস তো!'

'কীসের পয়েন্ট?'

'সরফরাজ, আমার জানামতে মিউটেশনের ফলে ম্যাক্রো-ইভ্যলুশন হয়ে যদি প্রজাতি পরিবর্তন হয়, তাহলে শেষ প্রজাতিতে এমনকিছু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থাকে, যেগুলো কোনো কাজে আসে না। আর এসব অকেজো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হচ্ছে পূর্ববর্তী প্রজাতির চিহ্ন। এমন অকেজো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মানুষের শরীরে আছে। যেমন- অ্যাপেণ্ডিক্স। এটার কোনো কাজ নেই।'

ভাইয়া বেশ কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন, 'হুম, তোর কথায় লজিক আছে। তবে এটা পুরোনো যুক্তি। একসময় বিবর্তবাদীরা দেখল, অ্যাপেণ্ডিক্স মানুষের কোনো কাজে আসে না। বিবর্তনবাদীদের খুশি আর দেখে কে? আল্লাহর বিরুদ্ধে একটি অভিযোগের সুযোগ পেয়ে তারা কোনোভাবেই হাতছাড়া করতে চাইল না। হইচই শুরু করে দিলো। স্রষ্টাই যদি আমাদেরকে সৃষ্টি করে থাকেন, তাহলে স্রষ্টার মেকানিজমে ভুল থাকবে কেন? আমাদের শরীরে অ্যাপেণ্ডিক্সের মতো অপ্রয়োজনীয় অর্গান কেন থাকবে? শুধু কি তাই, এই অর্গান মানুষের অ্যাপেণ্ডিসাইটিসের সমস্যার জন্যও দায়ী। মিডিয়ার কল্যাণে রাতারাতি ভিলেন খেতাব দেওয়া হলো অ্যাপেণ্ডিক্সকে।'

আবরার বলল, 'ঠিক বলেছ ভাইয়া। আমি জাফর ইকবাল স্যারের বইয়েও এটা পড়েছি। তিনি *আরও একটুখানি বিজ্ঞান* বইয়ে অ্যাপেণ্ডিক্সকে মানবদেহের ডিজাইনগত সমস্যা বলেছেন। তিনি বিভিন্ন দিক বর্ণনা দেওয়ার পর বলেন,

"যে জিনিসটার কোনো ব্যবহার নেই, যার একমাত্র কাজ হচ্ছে হঠাৎ করে ইনফেকশান হয়ে মানুষের জীবনে একটা বিপদ ঘটানো, সেটাকে পেটের ভেতর রেখে দেওয়ার পেছনে যুক্তি কোথায়? সমালোচকরা যদি এর সমালোচনা করে তাহলে তাদের কি দোষ দেওয়া যায়?"'[২৩১]

ভাইয়া বলল, 'আমি যদি ওনার দেখা পেতাম, তাহলে বলতাম, না স্যার। সমালোচকদের দোষ দেবো কেন? আপনাদের কাছেই আমরা শিখি। কিন্তু স্যার, দুদিন পরপর পরিবর্তিত সিদ্ধান্তের ওপর ভিত্তি করে এমন কিছুকে ভিত্তিহীন বলা কি দোষ হবে না, যার কোনো পরিবর্তন নেই? এমন সমালোচকের সমালোচনায় সময় দেওয়া উচিত হবে কি, যাদের সমালোচনা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অসম হয়ে যায়?'

'ঠিক।' বেশ উচ্ছসিত কণ্ঠে বলল আবরার।

'আচ্ছা, আমরা আপাতত ওদিকে না যাই। সমালোচনার আলোচনা পরিবর্তন হতে খুব বেশি দিন সময় লাগেনি। কিছু দিনের মধ্যেই সেই অ্যাপেণ্ডিক্সই হয়ে গেল সাইলেন্ট হিরো।'

'ভিলেন থেকে সাইলেন্ট হিরো? দারুন ইন্টারেস্টিং তো!' চোখ বড়ো বড়ো করে বলল আবরার।

'আরে শুধু অ্যাপেণ্ডিক্স নয়, আরও অনেক অর্গান আছে যেগুলোকে বিবর্তনবাদীরা অপ্রয়োজনীয় বলে নিজেদের থিওরি প্রমাণে কাজে লাগিয়েছিল। পরে দেখা গেল, সেগুলো তো অপ্রয়োজনীয় নয়ই বরং পাওয়ারফুল বডিগার্ড। যেমন-
টনসিল : যাকে বলা হতো মূল্যহীন অঙ্গ। অথচ, এই দুটো ছোটো গ্ল্যান্ডস গলা, কণ্ঠনালিতে বিভিন্ন ইনফেকশন হওয়া থেকে রক্ষা পেতে সাহায্য করে।

অ্যাপেণ্ডিক্স : যাকে বলা হতো অকেজো অঙ্গ। অথচ, এটি কোলনে গ্যাসট্রোইনটেস্টিনাল সমস্যা হওয়া থেকে রক্ষা পেতে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে। আবার এটা আমাদের প্রয়োজনীয় ব্যাকটেরিয়ার আবাসস্থল। যাদের অ্যাপেণ্ডিক্স নেই তাদের সিউডোমেমব্রেনাস কোলাইটিস নামক রোগ বেশি হয়। ১৯৭১ সালে মার্চ-এর *সায়েন্স নিউজ* ম্যাগাজিনে টনসিল এবং অ্যাপেণ্ডিক্সকে গার্ড অব হিউম্যান বডি বলা হয়।

---

[২৩১]. আরও একটুখানি বিজ্ঞান, মুহাম্মদ জাফর ইকবাল, পৃ : ৮৮

থাইরয়েড গ্ল্যান্ড : স্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠার জন্য থাইরোক্সিন হরমোন খুব গুরুত্বপূর্ণ। কম বা বেশি সাপ্লাই স্বাভাবিক বৃদ্ধির মাত্রা নষ্ট করে দেয়। থায়রয়েড গ্ল্যান্ড এই থাইরক্সিন হরমোন সংরক্ষণ করে। কোষের শক্তিঘর মাইটোকন্ড্রিয়াকে শক্তি যোগায়।

এ ছাড়াও, থাইমাস, পিনিয়াল গ্ল্যান্ড, কক্কিক্সসহ এরকম আরও অনেক অঙ্গকেই অকেজো এবং মানব শরীরের ডিজাইনগত ভুল বলা হতো। এদের মতো পিটুইটারি, চোখের সেমিলুনার ফোল্ড, কানের ভেতরের ছোটো ছোটো মাংসপেশি, ইত্যাদি অঙ্গানু দিয়েও ভেস্টিজিয়াল থিউরি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা কম করা হয়নি। পরবর্তীকালে প্রমাণ হয় এগুলো সবই অতি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।[২৩২] *ইনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকাতে* বলা হয়েছে, "Many of the so-called vestegial organs are now known to fulfill important functions." এমনকি তারা এটাও বলত যে, মানুষের DNA-এর ৯৮% বেস নাকি অকেজো। যেগুলো কাজে আসে না।'

'কেন?' আবরার প্রশ্ন করল।

'তাদের মতে বিবর্তিত হতে হতে ৯৮% DNA বেস আমদের শরীরে নন ফাংশনাল হয়ে থেকে গেছে, কিন্তু এদের কোনো কাজ নেই।[২৩৩] গুরু ডকিন্স এই ব্যাপারে একটা বইও লিখেছেন *The selfish Gene* নাম দিয়ে।'

'আসলেই কি ৯৮% DNA বেস অকেজো?' আবারও জানতে চাইল আবরার।

'আরে নাহ। এখন দেখা গেল DNA বেস অকেজো তো নয়ই বরং খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিখ্যাত ম্যাগাজিন *সাইন্টিফিক আমেরিকা* একটি আর্টিকেল ছাপিয়েছে What is junk DNA, and what is it worth নামে।[২৩৪] সেখানে তারা দেখিয়েছেন, ৭৫% DNA ট্রান্সক্রিপ্ট হয়ে mRNA তে রুপান্তরিত হয়। এ ছাড়াও তাদের আছে নানান রকমের ফাংশনাল কাজ।'

'তাহলে এসব বিবর্তনবাদের পক্ষে প্রোপাগান্ডা মাত্র?' আবরার বলল।

'তো আর বলছি কি! বিবর্তনবাদের পক্ষে এরকম প্রোপাগ্যান্ডা আগেও কম হয়নি।

---

২৩২. S.R. Scadding, 'Do 'Vestigial Organs' Provide Evidence for Evolution?" Evolutionary Theory, p. 394.

২৩৩. What is Junk DNA? (2010). Retrieved February 13, 2016, from http: //www.newsmedical.net/health/What-is-Junk-DNA.aspx

২৩৪. https://www.scientificamerican.com/article/what-is-junk-dna-and-what/
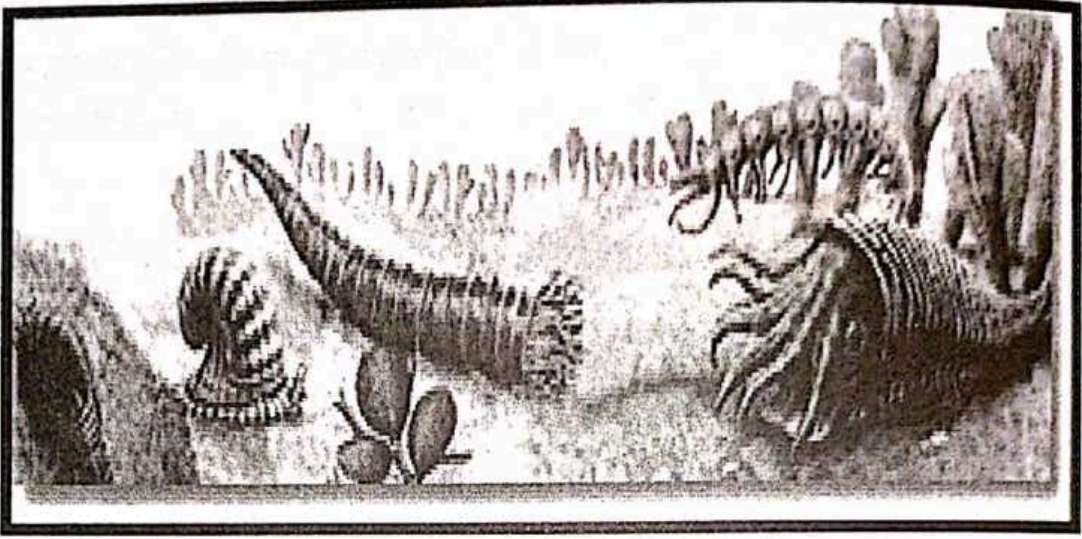
এই ছবটি দেখ, এটা হলো বিবর্তনবাদ প্রমাণের জন্য ক্যাম্ব্রিয়ান এজ-এর কাল্পনিক এনচেস্টরের ছবি, যা হাতে আর্ট করা। এর সঙ্গে বিজ্ঞানের কোনো সম্পর্ক নেই।
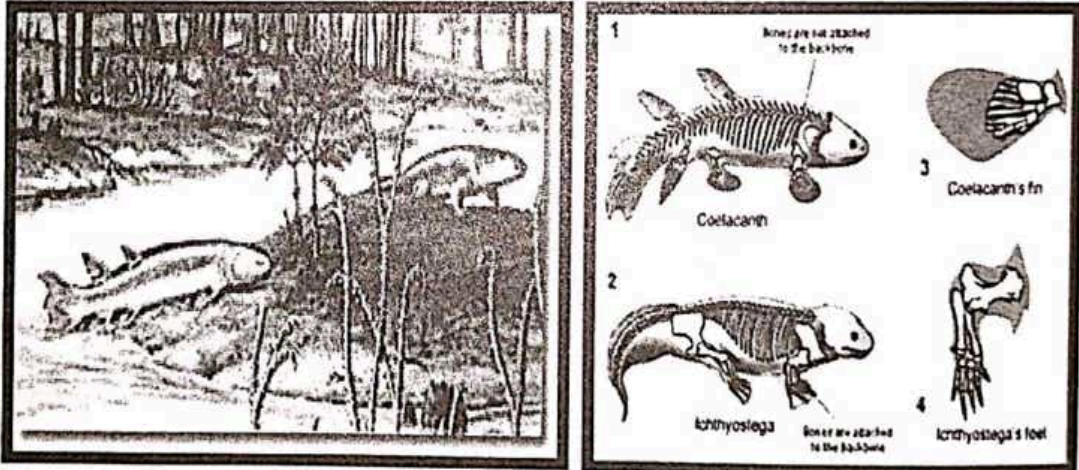
এরপরে এই ছবিটা দেখ। এটা হলো জলজ থেকে স্থলজ প্রাণীতে রুপান্তরিত হওয়ার মধ্যবর্তী পর্যায় হিসেবে মনের মাধুরি মিশিয়ে অঙ্কিত ছবি। অথচ বাস্তবে এমন কোনো প্রমাণ নেই।
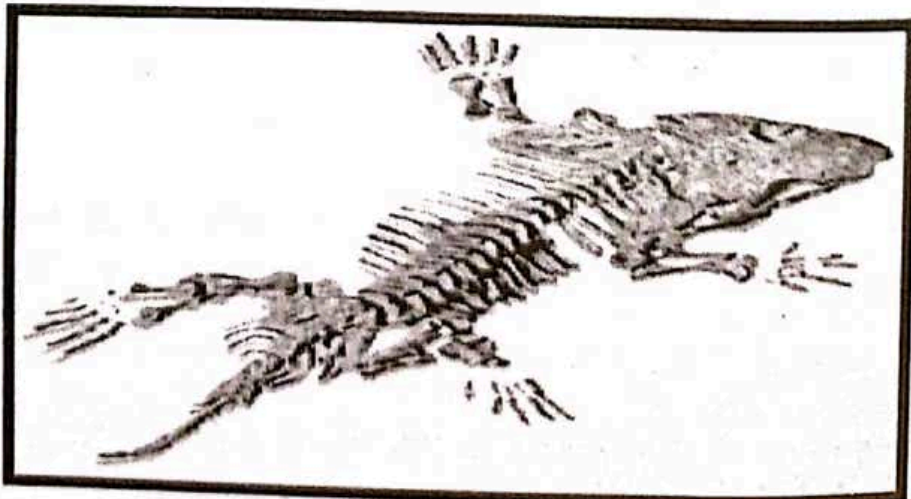
সিমোরিয়া ফসিল

এই Seymouria ফসিলকে ঢাকঢোল পিটিয়ে উভয়চর (amphibians) এবং সরীসৃপ (reptiles)-এর পূর্বপুরুষ হিসেবে প্রচার করা হয়। পরে reptile fossil পাওয়ার পর দেখা যায়, Reptile পৃথিবীতে আছে Seymouria-এর ৩০ মিলিয়ন বছর আগে থেকে।
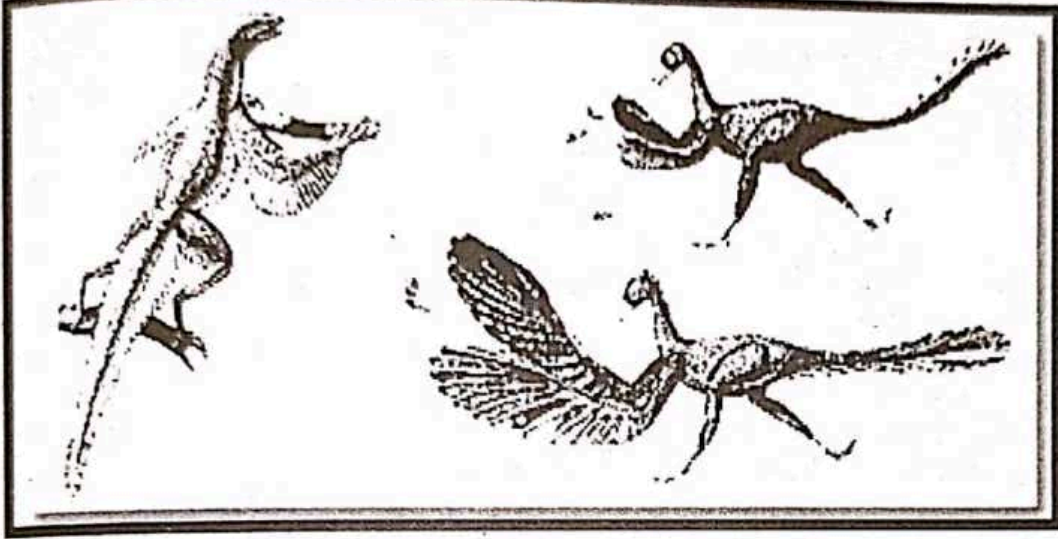
এই যে একটা ছবি দেখছিস, এখানে দেখানো হয়েছে বাম পাশের উভচর বিবর্তনের মাধ্যমে নাকি ডানপাশের পাখিতে পরিণত হয়েছে। নিজের ভ্রষ্ট কল্পনাকে রংতুলিতে একে প্রমাণ হিসেবে চালিয়ে দিয়েছে।
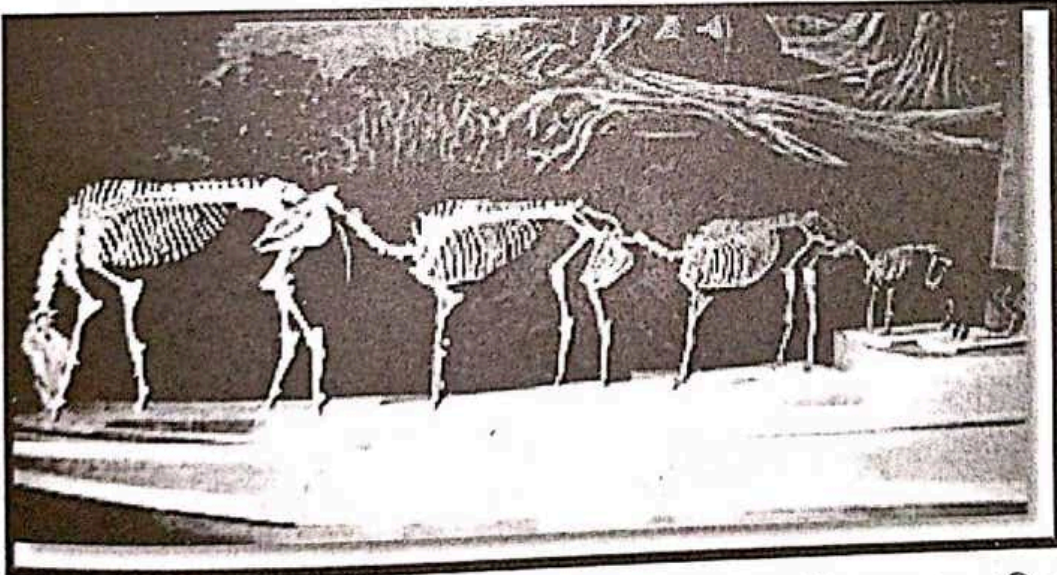
এই হাস্যকর ছবিটা দেখ। নিজের হাত দিয়ে কিছু কাল্পনিক কঙ্কাল বানিয়ে তারা দাবি করেছে এগুলো নাকি ঘোড়ার মধ্যবর্তী পর্যায়। কিন্তু বাস্তবে এগুলোকে বড়োজোড় ভালো শিল্পরূপ বা কারুশিল্প বলা যেতে পারে বই কিছু নয়। শিল্পীর কাল্পনিকরূপ আর বিজ্ঞানের মধ্যে যে যোজন যোজন মাইল পার্থক্য আছে এটা মনে হয় তারা গুলিয়ে ফেলেছিল।
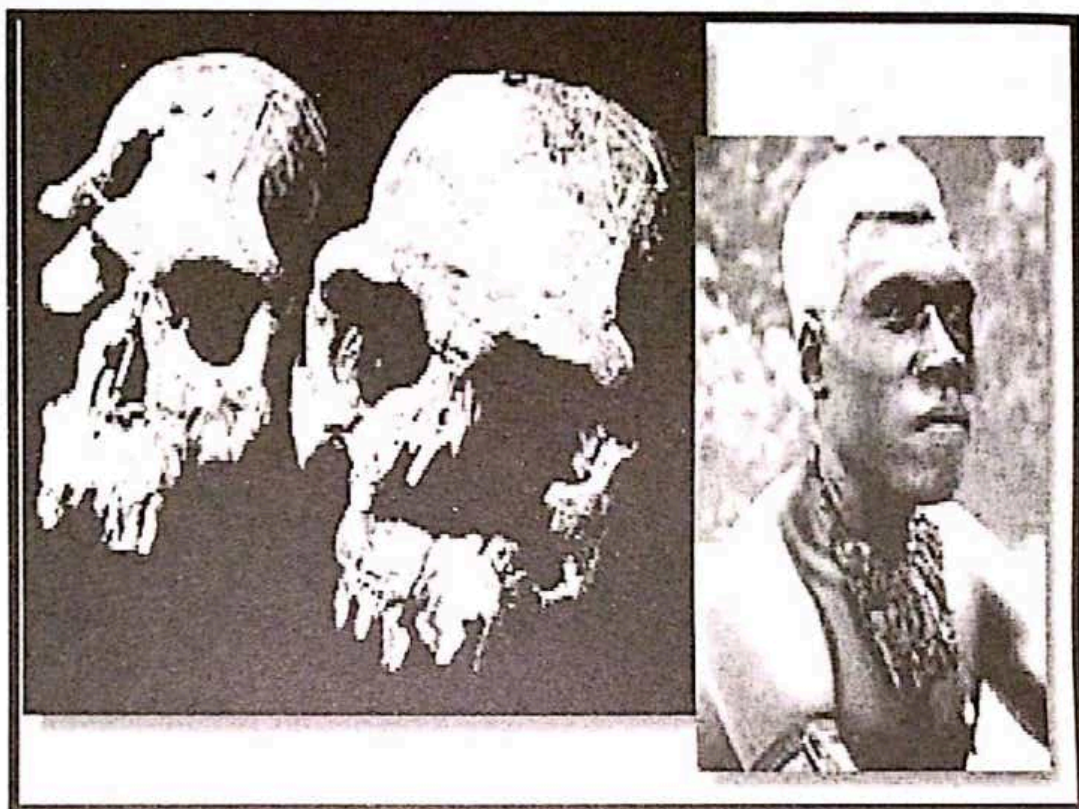
এবার এই ছবিটির বাম পাশের ফসিলটি দেখ। বিবর্তনবাদীরা এগুলোকে মানুষের মধ্যবর্তী পর্যায় বলে ঘটা করে প্রচার করে। কেননা, এই খুলিগুলোর চোখের ভ্রু অনেক উঁচু। ডান পাশের মানুষটি দেখ। এই ধরনের উচ্চ ভ্রুবিশিষ্ট মানুষ এখনও পৃথিবীতে বর্তমান আছে যারা মালয়েশিয়াতে থাকে। হা হা হা...
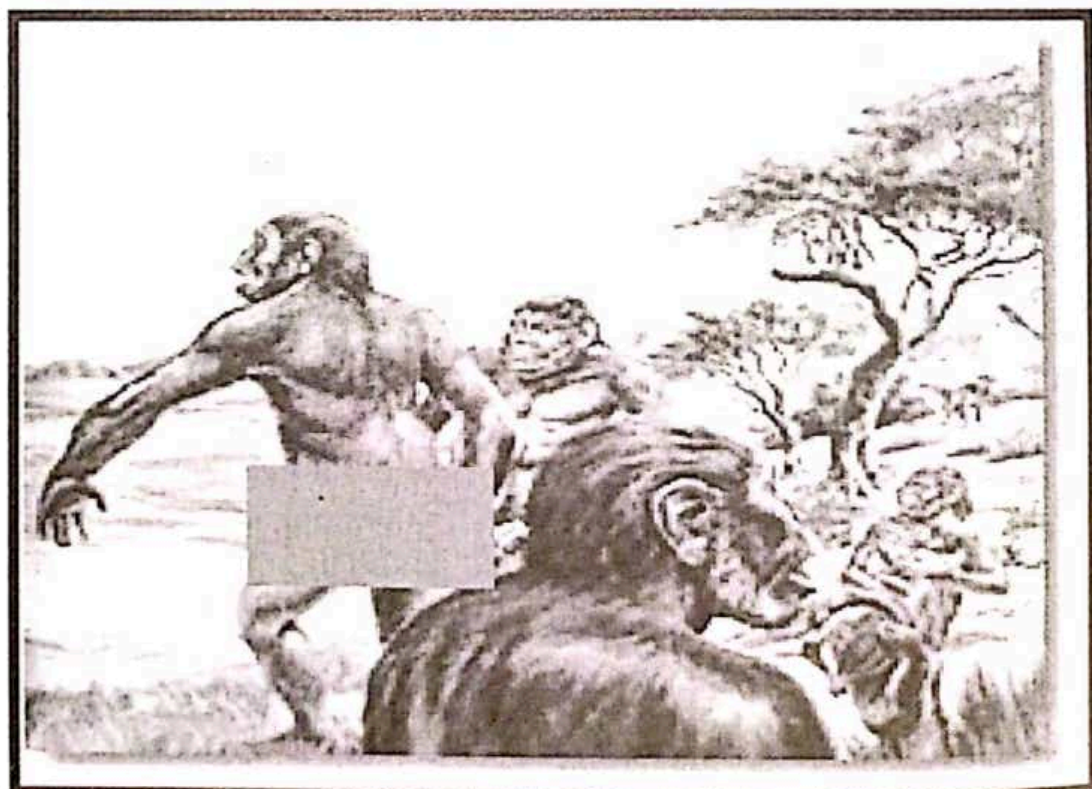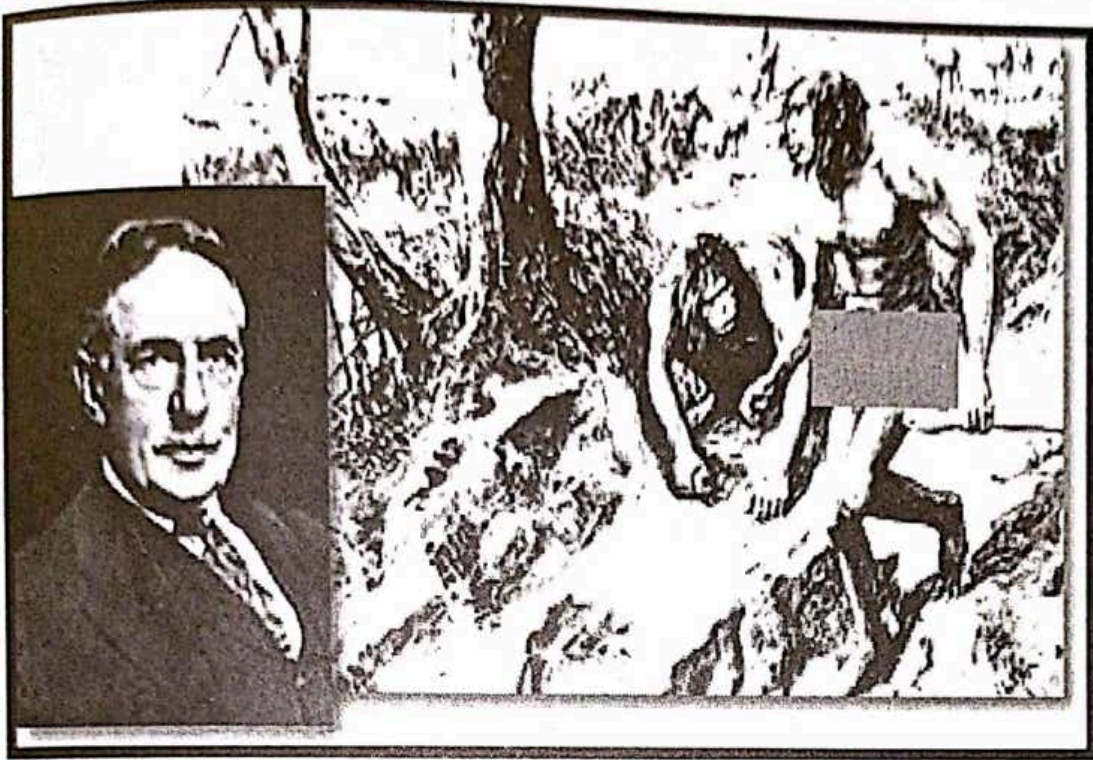
এই ছবি দুটো দেখ, এই ছবিগুলোকে নিজের হাতে আর্ট করে মানুষের মধ্যবর্তী পর্যায় বলে চালিয়ে দিয়েছে হেনরি ফায়ারফিল্ড নামক এই ভদ্রলোক। বেশ কল্পনাশক্তি আছে লোকটার, কি বলিস? আর আর্টের হাতও বেশ চমৎকার।'

আমি আর হাসিটাকে কন্ট্রোল করতে পারলাম না। শিল্পীর বিচিত্রপূর্ণ কল্পনা আর বিজ্ঞান যে এক জিনিস না এটা তারা বেমালুম ভুলে গেছে। ঈষৎ হেসে ভাইয়ার কথায় মনোযোগ দিলাম।
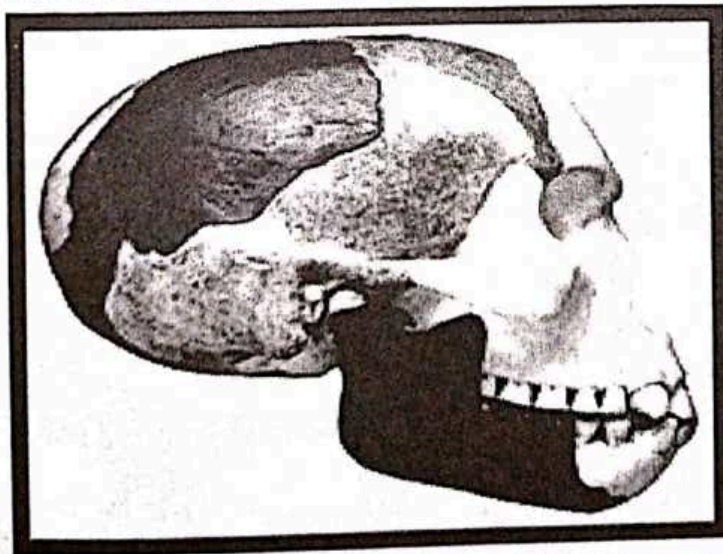
'এই খুলিটাকে দেখ। এইটার নাম Piltdown. বিবর্তনবাদীরা এটাকে ৪০ বছর ধরে মানুষের মধ্যবর্তী অবস্থা হিসেবে প্রচার করেছে। পরে যা হওয়ার তাই হলো। বৈজ্ঞানিকভাবে ভুয়া বলে প্রমাণিত হলো।
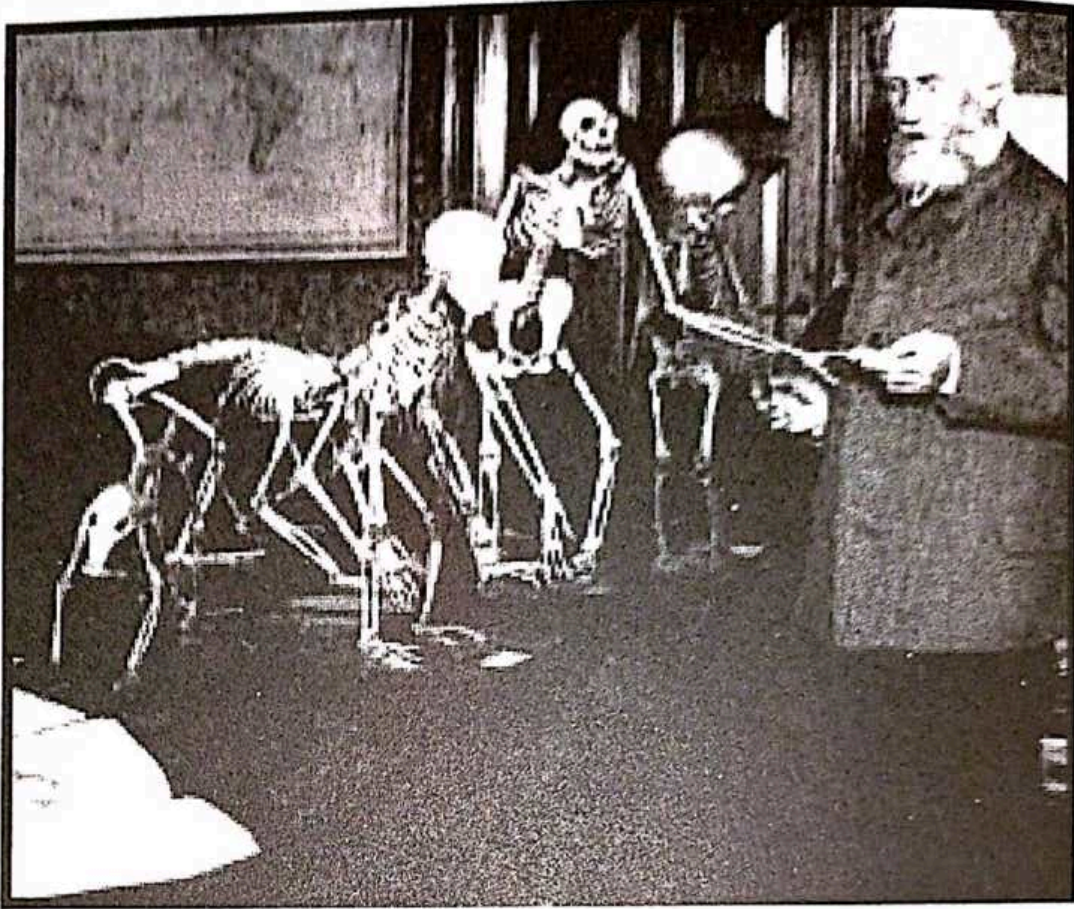
এবার এই ছবি দেখ। বেশ চমৎকার করে বাস্তব রূপ দিতে পেরেছে। কিন্তু বিজ্ঞান তার এই প্রতিভাটুকুর এতটুকু মুল্য দিলো না। অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দিলো। হাতে তৈরি এই কঙ্কালগুলোকে মানুষের মধ্যবর্তী পর্যায় বলে চালিয়ে দিয়েছিল আর্নেষ্ট হেকেল।
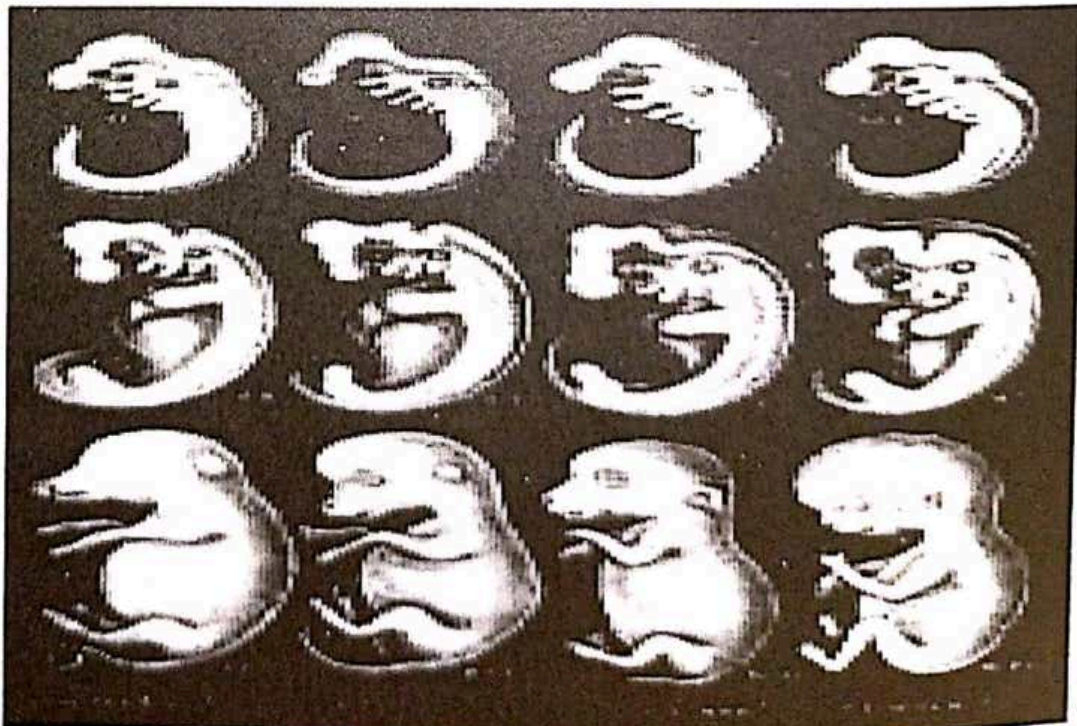
হেকেলের আরও কিছু প্রতিভা দেখ। সে অত্যন্ত চমৎকারভাবে ভ্রূণের ছবি অঙ্কন করে বিবর্তনের প্রমাণ দেওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করল, কিন্তু বিজ্ঞান এগুলোকেও লাথি মেরে ফেলে দিয়েছে। বিজ্ঞান তাকে গ্রহণ করুক আর নাই করুক চিত্রকলায় সে কিন্তু নোবেল পাবার যোগ্য, এটা তোকে মানতেই হবে।'

ভাগ্যিস জাকির ভাই আগেই বিবর্তনবাদ বোগাস মেনে নিয়েছেন। নইলে, এক অ্যাপেণ্ডিক্সের জের ধরে এত জোচ্চুরি তথ্য উঠে আসাতে জাকির ভাইয়ের মুখ ফাংশুটে হয়ে যেত।

ভাইয়া বলেই গেল, 'এখনও আমাদের পাঠ্যবইগুলোতে এমনভাবে লেখা হয় যেন বিবর্তনবাদ চন্দ্র-সূর্যের মতোই প্রমাণিত। আমাদের উইকিতে এখনও লেখা হয় বিবর্তনবাদ নাকি অকাট্য প্রমাণিত। লুই পাস্তুর নাকি নিজেই পরীক্ষা করে প্রমাণ করে দিয়েছেন, "নিষ্প্রাণ থেকে প্রাণ সম্ভব।" তিনি নাকি ডারউইনিজমকে সমর্থন করতেন। আরও অনেক বিজ্ঞানী অকাট্য প্রমাণ করে গেছেন ইত্যাদি ইত্যাদি। আমার মনে হয় ডারউইনিজম নিয়ে আর বেশি কিছু বলার দরকার নেই।'

স্রষ্টা ছাড়াই মহাবিশ্ব!

জাকির ভাই কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন, 'কিন্তু বিগব্যাং সম্পর্কে তুই কী বলবি? বিগ ব্যাং তো প্রমাণ করেই দিয়েছে যে, মহাবিশ্ব সৃষ্টির জন্য কোনো সৃষ্টিকর্তার দরকার নেই।'

ভাইয়া মুচকি হেসে বলল, 'আচ্ছা বল, বিগ ব্যাং থিওরি সম্পর্কে তুই কী জানিস?'

'মহাবিশ্ব আমরা যেমন দেখছি তেমন ছিল না। সৃষ্টির শুরুতে সবকিছু একটি বিন্দুতে ছিল, যাকে বলা হয় প্রাইমারি নেবুলা। এটি ছিল অসীম ঘনত্ব এবং ভরসম্পন্ন, একসময় বিস্ফোরণ ঘটে। পরবর্তী সময়ে ওই বিস্ফোরণ থেকে নক্ষত্র সৃষ্টি। গ্রহ, উপগ্রহ কাল পর্যায়ে আসে...'

'হইছে... আর বলিস না। আচ্ছা বল, এই যে প্রাইমারি নেবুলা, এটা কেমন করে এলো? কোথা থেকে এলো? এর আগে কী ছিল?'

'এ ব্যাপারে স্টিফেন হকিং *The Grand Design* নামক বইয়ে বলেছেন, বিগ ব্যাং-এর আগে কী ছিল এই প্রশ্ন করা অযৌক্তিক।[২৩৫] সুতরাং এই অযৌক্তিক বিষয়ে প্রশ্ন করাও ঠিক না।'

'ও... স্রষ্টাকে কে সৃষ্টি করেছেন এই প্রশ্ন দিয়ে আমাদের মাথা ঘুরিয়ে দেওয়া যৌক্তিক, আর বিগ ব্যাং-এর আগে কি ছিল এই প্রশ্ন করা অযৌক্তিক, তাই না?

---

[২৩৫]. The Grand Design, Stephen Hawking & Leonard Mlodinow, p;118

এ প্রশ্ন যদি অযৌক্তিক হয়ে থাকে, তাহলে কেন বিজ্ঞানীদের মধ্যে এটা নিয়ে এত চুল ছেঁড়াছিঁড়ি? কেন তারা এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে চলছেন বছরের পর বছর? কেন মিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ব্যয় করছেন এই গবেষণার ক্ষেত্রে?'

জাকির ভাই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করলেন না। ভাইয়া আবরারকে লক্ষ করে বললেন, 'প্রকৃতির চার প্রকার মৌলিক বল কি কি, জানিস?'

আবরার ঝটপট উত্তর দিলো, 'চার প্রকার মৌলিক বল হলো : সবল নিউক্লিয় বল, দুর্বল নিউক্লিয় বল, তড়িৎ চৌম্বকীয় বল, মধ্যাকর্ষণ বল।

'ভেরি গুড। এবার মূল পর্বে যাই। মহাবিশ্ব বলতে কিছুই নেই, টাইম নেই, স্পেস নেই, কোনো ভর নেই, শক্তি নেই একেবারেই শূন্য। তখন কী হলো? প্রকৃতির চারটি মৌলিক বল কেন্দ্রীভূত হলো। একে বলে সুপার ফোর্স। এই সুপার ফোর্স থেকে অত্যন্ত উত্তপ্ত এবং ঘনীভূত একটি বিন্দু তৈরি হলো। যাকে বিজ্ঞানের ভাষায় সিঙ্গুলারিটি পয়েন্ট বলে। এই অবস্থা ছিল একটি বিন্দুতে অসীম শক্তিরূপে। আইনস্টাইনের ভর শক্তির সমতুল্যতা সূত্র জানিস?'

'হুম, মিরাজ ভাইয়া শিখিয়েছে। $E=mc^2$ মানে ভর থেকে যেমন শক্তি পাওয়া সম্ভব, তেমনি শক্তি থেকে ভর পাওয়া সম্ভব।'

'হুম, ওই যে অসীম শক্তি তা থেকে পাওয়া গেল ভর। এই অসীম ঘনত্ব এবং ভরের বিন্দুটির বিস্ফোরণের ফল আজকের এই মহাবিশ্ব। ব্যাস... একটা মাধ্যমিক লেভেলের বাচ্চাকে বোঝানোর জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। কিন্তু কিউরিয়াস মাইন্ড ওয়ান্ট টু নো... টাইপের পোলাপাইনের মাথা নষ্ট। যাহোক, এখানে যেহেতু স্রষ্টার প্রসঙ্গ, সুতরাং আমরাও এইটুকুতে চুপ থাকব না। আবার একটু পেছনে যাই...'

'ভাইয়া, এই শক্তি থেকে ভর... এটা কীভাবে আসলো?'

'সেটাই বলতে যাচ্ছি। তিনজন বিজ্ঞানীর চুল ছেঁড়া বিশ্লেষণমূলক বই স্টিভেন উইনভার্গ-এর *দ্য ফার্স্ট থ্রি মিনিটস*, লরেন্স ক্রাউস-এর *অ্যা ইউনিভার্স ফ্রম নাথিং* এবং স্টিফেন হকিং ও লিওনার্ড ম্লোডিনো-এর *দ্য গ্র্যান্ড ডিজাইন*। জাকির এগুলো পড়েছিস?'

'না, সব পড়া হয়নি। শুধু গ্র্যান্ড ডিজাইন পড়েছি।'

'আচ্ছা, বিস্তারিত বলার সময় নেই অন্য সময় পড়ে নিবি। খুব সংক্ষেপে বলতে গেলে, এই যে চারটি বল একত্রিত ছিল মাত্র 10^{-43} সেকেন্ড। এই সময়কে বলা হয় প্লাঙ্ক-ইপোচ। পরের 10^{-35} সেকেন্ড সময়ে তিনটি বল থেকে মহাকর্ষীয় বল আলাদা হয়ে যায়। এসময় সর্বোচ্চ সংকোচন ঘটে। তাপমাত্রাও ছিল অকল্পনীয়, 10^{32} কেলভিন। এই সময়টাতে উৎপন্ন হতে থাকে ম্যাটার কোয়ার্ক এবং অ্যান্টিম্যাটার কোয়ার্ক। কোয়ার্ক যৌথভাবে ইলেকট্রন এবং প্রোটনের মতো ভারি কণা তৈরি করে।'

'ম্যাটার এবং অ্যান্টিম্যাটার তো সংঘর্ষে ধ্বংস হয়ে যায়। আমাদেরকে স্যার বলেছিলেন?' চিন্তিত হয়ে জিজ্ঞেস করল আবরার।

'তাই হয়েছে। ম্যাটার এবং অ্যান্টিম্যাটার সংঘর্ষে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু, এই সময় ঘটেছিল কিছু অপ্রতিসম (Asymmetric) ঘটনা। প্রায় প্রতি তিন কোটি জোড়া কোয়ার্ক-এন্টিকোয়ার্ক পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি এবং ধ্বংসের সময় একটি করে কোয়ার্ক কী করে যেন থেকে যায়। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় কোয়ান্টাম ফ্ল্যাকচুয়েশান মেথড। এটা কোয়ান্টাম মেকানিক্সের একটা থিওরি। এই কোয়ার্কগুলোই আদিবিশ্বের একমাত্র বস্তুকণা যা এখনও টিকে আছে। এই কোয়ার্কগুলোই সৃষ্টি করেছে মহাবিশ্বের সবকিছু।'

'কীভাবে?'

'এই যে থেকে যাওয়া কোয়ার্কগুলো একত্রিত হয়ে তৈরি হয় প্রোটন আর নিউট্রন। এই সময়টা 10^{-35} সেকেন্ড সময়ের পরবর্তী 10^{-10} সেকেন্ড সময়। দুর্বল নিউক্লিয় বল আর তড়িৎ চুম্বকীয় বল আলাদা হয়ে যায়। কারণ, তাপমাত্রা তখন অনেক কমে 10^{16} কেলভিনে চলে এসেছিল। এই যে উৎপন্ন হওয়া প্রোটন আর নিউট্রন মিলে তৈরি হয় ডিউটেরিয়াম।'

'হাইড্রোজেনের আইসোটোপ?'

'হ্যাঁ। তো এই সময় মহাবিশ্বের বয়স মাত্র ২ মিনিট। তিন মিনিট সময়ের মধ্যে প্রোটন, নিউট্রন আর ডিউটেরিয়াম মিলে তৈরি হয় হিলিয়াম নিউক্লিয়াস। ধারণা করা হয়, এই নিউক্লিয়াস কয়েক হাজার বছর পর ইলেকট্রনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে চার্জনিরপেক্ষ পরমাণুর গঠন করে। এই জটিল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সৃষ্টি হয় অসীম ঘনত্ব ও ভরের প্রাইমারি নেবুলা।'

'ও...কী কঠিনরে বাবা। আচ্ছা, তাহলে প্রাইমারি নেবুলার গঠন হয়েছে এভাবে। বুঝলাম, পরে কী হলো?' আবরারের প্রশ্ন।

'পরে হঠাৎ এই নেবুলা মহা বিস্ফোরণের মাধ্যমে, সুপারসনিক গতিতে সব দিকে ছড়িয়ে পড়ে। মোটের ওপর ১০০০০০ বছরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়া বস্তুকণা শীতল হয়ে ওঠে এবং আন্তঃআকর্ষণ বলের প্রভাবে কাছাকাছি চলে আসে। বিপুল পরিমাণ বস্তুকণা আলাদা আলাদা দল গঠন করতে সক্ষম হয়। এভাবে সূচনা হয় গ্যালাক্সির। পুঞ্জীভূত মেঘবলয় ইত্যাদির কথা তো জানিসই। তাই এখন আবার রিপিট করছি না। এইভাবেই আমাদের মহাবিশ্ব তৈরি।'

আবরার বলল, 'তাহলে এই মহাবিশ্বের সব গ্রহ নক্ষত্র এভরিথিং শূন্য থেকে নিজে নিজে সৃষ্টি হয়েছে?'

'আরে না, এটা তো বিবর্তনবাদীদের দাবিমাত্র।'

'কী বলতে চাচ্ছিস তুই? বিগব্যাং থিওরি ভুল?' বিরক্তির সঙ্গে উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন জাকির ভাই।

'উত্তেজিত হবি না প্লিজ, ডারউইনের থিউরি নিয়ে একসময় তোর থেকে আমি বেশি লাফালাফি করেছি। এখন থিউরির অবস্থা দেখেছিস?'

'ঠিক আছে, বিবর্তনবাদ ফাউল থিউরি। কিন্তু বিগ ব্যাং তো প্রমাণিত। তুই বিগ ব্যাংকে দাবিমাত্র বলে উড়িয়ে দিলি কেন?'

'আরে ভাই আমি তো বলিনি যে বিগ ব্যাং থিউরি দাবিমাত্র। আমি বলেছি, সবকিছু নিজে নিজে শূন্য থেকে এসেছে, অর্থাৎ কেউ সৃষ্টি করেনি। এই কথাটি দাবিমাত্র। কয়েকটি অমিমাংসিত সমস্যার কথা শুন। তারপর ক্লিয়ার হয়ে যাবি।'

'ওকে, বল।'

পয়েন্ট নাম্বার ওয়ান, চার প্রকার বল ঠিক শূন্যে কোথা থেকে এলো এই প্রশ্নের উত্তর নেই। এই ব্যাপারে প্রশ্ন করা অযৌক্তিক বলে এড়িয়ে যাওয়া হয়। আচ্ছা, চার প্রকার বল মিলেই স্টেপ বাই স্টেপ ভরের সৃষ্টি। এই চার প্রকার বলের এক প্রকার বল হচ্ছে মহাকর্ষ বল। কিন্তু মহাকর্ষ বল বস্তুর ভরের সঙ্গে সম্পর্কিত। যেখানে কোনো ভরই নেই সেখানে মহাকর্ষ বল এলো কোথা থেকে?'

'টাইমস্পেস থেকে।' বললেন জাকির ভাই।

'ঘুরে ফিরে তো ওই বটগাছের নিচেই আসলি। টাইমস্পেস কীভাবে এলো? হকিং বলেন, তখন টাইম আচরণ করেছে স্পেসের মতো। অথচ, স্পেস এসেছে

ঠিক যখন কণা সৃষ্টি হয়েছে তখন। এর আগে স্পেসও ছিল না। তা ছাড়া টাইম এবং স্পেস একসঙ্গে একে অন্যের সঙ্গে জড়িত। কোনোটিকে আলাদা করে এককভাবে ভাগ করা সম্ভব নয়।[২৩৬] তাহলে এই বিষয়টা ক্লিয়ার নয়।

নাম্বার টু, জর্জ গ্যামো বলেন, শূন্যস্থান অতি দ্রুত গতিতে সুপার কনডেন্স-এ পরিণত হয়। ওইখানে ঘনত্ব ছিল 10^{94} gm/cm2 এবং তাপমাত্রা ছিল 10^{39} degrees। এই হিসেবে তখনকার ঘনত্ব হচ্ছে পানির ঘনত্বের চেয়ে ১০০ ট্রিলিয়ন গুণ বেশি।

প্রথমত, আউটার স্পেসের ভ্যাকুয়াম অত্যধিক ঠান্ডা থেকে ম্যাজিক্যালি আপনাআপনি উত্তপ্ত হতে পারে না। দ্বিতীয়ত, খালি জায়গায় নিজ থেকে ম্যাটার সৃষ্টি হতে পারে না। তৃতীয়ত, থার্মোডাইনামিক্সের সূত্র বলে, কোনো প্রকার শক্তির উৎস ছাড়া তাপ উৎপন্ন হতে পারে না।[২৩৭] এই সুপারডেন্স কোর থিওরি... ক্লিয়ার নয়।

নাম্বার থ্রি, প্রায় প্রতি তিন কোটি জোড়া কোয়ার্ক-এন্টিকোয়ার্ক পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি এবং ধ্বংসের সময় একটি করে কোয়ার্ক থেকে যায়। কিন্তু কীভাবে একটি করে কোয়ার্ক থেকে গিয়েছিল, এর কোনো সঠিক উত্তর নেই। কোয়ান্টাম মেকনিক্স বলে শূন্যস্থান সত্যিই শূন্য। এখানে কোনো কিছু ছিল না এবং অটোমেটিক্যালি ভ্যাকুয়াম বা শূন্যস্থানে কোনো কিছুর সৃষ্টি সম্ভব না। রবার্ট এডলার বিবিসির একটা আর্টিকেলে বলেন, এমনকি যদি একটি ভ্যাকুয়ামকে particles এবং antiparticles-এর ঘন মেঘে পরিপূর্ণ করে দেওয়া হয়, তৎক্ষণাৎ ভ্যাকুয়াম আবার শূন্যস্থান হয়ে যাবে, কিছুই থাকবে না।[২৩৮] অপ্রতিসম (Asymmetric) ঘটনা ঠিক কী করে ঘটল ক্লিয়ার নয়।

নাম্বার ফোর, বিস্ফোরণের পর সুপারসনিক গতিতে সবকিছু চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। মহাশূন্য সকল প্রকার বাধামুক্ত। নিউটনের প্রথম সূত্র বলে বাহ্যিক বল প্রয়োগ না করলে গতিশীল বস্তু চিরকাল গতিশীল থাকবে। গতি কমার কোনো উপায় নেই। অটোমেটিক্যালি ডিরেকশন চেঞ্জ হওয়ার কোনো চান্স নেই। তাহলে কীভাবে সুপারসনিক গতি কমিয়ে বা থামিয়ে বা পরিবর্তন করে, ডিরেকশন চেঞ্জ হয়ে পার্টিকেল ঘনীভূত হলো?

---

২৩৬. https://blogs.scientificamerican.com/guest-blog/is-all-the-universe-from-nothing/
২৩৭. Gravitation and the Universe, R.H. Dickey, p. 62.
২৩৮. http://www.bbc.com/earth/story/20141106-why-does-anything-exist-at-all

নাম্বার ফাইভ, মহাশূন্যের ঘনত্ব পৃথিবীর যেকোনো ল্যাবরেটরির সর্বনিম্নচাপের ভ্যাকুয়ামের চেয়েও কম। কীভাবে ম্যাজিক্যালি এত উচ্চ মাত্রার হিলিয়াম গ্যাসের ডেনসিটি আসলো?

নাম্বার সিক্স, অন্যতম প্রধান সমস্যা helium mass 4 gap. নিউক্লিয়ার ভর ৫ এবং ৮-এর কারণে হাইড্রোজেন অথবা হিলিয়াম নিজেদেরকে ভারি উপাদানে রূপান্তরিত করতে পারে না।'

'বুঝলাম না।'

'দাঁড়া, ক্লিয়ার করি। মৌলের ভরসমূহ দেখ... হাইড্রোজেনের ভর ১.০০৮, (ডিউটেরিয়াম হচ্ছে হাইড্রোজেনের আইসোটোপ যার ভর ২.০১৬), হিলিয়ামের ভর ৪.০০৩, লিথিয়ামের ভর ৬.৯৩৯, বেরেলিয়ামের ভর ৯.০১২, বোরন ১০.৮১১ ইত্যাদি... কিন্তু খেয়াল কর, ভর ৫ এবং ভর ৮ ফাঁকা।'

'হুম, ভর ৫ এবং ভর ৮-এর কোনো মৌল নেই।'

'হ্যাঁ, এবার খেয়াল কর নিউক্লিয়ার ফিউশানে হাইড্রোজেন বোমায় হাইড্রোজেন ডিউটেরিয়াম ২-এ এবং ডিউটেরিয়াম ২ ডাবল হয়ে হিলিয়াম ৪ ভরে আসে। কিন্তু যেহেতু ভর ৫ ফাঁকা সেহেতু হিলিয়াম ৪, ভর ৫ ক্রস করে অন্য কিছুতে রূপান্তরিত হতে পারে না। কল্পনা করে নিলাম পারে, তাহলেও ভর ৮ গিয়ে থেমে যাবে। যদি এই গ্যাপ না থাকত, তাহলে সূর্য আমাদের দিকে প্রতিনিয়ত ইউরেনিয়াম ছুঁড়ে মারত। তাহলে কী করে হাইড্রোজেন (ডিউটেরিয়াম) নিজে নিজে ভর ৫ এবং ভর ৮ ক্রস করে অতিকায় ভরবিশিষ্ট উপাদানে পরিণত হলো?[২৩৯]

নাম্বার সেভেন, "গ্যাসের বিচ্ছুরণ" সমস্যা। কোনো ভ্যাকুয়ামে যেকোনো গ্যাস প্রসারণ অথবা সংকোচন করা হোক না কেন, গ্যাস নিজেকে কোনোভাবেই কোনো বস্তু বা গ্রহ নক্ষত্রে পরিণত করতে পারে না। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে এই সমস্যা নিয়ে আলোচনার ওপর Novotny একটি বই প্রকাশ করে।

নাম্বার এইট, থার্মোডাইনামিক্সের এনট্রপি ল অনুযায়ী একটা এলোমেলো অবস্থা কখনো আপনাআপনি র‍্যান্ডমলি সুশৃঙ্খল হতে পারে না।'

---

[২৩৯]. Quoted in Creation Science, William A. Fowler, California Institute of Technology, p. 90

'এটা তো সবাই জানে। এর কারণ হলো, সবকিছু এলোমেলোই হতে চায়। স্টিফেন হকিং বলেন, "আদিম মহাবিশ্ব ছিল সম্ভবত অত্যন্ত বিশৃঙ্খল এবং নিয়ম বিহীন অবস্থায়। এরকম বিশৃঙ্খল প্রাথমিক অবস্থা থেকে আমাদের বর্তমান মহাবিশ্ব কী করে সৃষ্টি হলো সেটা বোঝা কঠিন।"'[২৪০]

'ঠিক বলেছিস। কিন্তু কোনো ক্লিয়ারকাট উত্তর নেই কীভাবে বিগ ব্যাং-এর পর বিক্ষিপ্ত এলোমেলো অবস্থা থেকে র‍্যান্ডমলি সুশৃঙ্খল মহাবিশ্ব এলো।

নাম্বার নাইন, হকিংসহ সবাই একই উত্তর দেন যে, মহাবিশ্বের সূচনা শুরু হয়েছে বৈজ্ঞানিক (পদার্থ বিজ্ঞান) সূত্রাবলির কারণে।[২৪১] যেখানে কোনো পদার্থ ছিল না, সেখানে পদার্থবিদ্যার সূত্র কীভাবে কার্যকর হলো? পদার্থবিদ্যার সূত্রগুলো কার্যকর হতে হলে গ্রাভিটি, স্পেসটাইম প্রধান শর্ত কিন্তু এগুলোর কিছুই তো ছিল না। তাহলে কার্যকর হলো কীভাবে?'

'সেটা অবশ্য আমার জানা নেই।'

আমাদের সামনে জাকির ভাইকে এভাবে প্যাঁচানোতে, প্রচণ্ড হাসি আসলেও জাকির ভাইয়ের সম্মানের দিকে তাকিয়ে অনেক কষ্টে হাসি কন্ট্রোল করলাম।

'বড়ো বড়ো মাথারা উত্তর জানে না, তুই জানবি কী করে? শুন, এই প্রশ্নটি করা হয়েছিল অ্যালেক্স ফিলিপ্পেনকোকে। তোদের গুরু, চিনিস তো?'

'আমেরিকান জ্যোতিপদার্থবিজ্ঞানী, *ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়ার* প্রফেসর ফিলিপ্পেনকো?'

'হুম, তিনি। তাকে এই প্রশ্নটি করা হয়েছিল যে, পদার্থবিদ্যার সূত্রগুলো কীভাবে কার্যকর হলো? তিনি উত্তর দেন এটি ছিল দৈব ঘটনা (Divine spark) আবার প্রশ্ন করা হলো কীভাবে ডিবাইন স্পার্ক-এর মাধ্যমে পদার্থবিদ্যার সূত্রগুলো কার্যকর হলো? তিনি উত্তর দিলেন, "আমি জানি না কীভাবে Divine spark-এর উৎপত্তি হলো। সুতরাং এ বিষয়টি পদার্থবিদ্যার সূত্রগুলোর ওপর ছেড়ে দিন।"[২৪২] আরেকটি সাক্ষাৎকারে তাকে একই প্রশ্ন করা হয়েছিল, পদার্থবিজ্ঞানের এই সূত্রগুলো কোথা থেকে এলো? তিনি উত্তর দেন, "Thats a great question–

---

[২৪০]. A Bief History of Time by Stephen Hawking, p.114

[২৪১]. The Grand Design, Stephen Hawking & Leonard Mlodinow , p;118

[২৪২]. https://www.space.com/16281-big-bang-god-intervention-science.html

what is the ordgin of the laws of physics? I dont know. Thats a question science cant answer.[২৪৩] আমি জানি না। এই প্রশ্নের উত্তর বিজ্ঞান দিতে পারে না।" দিতে পারবে বলেও তিনি মনে করেন না। তাদের উত্তরগুলো আসলে হাইপোথিসিস ভিত্তিক ইত্যাদি... ইত্যাদি।'

'কী বলিস?'

'যা বললাম সব শুনেছিস। আসলে বিগব্যাং-এর আগে কী ছিল? এটা এখনও বিজ্ঞানীদের কাছে রহস্য। *নিউ সাইনটিস্ট জার্নাল* এটাকে টেন মিস্ট্রি ইন ফিজিক্স-এর অন্তর্ভুক্ত করেছে।[২৪৪] এমন আরও সমস্যা আছে যেগুলোর পক্ষে আনুমানিক মন্তব্য কিংবা থিওরি আছে কিন্তু স্পষ্টত বৈজ্ঞানিক প্রমাণের ভিত্তিতে উত্তর নেই। তাহলে আমাদের এই সমস্যাগুলোর কি কোনো উত্তর নেই?'

'আছে হয়তো, অমাদের জানা নেই। বিজ্ঞান এখনও অতদূর পৌছেনি তাই আমরা জানি না।'

'লট অব থ্যাংকস এই জন্য যে, তুই এটুকু বুঝেছিস। বিজ্ঞান এখনও অতদূর পৌছেনি যে সবকিছুর ব্যাখ্যা দিতে পারবে। তবে, উত্তর আমাদের কাছে আছে, তুই জানিস না। এটা নিশ্চিত যে, নিজে নিজে এই ঘটনাগুলো ঘটেনি। স্টিফেন হকিংও বলে গেছেন যে, "মহাবিশ্বে অবাক করা সুশৃঙ্খল চাপ রয়েছে। মহাবিশ্ব সম্পর্কে আমরা যতই আবিষ্কার করি ততই খুঁজে পাই, এটি যৌক্তিক নিয়মের ধারায় পরিচালিত হচ্ছে। কেউ চাইলে বলতেই পারে যে, এই সুশৃঙ্খলা সৃষ্টি স্রষ্টার কাজ। অইনস্টাইনও তাই ভাবতেন।"[২৪৫] আসলে এক সুপারন্যাচারাল পাওয়ারসম্পন্ন সত্তা, এক সুপার ইন্টেলিজেন্ট সত্তা এভাবে সৃষ্টি করেছেন। Michio Kaku (মিশিও কাকু) কে চিনিস?'

'জাপানি বিজ্ঞানীটা? আমেরিকান তাত্ত্বিক পদার্থবিদ?'

'বাহ, এই লাইনে তো ভালো খবর রাখিস। তো তাঁর বক্তব্য শুন। তিনি বলেন, "আমার কাছে পরিষ্কার যে, এই মহাবিশ্ব খুব সূক্ষ্ম নিয়ম-নীতির মাধ্যমে সুপরিকল্পিতভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে। এই মহাবিশ্ব বাই চান্সে সৃষ্টি হয়নি। অবশ্যই কোনো এক ইউনিভার্সাল ইন্টেলিজেন্ট এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন।"'[২৪৬]

---

[২৪৩]. www.youtube.com/watch?v=MmwbjE220n0

[২৪৪]. https://www.newscientist.com/article/mg22730370-300-what-came-before-the-big-bang/ 10 mysteries that physics can't answer

[২৪৫]. http://reason.com/archives/2002/04/01/leaping-the-abyss/3

[২৪৬]. https://www.dailystar.co.uk/news/latest-news/569693/God-is-real-scientist-Michio-Kaku-universe-created-Jesus-Christ

'ইউনিভার্সাল ইন্টেলিজেন্ট?'

'হ্যাঁ, এই ইউনিভার্সাল ইন্টেলিজেন্ট হলেন আল্লাহ সুবহানু ওয়া তাআলা। একমাত্র আল্লাহই পারেন শূন্য থেকে এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করতে। আল্লাহ বলেন, "তিনি (আল্লাহ) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের উদ্ভাবক। যখন তিনি কোনো কার্য সম্পাদনের সিদ্ধান্ত নেন, তখন বলেন— (কুন) হয়ে যাও, তৎক্ষণাৎ তা হয়ে যায়।"[২৪৭] এই আয়াতে আরবি শব্দ (بَدِيعُ) মানে এমনকিছু সৃষ্টি করা যার কোনো পূর্ব নির্ধারিত ছিল না। সম্পূর্ণ নতুনভাবে উদ্ভাবন। একেবারে শূন্য থেকেই কোনো কিছু তৈরি করা। অতএব এই সৃষ্টি একমাত্র আল্লাহর।

কেউ একটা নিদর্শন দেখেই ঈমান আনে আবার কেউ হাজারটা নিদর্শন দেখেও ঈমান আনে না। তাদের কথা আল্লাহ বলেছেন— "তারা অন্ধ, বধির, অতএব তারা ফিরবে না।"[২৪৮] আলহামদুলিল্লাহ, আমি বোধসম্পন্ন চাক্ষুষ, বধিরও নই অন্ধও নই। এত নিদর্শন দেখার পর না ফিরে থাকতে পারিনি। আমি ঈমান এনেছি আল্লাহর ওপর, রাসূলুল্লাহ মুহাম্মদ ﷺ সহ পূর্ববর্তী নবি-রাসূলদের ওপর, কুরআন এবং পূর্ববর্তী আসমানি কিতাবসমূহের ওপর।

জাকির, শুন ভাই। তোর বিবেক-বুদ্ধি, মস্তিষ্ক, অন্তর, চক্ষু সব আছে। স্বাধীন ইচ্ছা আছে। দ্বীন নিয়ে জোর জবরদস্তী নেই।[২৪৯] এখন ঈমান আনা, না আনা তোর ইচ্ছা। এটা সুস্পষ্ট যে, ইসলামই একমাত্র স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবনব্যবস্থা এবং মুক্তির পথ। শুধু অহংকার করে সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখিস না ভাই।'

এশার আজান হয়েছে, আকাশের চাঁদটা পৃথিবীকে তার পূর্ণ জোছনা ঢেলে দিয়েছে। অনেক্ষণ চুপ করে থেকে বাসায় চলে গেলেন জাকির ভাই। আমরাও নামাজের জন্য মসজিদের দিকে রওনা দিলাম।

---

[২৪৭]. সূরা বাক্বারা-২ : ১১৭

[২৪৮]. সূরা বাক্বারা-২ : ১৮

[২৪৯]. সূরা বাক্বারা-২ : ২৫৬

দ্বীন ধর্ম রিলিজিয়ন

রাতের খাওয়া চলছে। ভাইয়া ভাবির আগমন উপলক্ষ্যে খাবারের আয়োজনটা বেশ জামাইয়ানা স্টাইলের হয়েছে। আমরা পাশাপাশি বসলাম, আব্বুও আমাদের সঙ্গে খেতে বসেছে। সকালে কিছুটা অভিমান করে থাকলেও ভাইয়ার পরিবর্তনের খবরে আব্বু এখন বেশ খুশি। কিন্তু খানিকটা চাপা কষ্ট লেগে আছে অন্য জায়গায়। আর সেটা হলো, খ্রিষ্টান পুত্রবধূ। আমি ফারিহার মাছের কাটা বেঁছে দিচ্ছি। ও এখনও মাছ খেতে গেলে গলায় কাটা বিঁধিয়ে ফেলে। ফলে তার জন্য এই বাড়তি তৎপরতা আমাদের সবসময়ই রাখতে হয়। আব্বু খাওয়ার ফাঁকে বললেন,

'বউমা খাবে না?'

আম্মু বলল, 'তোমরা শেষ করো, তারপর আমি আর বউমা একসঙ্গে খাবো।'

আব্বু ভাইয়াকে উদ্দেশ্য করে চাপা ক্ষোভের স্বরে বললেন, 'দেশে কি মুসলিম মেয়ের অভাব পড়েছিল?'

আব্বুর কথায় ক্ষণিকের জন্য খাওয়া বন্ধ হলো ভাইয়ার, নিচের দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। কথার কোনো উত্তর না দিয়ে চুপ থেকেই ধকলটা সামলিয়ে নিল।

অনেক রাত হয়েছে, আমি ঘুমানোর প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম, প্রতিদিনের ঘুমানোর আমল সবেমাত্র শেষ করেছি। হঠাৎ ফারিহা এসে বলল,

'মেজো ভাইয়া, বড়ো ভাইয়া তোমাকে ডাকছে।'

মনের ভেতর কেমন জানি খটকা লাগলো। ফারিহা বাড়িতে নতুন মেহমান পেয়েছে, সুতরাং হাঁড়ির সমস্ত গল্প না শুনে সে আর আজকে মেহমানকে ছাড়বে না; সে যতই রাতই হোক না কেন। কিন্তু এর মধ্যে আমাকে ডাকছে কেন? যাহোক, ডেকেছে যখন শুনেই আসি কী হয়েছে।

সালাম দিয়ে রুমে ঢুকতেই দেখলাম ভাইয়া খাটের প্রান্তদিকে বালিশের কাছে এক পা ঝুলিয়ে বসে আছে। আর ভাবি গায়ে একটা চাদর জড়িয়ে বেশ আঁটসাঁট হয়ে খাটের মাঝখানে বসে আছেন। আমি কিছুটা সংকোচ বোধ করলাম। ভাইয়া বুঝতে পেরে বলল,

'আয়, ভেতরে আয়, বস এখানে। সংকোচের কিছু নেই।'

আমি চেয়ারটা টেনে বসতেই ভাইয়া বলল, 'তোর ভাবি আমাকে কিছু প্রশ্ন করেছে। কিন্তু তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বে আমার খুব ভালো পড়াশোনা নেই। যেহেতু তোর এ ব্যাপারে বেশ ভালো দখল আছে, তাই তোকে ডাকলাম। তুই একটু তার প্রশ্নগুলোর উত্তর দে।'

আমি মাথা নিচু করে বসে রইলাম। জেনেফা ভাবি বলল, 'মিরাজ, তোমার ভাইয়াকে লেখা তোমার চিঠিটা আমি খুঁটে খুঁটে পড়েছি। বাইবেল সংক্রান্ত তোমার মতামতগুলো বেশ চমকপ্রদ মনে হয়েছে। আমি ইসলাম সম্পর্কে আরও বেশ কিছু বই পড়েছি। কিন্তু আমার মনে একটা প্রশ্ন খুব উঁকি দিচ্ছে। তা হলো, যিশুখ্রিষ্টকে তো তোমাদের কোরান স্বীকৃতি দিয়েছে এবং আমাদের বাইবেলও তো একই আল্লাহ প্রেরণ করেছেন। তাহলে আমি যদি এখন একনিষ্ঠতার সঙ্গে খ্রিষ্টান ধর্ম পালন করি, তাহলে কি কোনো সমস্যা আছে?'

আমি কিছুটা বিব্রতবোধ করলাম। এই ধরনের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য সরাসরি কথা বলার দরকার, কিন্তু ভাবির সামনে কীভাবে তা করি? পর্দার খেলাপ হয়ে যায় কিনা ভেবে দ্বিধায় পরে গেলাম।

ভাইয়া আমার এরূপ দ্বিধান্বিত মুখচ্ছবি দেখে বলল, 'বিব্রত হওয়ার কিছু নেই। আশাকরি পর্দার বিধান এখানে লঙ্ঘন হবে না। কেননা আমি তার স্বামী এখানে বসে আছি। তুই তো একাকী তার সঙ্গে কথা বলছিস না। সবচেয়ে বড়ো কথা হলো, তুই তো ফালতু কথা বলবি না, দাওয়ার কাজ করবি।'

ভাইয়ার কথায় কিছুটা স্বাভাবিক হলাম। যথাসম্ভব ভাবির দিকে না তাকিয়ে বলা শুরু করলাম,

'আপনি যেহেতু আমার চিঠিটা পড়েছেন। সুতরাং সেখানে বুঝতে পেরেছেন বর্তমান বাইবেল আসলে আল্লাহর প্রেরিত কিতাব নয়। বাইবেল হচ্ছে ইঞ্জিল কিতাবের বিকৃত রূপ। বিকৃত হওয়ার পরেও কিছু কথা সত্য রয়ে গেছে। সেই সত্য অংশ যা কুরআনের সঙ্গে মিলে তাকে আমরা সত্য বলে মেনে নিতে আপত্তি করি না। যাহোক, আপনি যদি বর্তমান বাইবেল মেনে চলার দাবি করেন তাহলেও আপনি আল্লাহ এবং রাসূল ﷺ-এর ওপর ঈমান আনতে বাধ্য।'

'কেন?' প্রশ্ন করলেন জেনেফা ভাবি।

'প্রথমত, ইহুদি এবং আপনাদের খ্রিষ্টানদের মূর্তি পূজার কোনো ভিত্তি নেই! কারণ, বাইবেলে এক ঈশ্বরের কথাই বলা হয়েছে। আপনাকে বাইবেল থেকে কিছু কোট করে শোনাচ্ছি। ওল্ড টেস্টামেন্টে ডিউটেরনমিতে হিব্রুতে বলা হয়েছে, "শামা ইসরাইলু আদোনাই ইলা হাইনু আদনা ইখাত অর্থাৎ হে ইজরাইলের লোকরা শোনো! আমাদের ঈশ্বর হলেন একমাত্র প্রভু!"[২৫০] ইসায়াহতে বলা হয়েছে, "আমিই প্রভু, আমিই একমাত্র ঈশ্বর, আমার কোনো শরিক নেই।"[২৫১] আরও বলা হয়েছে, "আমিই ঈশ্বর, অন্য কোনো ঈশ্বর নেই, আমার মতো কেউ নেই।'"[২৫২]

'আচ্ছা?'

'শুধু তাই নয়; বরং বাইবেলে কঠোরভাবে মূর্তি পূজা করতে নিষেধ করা হয়েছে। ওল্ড টেস্টামেন্টে বলা হয়েছে, "আমি ছাড়া অন্য কোনো ঈশ্বর নেই, আমাকে ছাড়া তোমরা আর কোনোও দেবীকে উপাসনা করবে না। তোমরা অবশ্যই কোনো ছবি তৈরি করবে না। কোনো মূর্তি গড়বে না যেগুলো আকাশের, ভূমির অথবা জলের নিচের কোনো কিছুর মতো দেখতে। কোনো মূর্তির উপাসনা বা সেবা করবে না। কারণ, আমিই প্রভু, তোমাদের ঈশ্বর। যারা অন্য দেবীর উপাসনা করবে তাদের আমি ঘৃণা করি। আমার বিরুদ্ধে যারা পাপ করবে তারা আমার শত্রুতে পরিণত হবে এবং আমি তাদের শাস্তি দেবো। আমি তাদের সন্তান-সন্ততি এবং পরবর্তী প্রজন্মকেও শাস্তি দেবো।'"[২৫৩]

'কিন্তু ওল্ড টেস্টামেন্ট তো ইহুদিদের জন্য।' বললেন ভাবি।

---

[২৫০]. ডিউটরোনমি-৬ : ৪

[২৫১]. ইযাইয়াহ-৪৫ : ৫

[২৫২]. ইযাইয়াহ-৪৬ : ৯

[২৫৩]. এক্সোডাস-২০ : ৩-৫ (সন্তান সন্ততিকে বা প্রজন্মকে শাস্তি দেওয়া বাইবেল অনুযায়ী। আল্লাহ কখনো একজনের কৃতকর্মের জন্য অন্যকে শাস্তি দেন না।)

'না, শুধু ইহুদিদের জন্য নয় খ্রিষ্টানদের জন্যও সমান নিয়ম। কারণ, যিশু নিজেই বলেছেন, "ভেব না যে আমি মোশির বিধি-ব্যবস্থা ও ভাববাদীদের শিক্ষা ধ্বংস করতে এসেছি। আমি তা ধ্বংস করতে আসিনি বরং তা পূর্ণ করতেই এসেছি।"[২৫৪] অতএব, ওল্ড টেস্টামেন্টের সকল নিয়ম খ্রিষ্টানদেরকেও মেনে চলতে হবে। একই অনুচ্ছেদে যিশু বলেছেন, "যদি কেউ না মেনে চলে তাহলে তাকে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না।"'

'নিউ টেস্টামেন্টে কি যিশু কিছু বলেছে? আসলে বাইবেল পুরোটা আমার পড়া হয়নি তো।'

'অবশ্যই বলেছেন। নিউ টেস্টামেন্টে যেটাকে আপনারা খ্রিষ্টানরা ইঞ্জিল বলে দাবি করেন। কিন্তু আপনারা এই নিউ টেস্টামেন্টও মেনে চলেন না। আসলে যিশু বা ঈসা (আ.)-কে আপনারা ঈশ্বর বলে দাবি করেন। অথচ যিশু কখনো নিজেকে ঈশ্বর দাবি করেননি। বরং তিনি বলেছেন, "আমার পিতা[২৫৫] আমার চেয়ে মহান।"[২৫৬] আমার পিতা সবকিছুর চেয়ে মহান।"[২৫৭] এমনকি যিশু বলেছেন, "তিনি নিজের ইচ্ছায় বা ক্ষমতায় কিছুই করতে পারেননি, সব করেছেন আল্লাহর ইচ্ছায়।" তিনি বলেন, "আমি নিজের থেকে কিছুই করতে পারি না। আমি (ঈশ্বরের কাছ থেকে) যেমন শুনি তেমনি বিচার করি। আর আমি যা বিচার করি তা ন্যায়। কারণ, আমি আমার ইচ্ছামতো কাজ করি না। বরং যিনি (ঈশ্বর) আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁরই ইচ্ছাপূরণ করি।"'[২৫৮]

'তাহলে তো...'

'আপনাকে আরও কয়টা কোট করি। যিশু খ্রিষ্ট আরও বলেছেন, "এই হলো অনন্ত জীবন; তারা তোমাকে জানে যে তুমি একমাত্র সত্য ঈশ্বর ও তুমি যাকে পাঠিয়েছ সেই যিশু খ্রিষ্টকে জানে।[২৫৯] যে আমায় ভালোবাসে না, সে আমার শিক্ষা পালন করে না। আর তোমরা আমার যে শিক্ষা শুনছ তা আমার নয়, যিনি আমায় পাঠিয়েছেন এই শিক্ষা সেই পিতার।"[২৬০] তাহলে যিশু নিজ থেকে কিছুই শিক্ষা দেননি বা বলেননি। সব আল্লাহর ইচ্ছায় বলেছেন। আর যিনি আল্লাহর ইচ্ছায় বা আল্লাহর শেখানো কথা বলেছেন, তিনি একজন রাসূলুল্লাহ।'

---

২৫৪. ম্যাথিউ-৫ : ১৭

২৫৫. পিতা মানে স্রষ্টা বা আল্লাহ। আল্লাহকে ফাদার বা পিতা বলা যিশুর বা বাইবেলীয় রীতি।

২৫৬. জন-১৪ : ২৮

২৫৭. জন-১০ : ২৯

২৫৮. জন-৫ : ৩০

২৫৯. জন-১৭ : ০৩

২৬০. জন-১৪ : ২৪

'আচ্ছা, এটা কি যিশুর নিজের স্বীকৃতি?'

'অবশ্যই। স্পষ্ট বর্ণনা আছে বাইবেলে, "তুমি যে কাজ করার দায়িত্ব আমায় দিয়েছিলে, তা আমি শেষ করেছি ও পৃথিবীতে তোমাকে মহিমান্বিত করেছি।"[২৬১] এই হলো যিশুর রাসূলের দায়িত্ব পালনের স্বীকৃতি। কুরআন ও একই কথা বলেছে—"স্মরণ করো, মরিয়ম পুত্র ঈসা বলল; হে বনি ইসরাইল! আমি তোমাদের কাছে আল্লাহ প্রেরিত রাসূল এবং তাওরাত কিতাবের সত্যায়নকারী যা আমার পূর্বে প্রেরণ করা হয়েছিল।"[২৬২] দেখতেই পারলেন বাইবেল একক স্রষ্টা আল্লাহর কথাই বলে এবং এটাই সুস্পষ্ট যে যিশু বা ঈসা (আ.) আল্লাহর প্রেরিত রাসূল। তিনি ঈশ্বর নন। আশা করি বুঝতে পেরেছেন।'

জেনেফা ভাবি প্রথমবারের মতো বাইবেলের উদ্ধৃতিগুলো শুনলেও সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পেরেছেন। আমার কথায় পজেটিভ আন্সার দিয়ে ছোটো স্বরে বললেন, হু...ম।'

'এবার দেখুন, বাইবেল কীভাবে শেষ নবি ও রাসূলুল্লাহ মুহাম্মদ ﷺ-এর আগমন বার্তা দিয়ে তাঁকেই মেনে চলার নির্দেশ দিয়েছে।'

'নবি মুহাম্মদের কথা বাইবেলে বলা আছে?' বিস্ময়ের সুরে বললেন ভাবি।

'আমি সেটাই দেখানোর চেষ্টা করছি। বাইবেল কোট করছে যে, যিশু তাঁর শিষ্যদের বলছে, "আমি পিতার কাছে প্রার্থনা করব, তিনি তোমাদের নিকট একজন সাহায্যকারী পাঠাবেন।[২৬৩] আমি তোমাদের সত্যি বলছি। আমার যাওয়া তোমাদের জন্য ভালো। কারণ, আমি যদি না যাই তাহলে সেই সাহায্যকারী তোমাদের কাছে আসবেন না। আমি যদি যাই তাহলে আমি তাঁকে তোমাদের কাছে পাঠিয়ে দেবো।'"[২৬৪]

'আমাদের মিশনারিরা এগুলো জানে না?'

'জানে। কিন্তু তারা বলে এই সাহায্যকারী হচ্ছে পবিত্র আত্মা। অথচ পবিত্র আত্মা যিশুর জন্মের আগে থেকে এবং যিশু থাকা অবস্থাতেই ছিল।[২৬৫] কিন্তু যিশু শর্ত দিয়েছেন যে, তিনি না গেলে সাহায্যকারী আসবেন না। তাহলে সেই সাহায্যকারী কী করে যিশু থাকাকালীন অবস্থায় পবিত্র আত্মা হতে পারে?'

---

[২৬১]. জন-১৭ : ০৪
[২৬২]. সূরা সফ-৬১ : ০৬
[২৬৩]. জন-১৪ : ১৬
[২৬৪]. জন-১৬ : ০৭
[২৬৫]. ম্যাথিউ-৩ : ১৩

এই কথাটি বুঝাতে ভাবির একটু সময় লাগলো মনে হলো। আমি উত্তরের অপেক্ষা না করে বললাম,

'*সং অব সলোমনে* সরাসরি রাসূলুল্লাহ ﷺ নাম মুহাম্মদও উল্লেখ আছে, "His mouth is most sweet (מַחֲמַדִּים): yea, he is altogether lovely. This is my beloved, and this is my friend, O daughters of Jerusalem."[২৬৬] ও জেরুজালেমের কন্যারা শোনো, তাঁর কথা খুবই মিষ্ট। সে সবকিছুতেই মনোরম, আমার প্রেমিক, আমার প্রিয়।" হিব্রুতে (מַחֲמַדִּים) শব্দ এখনও উল্লেখ আছে যার উচ্চারণ মেহমাদিম (Mahamdim)।'

মোবাইল থেকে স্ক্রিনশটটি বের করে ভাইয়াকে বললাম, 'ভাবিকে পিকটি দেখাও।'

4261 [e]	3605 [e]	4477 [e]	2441 [e]
ma·ḥă·mad·dîm;	wə·ḵul·lōw	mam·ṯaq·qîm,	ḥik·kōw
מַחֲמַדִּים	וְכֻלּוֹ	מַמְתַקִּים	16 חִכּוֹ
[is] lovely	he altogether	[is] most sweet	His mouth
Noun	Noun	Noun	Noun

ভাইয়ার হাত থেকে মোবাইল নিয়ে ভাবি স্ক্রিনে চোখ রাখা মাত্র আমি বললাম, 'দেখুন হিব্রু ভার্সনে এখনও মেহমাদিম উল্লেখ আছে। হিব্রু ভাষায় ইম সম্মান সূচক শব্দ। মুহাম্মাদ-এর সঙ্গে ইম যোগে মেহমাদিম সরাসরি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নাম উল্লেখ করা আছে। ইংরেজি ভার্সনে (מַחֲמַדִּים)-এর অনুবাদ করা হয় lovely/most sweet. অথচ, হিব্রু ভার্সনে এই অনুচ্ছেদে এখনও (מַחֲמַדִּים) নামেই আছে।'

Song of Solomon 5:16 ▶

of Solomon 5:16

Hebrew Texts

Westminster Leningrad Codex

חִכּוֹ מַמְתַקִּים וְכֻלּוֹ מַחֲמַדִּים זֶה דוֹדִי וְזֶה רֵעִי בְּנוֹת יְרוּשָׁלִָם׃

WLC (Consonants Only)

חכו ממתקים וכלו מחמדים זה דודי וזה רעי בנות ירושלם׃

Aleppo Codex

טז חכו ממתקים וכלו מחמדים זה דודי וזה רעי בנות ירושלם

হিব্রু ভার্সনে মুহাম্মদ ﷺ উল্লেখ

---

২৬৬. সং অব সলোমন-৫ : ১৬

'তারপর?'

'এবার দেখুন, জনের গসপেলে বলা হয়েছে, যিশু তাঁর শিষ্যদের বলছেন, "সত্যের আত্মা যখন আসবেন, তখন তিনি সকল সত্যের মধ্যে তোমাদের পরিচালিত করবেন। তিনি নিজে থেকে কিছু বলেবেন না। কিন্তু তিনি যা শোনেন তাই বলবেন।"[২৬৭] আলাদা ডায়লগে এখানে শর্তগুলো কী কী?'

'তিনি নিজ থেকে কিছু বলেবেন না, তিনি যা শুনবেন তাই বলবেন। মানে তাঁর কথা হবে ওহি ভিত্তিক। কুরআনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা তো তাই বলা হয়েছে, তিনি মনগড়া কথা বলেন না। (যা বলেন) তা তো ওহি, যা তাঁর প্রতি নাজিল হয়।[২৬৮] আবার, ইসায়াহতে ৪২ অধ্যায়ের ১ম অনুচ্ছেদে হিব্রু ভার্সনে (אֶתְמָךְ־) নাম উল্লেখ করা হয়েছে। হিব্রুতে আহমাদ লেখা হয় (אֶתְמָךְ־) দিয়ে। কিন্তু বাইবেলে অনুবাদ করা হয় Whom I uphold আমি তাকে ধারণ করি।'

'তাহলে ক্লিয়ারেন্স কী?'

'ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয় ইসায়ার ২৯ অধ্যায়ে। সেখানে বলা হয়েছে, "যাকে কিতাব দেওয়া হবে সে পড়তে জানে না, যখন তাকে পড়তে বলা হবে সে বলবে আমি তো পড়তে জানি না।"[২৬৯] একথা কার অজানা আছে যে, জিবরিল (আ.) যখন প্রথম ওহি কুরআনের সূরা আলাকের প্রথম আয়াত নিয়ে এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললেন— "ইকরা; পড়ুন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি পড়তে জানি না।"[২৭০] এ ছাড়াও রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে অনেক ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে বাইবেলে। অতএব, এটা সুস্পষ্ট যে এই ভবিষ্যদ্বাণী রাসূলুল্লাহ মুহাম্মদ ﷺ-এর কথা উল্লেখ করেছে।'[২৭১]

---

[২৬৭]. জন-১৬ : ১৩

[২৬৮]. সূরা নজম-৫৩ : ৩-৪

[২৬৯]. আযাইয়াহ-২৯ : ১২

[২৭০]. সহিহ বুখারি, হাদিস নং- ৩৩৯২, ৪৯৫৩, ৪৯৫৫, ৪৯৫৬, ৪৯৫৭, ৬৯৮২, মুসলিম-১/৭৩ হাদিস নং ১৬০, মুসনাদ আহমাদ, হাদিস নং ২৬০১৮। ইবনে কাসিরসহ যেকোনো তাফসিরের সূরা আলাকের প্রথম আয়াতের ব্যাখ্যা।

[২৭১]. The Holy Bible (KJV & RSV), কিতাবুল মোকাদ্দস (BACIB), Biblehub.com, https://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad_in_the_Bible, পবিত্র বাইবেল পরিচিতি ও পর্যালোচনা- ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহ.); আমি কেন খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করলাম না- আবুল হোসেন ভট্টাচার্য। Concept of God in major religions by Dr. Zakir Naik, Mohammmad Sm in various world religious screiptures by Dr. Zakir Naik.

ভাবি কোনো কিছু না বলে চুপ করে বসে থাকলেন। আমি বললাম,

'শুধু খ্রিষ্টান ধর্মই নয়ই বরং হিন্দু ধর্মেও একজন স্রষ্টা এবং সর্বশেষ রাসূলুল্লাহ মুহাম্মাদ ﷺ সম্পর্কে বলা হয়েছে।'

'তাই নাকি?'

'জি, হিন্দু ধর্মে একেবারে সুস্পষ্টভাবে পূজা অর্চনার ব্যাপারে গ্রন্থগুলো নিষেধ করেছে, নিরুৎসাহিত করেছে। ভগবৎ গীতাতে বলা হয়েছে,

"জাগতিক কামনার বশীভূত হইয়া যাহাদের বিবেক বুদ্ধি লোপ পাইয়াছে, তাহারা অপদেবতার পূজা করে।" আরও বলা হয়েছে; "হে অর্জুন, আমি ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান সবকিছুকে জানি কিন্তু আমাকে কেহ জানে না।[২৭২] কি দেবগণ কি মহর্ষিগণ। কেহই আমার প্রভাব বা উৎপত্তি সম্পর্কে জ্ঞাত নহে। কেননা, আমি দেব ও মহর্ষিগণের সর্বপ্রকারের আদিকারণ।"[২৭৩]

উপনিষদে বলা হয়েছে, "একম এবাদ্বিতীয়ম" ঈশ্বর একজনই, দ্বিতীয় কেউ নেই।[২৭৪] Shree Purohit Swami এবং W.B.Yeats অনুবাদ করেছেন "One without a second."[২৭৫]

"না কছ্য কছুজ জানি না কধিপা অর্থাৎ তাঁর কোনো পিতা নেই, মাতা নেই কোনো প্রভু নেই।[২৭৬] না তস্যি প্রতিমা অস্তি অর্থাৎ তাঁর কোনো প্রতিমা নেই।"[২৭৭]

"তাঁর রূপ বা আকৃতি দৃষ্টি শক্তির অধীন নয়। কোনো চক্ষু তাঁকে দেখতে পায় না। যারা হৃদয় আত্মা দিয়ে তাকে চিনতে পারে উপলব্দি করতে পারে কেবল তারাই অমরত্ব লাভ করে।"[২৭৮]

'থামলে কেন বলো...'

'একটানা বললে আপনি বুঝতে পারবেন না, তাই।'

'নো প্রবলেম। তুমি বলে যাও।'

---

২৭২. ভগবৎ গীতা-৭/২৬

২৭৩. ভগবৎ গীতা-১০/২

২৭৪. ছান্দোগ্য উপনিষদ- ৬/২/১

২৭৫. The ten principle Upanishad, Chhandogya-Upanishad by Shree Purohit Swami and W.B.Yeats, p;-86,

২৭৬. শ্বেতাশ্বতরা উপনিষদ-৬/৯, The principle Upanishad by S.Radhakrishnan, pg-263, https://archive.org/details/PrincipalUpanishads

২৭৭. শ্বেতাশ্বতরা উপনিষদ-৬/১৯

২৭৮. শ্বেতাশ্বতরা উপনিষদ-৪/২০ The principle Upanishad by S.Radhakrishnan, pg-737

ঠিক আছে বলছি। বেদও এক ঈশ্বরের কথা বলে। প্রধান ধর্মগ্রন্থের চারটি বেদেই এক ঈশ্বর নিয়ে কথা বলা হয়েছে। প্রতিমা তৈরি করতে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন, "না ঊর্ধ্বে না নিচে, না জগতের মধ্যে কোথাও তাঁর কোনো প্রতিমা, নেই কোনো প্রতিকৃতি নেই, তাঁর মতো কোনো কিছুই নেই, তিনি মহিমান্বিত।"[২৭৯]

"যারা অসংভূতির (বাতাস, পানি, আগুন ইত্যাদি) পূজা করে তারা অন্ধকারে প্রবেশ করে। তারা আরও বেশি অন্ধকারে প্রবেশ করে যারা সংভূতির (চেয়ার, টেবিল, মানুষের হাতে বানানো কিছু) পূজা করে।[২৮০] ও সখা (বন্ধু), ঈশ্বরের সঙ্গে অন্য কাউকে ডাকিও না, হিংসিত হয়ো না।"'[২৮১]

'ওকে, বুঝলাম। কিন্তু তারা এসব মানে না কেন?'

'মানে না তা ঠিক নয়। হিন্দুরা তো ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে তেমন কিছু জানে না বললেই চলে। না জানলে মানবে কোথা থেকে? কিন্তু বড়ো বড়ো পণ্ডিতরা এক ঈশ্বরেই বিশ্বাস করেন। ঋকবেদের ১ম মণ্ডলে ঋষি এক ঈশ্বর সম্পর্কে প্রশ্ন করেছেন, যিনি এই ছয় লোক স্তম্ভন করেছেন, "যিনি জন্ম রহিত রূপে নিবাস করেন তিনি কি সেই এক?"[২৮২] এই সূক্তের ব্যাখ্যায় শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "এই সূক্ত ও বেদের অন্য অনেক সূক্ত থেকে প্রমাণ হয় যে, ঋষির মনে সবসময় এক ঈশ্বর চিন্তাই বিরাজমান ছিল।"'

'আর কেউ স্বীকার করেছেন?'

'অবশ্যই করেছেন। এক ঈশ্বর সম্পর্কে বিশ্বকর্মা ঋষি বলেন, "তাঁর মন বৃহৎ, তিনি নিজে বৃহৎ, তিনি নির্মাণ করেন, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সবকিছু অবলোকন করেন।"[২৮৩] বেদে আরও বলা হয়েছে, "ঈশ্বর এক, তিনি ব্যতীত অন্য কেহ নেই। যিনি বিধাতা, যিনি বিশ্বভুবনের সকল কিছু অবগত আছেন, যিনি একমাত্র।"[২৮৪] আরও বলা হয়েছে; "তিনি এক প্রভু, তাঁর সকল দিকে চক্ষু, সকল দিকে হস্ত,

---

[২৭৯]. যযুর্বেদ সংহিতা, ৩৩/১-২
[২৮০]. যযুর্বেদ সংহিতা, ৪০/৮
[২৮১]. ঋগ্বেদ-৮/১/১
[২৮২]. ঋগ্বেদ-১/১৬৪/৬
[২৮৩]. ঋগ্বেদ-১০/৮২/২
[২৮৪]. ঋগ্বেদ-১০/৮২/৩

সকল দিকে পদ।"[২৮৫] ঋগবেদের ৩য় মণ্ডলের ৫৫ সূক্তে ঋক আছে ২২টি। সবগুলোর শেষে বলা আছে; দেবগণের মহৎ বল একই।'

'এটাও বুঝলাম না?'

'ঠিক আছে, স্কলাররা কী বলেছেন তা বলি। পণ্ডিত Wilson অর্থ করেছেন, "Great and unequalled is the might of the Gods" বেদের মহা পণ্ডিত Max Muller অর্থ করেছেন, "The great divinity of the gods are one. Muir বলেছেন, "the divine power of the gods are unique।"'

'তাহলে স্কলারদের এক ঈশ্বরে স্বীকৃতি সুস্পষ্ট?'

'এতক্ষণে তো আপনি ক্লিয়ার হওয়ার কথা। আরেকটু ক্লিয়ার করি, রমেশচন্দ্র দত্ত ঋগবেদের ১ম খণ্ডের ভূমিকায় বলেন, "বেদের ঋষিগণ স্বীকার করে নিয়েছেন যে দেবগণের কার্যসমূহ ভিন্ন। তাঁরা একই দৈব ক্ষমতার অধীন, মূলত; একজন ঈশ্বরই তাদের পরিচালনা করছেন। সবকিছু তাঁরই অধীন। সুতরাং ঈশ্বর বহু নন। তিনি এক, অসীম করুণাময়। ঐশ্বরিক বল এবং দেবতাদের কাজ এই দুয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। বিশ্বনিখিলে সর্বত্র যে কাজ চলছে প্রকৃতপক্ষে তার মূলে কোনো দেবতা নেই। আর্যগণ 'দেবতা আছে' এরূপ কল্পনা করে এক একটি দেবতার নাম দিয়েছিলেন মাত্র। আছেন কেবল একমাত্র ঈশ্বর।"[২৮৬] বলা বাহুল্য, সমগ্র বেদে কোথাও দুর্গা শব্দটি নেই, ভগবান শব্দটিও নেই। শ্বেতশ্বেতর উপনিষদে বলা হয়েছে, "ঈশ্বরের কোনো লিঙ্গ নেই অথচ স্ত্রী লিঙ্গের দুর্গার পূজা করা হয়।" আপাতত, এইটুকুতে আমরা ক্লিয়ার যে সর্বশক্তিমান স্রষ্টা আসলে একজনই এবং প্রতিমা পূজা পারমিটেড নয়। ক্লিয়ার?'

'একেশ্বরবাদ সম্পর্কে ক্লিয়ার। কিন্তু তুমি বলেছিলে যে হিন্দু ধর্মগ্রন্থে নবি মুহাম্মদ সম্পর্কে বলা হয়েছে?'

'জি, সেটা আপনাকে এখন ক্লিয়ার করছি। হিন্দুধর্ম গ্রন্থগুলোর মধ্যে *ভবিষ্য পুরাণ* অন্যতম। যেটাতে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কথা বলা হয়েছে। এই পুরাণে "কল্কি অবতার" নামে একজন অবতার আসবে বলে ভবিষ্যদ্‌বাণী করা হয়েছে। এই অবতার হচ্ছে সর্বশেষ অবতার। তারপর আর কোনো অবতার আসবে না।

---

[২৮৫]. ঋগ্বেদ-১০/৮১/৩

[২৮৬]. ঋগবেদ সংহিতা, রমেশচন্দ্র দত্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬-১৭

হিন্দুরা মনে করে, এই কল্কি অবতার এখনও আসেনি। অথচ, এই অবতার সম্পর্কে সমস্ত ভবিষ্যদ্‌বাণীগুলো শুধু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গেই মিলে আর কারও সঙ্গে নয়।'

'মানে নবি মুহাম্মদের সঙ্গে?'

'জি, কয়েকটি ভবিষ্যদ্‌বাণী আপনাকে বলি, তাহলেই ক্লিয়ার হয়ে যাবেন। কল্কি পুরাণে বলা হয়েছে,

কল্কি অবতারের মায়ের নাম হবে "সুমতি" অর্থাৎ ভালো আত্মা। যার আরবি প্রতিশব্দ হলো "আমিনা"। আর পিতার নাম হবে "বিষ্টুযশা" অর্থাৎ ঈশ্বরের দাস। যার আরবি প্রতিশব্দ "আব্দুল্লাহ"।[২৮৭] রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মায়ের নাম ছিল আমিনা, বাবার নাম ছিল আব্দুল্লাহ। আরও বলা হয়েছে, সেই কল্কি শাম্ভালা, গ্রামের প্রধান বিপ্র মহাত্মা বিযশার ঘরে জন্ম গ্রহণ করবেন।[২৮৮] এখানে শাম্ভালা গ্রাম মানে নিরাপদ বা শান্তিময় গ্রাম। সবাই জানে মক্কা হচ্ছে পৃথিবীর একমাত্র নিরাপদ ও শান্তিময় স্থান।'

'কিন্তু এটা কি তাঁরা মানে?' সন্দেহের চোখে বললেন ভাবি।

'মানা না মানা যার যার ব্যক্তিগত ব্যাপার। পৃথিবীর কেউ না মানলেও সত্য মিথ্যা হয়ে যাবে না। সত্য সবসময়ই সত্য। আর এসব কথা তো ডকুমেন্টেড। আচ্ছা, সাম্ভালার ব্যাপারে আরেকটু তথ্য দিই। *Encyclopedia of the peoples of Africa and the Middle East* গ্রন্থে বলা হয়েছে, "খ্রিষ্টপূর্ব ১৬ শত শতাব্দীর সময়ও বর্তমান সৌদি আরব, সিরিয়া, ইরাক এইসব অঞ্চলকে সাম্ভালা নামেই চেনা হতো।"[২৮৯] বিপ্র মহাত্মা মানে ধর্মীয় নেতা। সে সময় মক্কাতে নেতৃত্ব ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বংশের কাছে।

শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণে বলা হয়েছে, "বড়ো বড়ো অবতার ২৪ জন, কল্কি অবতার সর্বশেষ অবতার হবেন। তারপর আর কোনো অবতার আসবেন না।"[২৯০]

---

২৮৭. কল্কি পুরাণ, ২/১১

২৮৮. কল্কি পুরাণ, ২/৪

২৮৯. Encyclopedia of the peoples of Africa and the Middle East by Jamie sokes, Editor Anthony Gorman and Andrew Newman, Historical consulants, p:- 629

২৯০. শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ ১/৩/২৫

১২তম স্কন্ধের ২য় অধ্যায়ে বলা হয়েছে, "অতুলনীয় কান্তি অনিমাদি অষ্টৈশ্বর্যযুক্ত জগৎপতি কল্কি অসজনবিমর্দী দেবদত্ত অশ্বে আরোহণ করিয়া আগমন করিবেন এবং সেই শিগ্রগামী অশ্বে পৃথিবীতে বিচরণ করিয়া কপট রাজবেশধারী দস্যুগণকে আঘাতে বধ করিবেন। জগদ্পতি যিনি আটটি স্বর্গীয় গুণে গুণান্বিত হবেন।" এই আটটি গুণ সম্পর্কে মহাভারতে বলা হয়েছে,

১. প্রজ্ঞা; অদৃশ্যের মাধ্যেমে তত্ত্ব লাভ।

২. কৌলং; উচ্চবংশীয় হবেন।

৩. দম; নিজের প্রবৃত্তিকে দমন করার ক্ষমতা থাকবে।

৪. শ্রুতং; ওহি বা আকাশবাণী শুনবেন।

৫. পরাক্রম; শক্তিশালী ও বলিষ্ঠ হবেন।

৬. বহুভাষিতা; মিষ্টভাষী হবেন।

৭. দান; বদান্যতা।

৮. কৃতজ্ঞতা; কৃতজ্ঞ হৃদয়ের হবেন।

এই আটটি গুণই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মধ্যে পরিপূর্ণভাবে ছিল। এরপর বলা হয়েছে, কল্কি অতি দ্রুতগামী ঘোড়ায় চড়বেন। রাসূলুল্লাহ মুহাম্মদ ﷺ একমাত্র রাসূল, যিনি আল্লাহ প্রদত্ত বোরাক তথা অতি দ্রুতগামী উড়াল দেওয়া ঘোড়ায় চড়েছেন। এরপর বলা হলো, তিনি জমিনে বিচরণ করে রাজবেশধারী দস্যুগণকে আঘাতে বধ করিবেন অর্থাৎ অত্যাচারী রাজাদের পরাজিত করবেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর নবুয়াতের জীবনে সব অত্যাচারী রাজাকে বধ করেছেন।'

'স্ট্রেইঞ্জ!'

'আরও বলা হয়েছে, কল্কি দীক্ষা নিবেন মহেন্দ্র পর্বতে।[২৯১] মহেন্দ্র মানে, মহান যে ইন্দ্র, অর্থাৎ যাহা মহা আলোকিত। ইন্দ্র আলোর প্রতীক। বেদে বহু যায়গায় সূর্যকে ইন্দ্র বলা হয়েছে। মহেন্দ্র মানে মহা আলোকিত স্থান। মুহাম্মদ ﷺ দীক্ষা নিয়েছিলেন হেরা গুহায়। যাকে বলা হয় জাবাল-এ-নূর বা আলোকিত পাহাড়।

---

[২৯১]. কল্কি পুরান ৩/১

পরের পিকটি দেখুন...'

Thus, they are completely unable to protect themselves from the influence of Kali.

Text 48

iti janaka vaco nisamya kalkih
kalikula nasa mano'bhilasajanma
dvija nija vacanair tadoparato
gurukula vasam uvasa sadhunathah

When Lord Kalki, the maintainer of the devotees, who had taken birth with a desire to destroy the influence of Kali-yuga,

Sri kalki purana

ভাবি কয়েক সেকেন্ড পিকটি দেখে বললেন, 'সংস্কৃত বুঝিনি, কিন্তু ট্রান্সলেশন বুঝেছি। তারপর... আর কিছু বলা হয়েছে?'

'জি, আরও বলা হয়েছে যে, "সঙ্গে থাকবে তার ৪ ভাই।[২৯২] পূর্ব যুগে পূজক দ্বিজাতিরা নানাবিধ অলংকার দ্বারা অলংকৃত দেবমূর্তিসমূহকে ইন্দ্রজাল ব্যবহার করে সকলকে মোহিত করত, তা বিলোপ করা হবে।"[২৯৩] সব শ্লোক বিশ্লেষণ করতে অনেক সময়ের দরকার।'

ভাবি বললেন, 'সিম্পলি বললে আমি বুঝব।'

'ওকে দেখুন, মুহাম্মদ ﷺ শয়তানের বিরুদ্ধে লড়েছেন যখন মানুষ এক আল্লাহর ইবাদত রেখে মূর্তি পূজায় নিমগ্ন ছিল। তারা শয়তান থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পুরোপুরি অক্ষম হয়ে গিয়েছিল। তখনই রাসূলুল্লাহ মুহাম্মদ ﷺ এসে মানুষকে শয়তানের প্রোপাগান্ডা থেকে রক্ষা করেন। কাবা ঘর থেকে মূর্তি অপসারণ করেন। চার খলিফা ছিলেন তাঁর ভাইয়ের মতো সঙ্গী। এগুলো সবই মুহাম্মদ ﷺ-এর সঙ্গে মিলে যায়। আচ্ছা বলুন তো, এখনকি ঘোড়ায় চড়ে তলোয়ার দিয়ে যুদ্ধ করার সময় আছে? পৃথিবীতে কি এখন রাজাদের রাজত্ব আছে?'

'না, এসময় তো অনেক আগেই পেরিয়ে গেছে।'

---

[২৯২]. কল্কি পুরান ২/৫, ৪৭-৪৮। স্ক্রিনশট Sri kalki purana translated by A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Founder-Acarya of the International Society for Kribhna Consciousness.

[২৯৩]. কল্কি পুরাণ ৩০/৩

'তাহলে কল্কি ভবিষ্যতে আসার ধারণা অবশ্যই বোকামি। আরও বলা আছে, "কল্কি ব্রাক্ষণদের (ধর্মীয় নেতা) উৎপীড়নে তাঁর নিজের দেশ ত্যাগ করবে। কারণ, ব্রাক্ষণরা সব শয়তানের পাল্লায় পরে বিভিন্ন অধর্ম ও অপকর্মে লিপ্ত হবে। কল্কি আবার নিজ অঞ্চলে ফিরে এসে দখল করে নিবেন এবং শত্রু হতে একে মুক্ত করবেন। কল্কি হবেন ধর্মের মূল তত্ত্বের পুনঃপ্রবর্তক, যা মানুষ ভুলে গেছে।"[২৯৪]

মক্কার মুশরিকরা যখন এক আল্লাহর ইবাদত তথা ধর্মের মূলতত্ত্ব ছেড়ে মূর্তি পূজা করছিল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এসে মূর্তি পূজা দূর করে তাওহিদ তথা ধর্মের মূলতত্ত্ব প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করেন। এর জন্য মক্কার প্রধান ধর্মীয় নেতাদের অত্যাচার আর নিপীড়ন তাঁর ওপর নেমে আসে। ফলে তিনি মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেন। পরবর্তীকালে আবার তিনি নিজ দেশ মক্কায় ফিরে আসেন এবং মক্কাকে শত্রুমুক্ত করেন।

ভবিষ্য পুরাণে বলা হয়েছে, 'একজন ম্লেচ্ছ তাঁর সঙ্গী সাথি নিয়ে মরুস্থলে আবির্ভূত হবেন। তাঁর নাম হবে মুহাম্মদ।[২৯৫] পরের পিকটি দেখুন...'

Bhavishya Puran: Prati Sarg, Part III: 3, 3 5-27

एतस्मिन्नन्तरे म्लेच्छ आचार्येण समन्वितः ।

महामद इति ख्यातः शिष्यशाखासमन्वितः ॥ ५ ॥ Mahamada

एतस्मिन्नन्तरे म्लेच्छ आचार्येण समन्वितः ।

His name will be Mahamad:

महामद इति ख्यातः शिष्यशाखासमन्वितः ॥ ५ ॥

Bhavishya Puran: Prati Sarg, Part III: 3, 3, 5

अहमिद्धि पितुः परि मेधामृतस्य जग्रह । अहं सूर्य इवाजनि ॥

सामवेद० । प्र० २ । द० ६ मं० ८ ॥

A Foreigner Truth Teacher will come with his followers his name will be MAHAMAD and he will be also known AHAMAD. (Mohammad & Ahmad are same meaning).

পুরাণে মুহাম্মদ ﷺএর নাম উল্লেখ

---

[২৯৪]. কল্কি পুরাণ ২/২২, ৪৭, ২-৪৭, ৮/২৭-৩২

[২৯৫]. ভবিষ্য পুরাণ-৩/৩/৫-২৭ অবতার নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, এখানে মাত্র কয়েকটি দিয়ে প্রমাণ করা হয়েছে যে ইনিই মুহাম্মাদ সা.।

ভাবি আগের মতো আবারো কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে সম্মতি প্রকাশ করলেন। আমি বললাম, 'এবার নেক্সট পিক দেখুন সংস্কৃত ম্লেচ্ছ অর্থ একজন বিদেশি লোক, যে ভারতীয় নয় এবং যে সংস্কৃত ভাষায় কথা বলে না।

म्लेच्छ् *mlech* (=√*mlich*), cl. 1. P. (Dhātup. vii, 25) *mlecchati* (Gr. also pf. *mimlec-cha*, fut. *mlecchitā* &c.; Ved. inf. *mlecchitavai*, Pat.), to speak indistinctly (like a foreigner or barbarian who does not speak Sanskṛit), ŚBr.; MBh.: Caus. or cl. 10. P. *mlecchayati*, id., Dhātup. xxxii, 120.
Mlishṭa, mfn. spoken indistinctly or barbarously, Pāṇ. vii, 2, 18; withered, faded, faint (= *mlāna*), L.; n. indistinct speech, a foreign language, L.
Mlishṭokti, f. indistinct or barbarous speech, Vop.
Mleccha, m. a foreigner, barbarian, non-Aryan, man of an outcast race, any person who does not speak Sanskṛit and does not conform to the usual Hindu institutions, ŚBr. &c. &c. (f. ī); a person

সংস্কৃত ডিকশনারিতে 'ম্লেচ্ছ'-এর অর্থ

মরুস্থল অর্থ মরুভূমি থেকে। তাঁর সঙ্গে থাকবেন শিষ্যশাখা অর্থাৎ সাহাবিরা। রাজা মরুস্থলবাসী সেই মহাদেব-এর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করবে। এখানে দেব অর্থাৎ স্বর্গীয় সত্তা মহাদেবং মরুস্থল অর্থাৎ মরুভূমির একজন স্বর্গীয় সত্তা।

"নমস্থে গিরিজানাথ মরুস্থল নিবাসিনে" অর্থাৎ শ্রদ্ধা নিবেদন সেই মরুস্থলবাসীকে যে মানবজাতির গর্ব। "ত্রিপুরাসুরনাসায় বহুমায়া প্রবর্তিনে" অর্থাৎ সে বহুমুখী জ্ঞান ও উপায় দ্বারা ত্রিপুরাসুর (শয়তান)-কে নাশ করে। "ম্লেচ্ছৈগুপ্তায় শুদ্ধায় সাচ্চিদয়ানন্দ রুপাইন" অর্থাৎ অতি মহৎ গুণাবলির অধিকারী শুদ্ধ ম্লেচ্ছদের দ্বারা সুরক্ষিত থাকবে। আপনি কি বুঝতেছেন?'

'হুম, বুঝতেছি?'

'আপনার সংশয় কাটানোর জন্য আরও কিছু শ্লোক বলি। অয়োনি (ঈশ্বর) হতে বরপ্রাপ্ত (ওহিপ্রাপ্ত) খ্যাতনামা মহামদ (মুহাম্মদ ﷺ) পথভ্রান্তদের সঠিক পথ দেখানোর জন্য পিচাশদের (মাংস খাদকদের) সঠিক পথে আনতে ব্যস্ত। আরও বলা হয়েছে, "মদিনা পুরা যাত তোশা ত্রিত শায়ম স্মুরথাম" অর্থাৎ মদিনা হচ্ছে তাদের পবিত্র স্থান।

তাদের খতনা দেওয়া হবে। শিখা-টিকলি থাকবে না তাদের দাড়ি থাকবে। তারা হবে সকল দোষের খণ্ডনকারী। তারা উচ্চস্বরে আহ্বান জানাবে (আজান)।

অথর্ব বেদে বলা হয়েছে; "হে মানব মণ্ডলি, মনোযোগ দিয়ে শোনো। ভবিষ্যতে নরাশংস আসবে। আমি এই কৌরমকে ৬০ হাজার ৯০ শত্রুর মধ্যে সুরক্ষিত রাখব।"[২৯৬] এখানে, নরাশাংস মানে যিনি প্রশংসনীয় অর্থাৎ আরবিতে মুহাম্মাদ আর কৌরম হচ্ছে নিজ দেশ ত্যাগকারী এবং শান্তির নিরাপত্তার পতাকা /ঝাণ্ডাবাহী। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ দেশ ত্যাগ করে মক্কা থেকে মদিনা হিজরত করেন এবং মক্কা মদিনায় শান্তির বাহক ঐতিহাসিকভাবেই স্বীকৃত। ৬০ হাজার ৯০ জন রুশমেষু থেকে রক্ষা করা হবে। রুশমেষু শব্দ দিয়ে শত্রু এবং আরবের অধিবাসী দুটোই বোঝানো হয়। মানে তাকে ৬০ হাজার ৯০ জন শত্রু থেকে রক্ষা করা হবে। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ আশপোশে কাফির বা মুনাফিকের সংখ্যা ছিল প্রায় ৬০ হাজার ৯০ জন।[২৯৭]

"উষ্ট্রা ঈয়াশা প্রবাহানো"[২৯৮] তাহার বাহন হবে উট দ্বারা বাহিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাহন ছিল উট দ্বারা বাহিত। অন্যদিকে, হিন্দুদের ব্রাহ্মণের উটে চড়া নিষিদ্ধ।[২৯৯] আশাকরি আর বলা লাগবে না। আপনি বুঝতে পেরেছেন।'

ভাইয়া বলল, 'আরও আছে?'

'হুম, এমন আরও বহুসংখ্যক ভবিষ্যদ্‌বাণী করা আছে। মাত্র এই কয়টি দিয়েই প্রমাণ হয় যে, এই কল্কি শেষ নবি মুহাম্মদ ﷺ ছাড়া আর কেউ নয়। অতএব, যে ব্যাক্তি দাবি করে যে, সে তার শাস্ত্র মেনে চলে। তাহলে তাকে অবশ্যই শেষ নবি এবং তাঁর আনিত বিধান মেনে নিতে হবে। সুতরাং এটা ১০০% ক্লিয়ার যে, সর্বশেষ রাসূলুল্লাহ, মুহাম্মদ ﷺ-এর মাধ্যমে দ্বীনই হলো একমাত্র জীবনব্যবস্থা যার নাম ইসলাম।

পৃথিবীর অন্য কোনো ধর্মগ্রন্থে বলা হয়নি যে, সেই ধর্মই একমাত্র জীবনব্যবস্থা। শুধুমাত্র আল-কুরানেই বলা হয়েছে ইসলামই একমাত্র জীবনব্যবস্থা।[৩০০] আর আল-কুরআন কখনোও বিকৃত হবে না। কেননা, তার হেফাজতের দায়িত্ব

---

২৯৬. অথর্ব বেদ, শ্রীবিজন বিহারী গোস্বামী, ২০/৯/৩১
২৯৭. দেখুন, মনোনীত ধর্ম : মুহাম্মদ আব্দুর রব্ব আফ্‌ফান, পৃ : ৬৭
২৯৮. অথর্ববেদ ২০/১২৭/২
২৯৯. মনুসংহিতা ১১/২০১
৩০০. সূরা আলে ইমরান-৩ : ৮৫

স্বয়ং আল্লাহই নিজেই নিয়েছেন। তিনি সূরা হিজরে বলেন, "নিশ্চয়, আমরা এই কুরআন নাজিল করেছি, এবং আমরাই এর সংরক্ষক।"[৩০১] অতএব, সত্য গ্রহণ করতে চাইলে একজন মানুষের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট।'

আমার কথা শেষ হলে ভাইয়া নিশ্চুপ হয়ে বসে তার হাতের নখগুলো পর্যবেক্ষণ করতে থাকল। প্রায় পাঁচ মিনিট কোনো কথা হলো না। সুনসান নীরাবতা বিরাজ করছে। ভাবি মাথা নিচু করে গভীরভাবে কী যেন চিন্তা করছেন। হঠাৎ মাথা তুলে ভাইয়াকে উদ্দেশ্য করে ভেজাকণ্ঠে বলল,

'বাবা মাকে একটু ডাকবা?'

'ভাইয়া তাঁর দিকে একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকল। তারপর আমার দিকে ফিরে চোখ ইশারা করল। ভাইয়ার চোখের ভাষা বুঝতে পেরে আমি আব্বু আম্মুকে ডেকে আনলাম। তারাও কিছু বুঝে উঠতে না পেরে সন্দিহান মন নিয়ে বসে পড়ল। আম্মু ভাবির পাশেই বসল। ভাবির চোখে পানি দেখে আম্মু আরও বেশি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল। কী হলো? আমাদের কোনো আচরণে কষ্ট পেল নাকি? এই চিন্তাগুলো আম্মুকে ভাবিয়ে তুলল। আম্মু ভাবির মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল,

'তোমার কী হয়েছে মা? আমাদের কোনো আচরণে কি মনে কষ্ট পেয়েছ? কাঁদছ কেন মা? আচ্ছা আমাকে বলো, আমরা কি কোনো কষ্ট দিয়ে ফেলেছি?'

ভাবি আম্মুর হাতটা হাতের মুঠোয় ধরে বললেন,

'না মা, আপনারা আমাকে কষ্ট দেবেন কেন? জন্মের পর থেকে আমার বাবা মাকে আলাদা থাকতে দেখেছি। কোনো দিন ফেমিলির বন্ধন দেখিনি। আপনাদের কাছে এসে সেই বন্ধন আর ভালোবাসা খুব কাছ থেকে উপলব্ধি করতে পেরেছি। আমি অন্য ধর্মের জেনেও আপনারা আমার সঙ্গে এতটুকু দুর্ব্যবহার করেননি। আমাকে অনেক আপন করে নিয়েছেন।

---

৩০১. সূরা হিজর-১৫ : ৯; এখানে কুরআনে আল্লাহ নিজেকে বোঝাতে বহুবচনের শব্দ ব্যবহার করেছেন তাই আমরাও বহুবচনই অনুবাদ করেছি। ইট মূলত রাজকীয় বহুবচন। এর দ্বারা বহুত্ব বুঝায় না, অধিক সম্মান বুঝায়।

আমি ইসলাম সম্পর্কে পড়াশোনা করেছি। বিজ্ঞান ও মানবাধিকার সম্পর্কিত ইসলামের ভাষ্যগুলোও আপনাদের ছেলের কল্যাণে জানতে পেরেছি। ও (ভাইয়ার দিকে ইঙ্গিত করে) নাস্তিক থাকার সময় যতটা উগ্র ও বাজে আসক্তিতে অভ্যস্ত ছিল, প্র্যাকটিসিং মুসলিম হওয়ার পর তা পুরোটাই ত্যাগ করেছে। তার মধ্যে একটা দৈবিক পরিবর্তন লক্ষ করেছি।

বড়ো ভাইয়ের বিশ্বাস ফেরানোর জন্য মিরাজ ছোটো ভাই হয়ে যে দায়িত্ব পালন করেছে, আমার বাবা আমার ক্ষেত্রে মৌলিক দায়িত্বগুলোও সেভাবে পালন করেনি। নিজেদের স্বাধীন ও লাগামহীন বাসনার পেছনে আজীবন ছুটেছে। আপনাদের মুসলিম ফ্যামিলির বন্ধনগুলো আমার আবেগকে নাড়া দিয়ে গেছে। যেটুকু সংশয় মনের মধ্যে অবশিষ্ট ছিল আজ সেটিও মিরাজ ক্লিয়ার করে দিলো। মা, আমি আপনাদের মধ্যে শামিল হতে চাই, আমি ইসলাম গ্রহণ করতে চাই। বলুন, আমাকে কী করতে হবে?'

আম্মু কিছুক্ষণের জন্য যেন বোধশক্তি হারিয়ে ফেলল। স্তম্ভিত হয়ে থাকল কয়েক মুহূর্ত। চোখ দিয়ে কয়েকফোটা আনন্দ অশ্রু গড়িয়ে পড়লে তবেই সংবিৎ ফিরে পেল আম্মু। তৃপ্ত বুকে মমতার গালিছা বিছিয়ে দিয়ে ভাবিকে জড়িয়ে ধরল আম্মু। আমরা চোখটা কেন জানি ঝাপসা হয়ে উঠল। ঠোঁটগুলোও মৃদু কম্পন শুরু করে দিলো। মনে পড়ে গেল, *দ্যা রিভার্টস; ফিরে আসার গল্প* বইয়ের জীবন্ত উপমা ক্রিস্টিন বেকার বোনের কথা। *ফেরা* বইয়ের সিহিন্তা শরিফা, নাইলাহ আমাতুল্লাহর কথা। যারা ঈমানের স্বাদ পেয়ে খ্রিষ্টান থেকে আজ ঈমানদার মুসলিমা। এক একটি উপমা, এক একটি দৃষ্টান্ত, জ্বলে উঠে নিভে যাওয়া কোনো স্ফুলিঙ্গ নয়। আলো ছড়িয়ে দেওয়া এক একটি নক্ষত্র। ভাইয়া আর আব্বুর ধরা কণ্ঠে উচ্ছসিত ধ্বনি ভেসে আসলো 'আলহামদুলিল্লাহ'।

একটু পরেই শক্ত দেয়ালগুলোতে একটা মহাসত্য প্রতিধ্বনি হতে থাকল। আর বসন্তের শান্ত বাতাসগুলো সেই বাণীর পবিত্রতা গ্রহণ করে আরও বেশি সুবাসিত হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। আশহাদু আন-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহ।

...ফজরের আজান হয়েছে, সমস্ত আঁধার কেটে গিয়ে নবদিগন্তের সূচনা হলো। আমাদের পরিবারেরও একটা একটা দীর্ঘ কালো রাত শেষ হয়ে সুবহে সাদিক উঁকি দিয়েছে। আমরা তিন ভাই মসজিদে ফজরের সালাত আদায়ের জন্য যাচ্ছি।

আব্বু আগেই চলে গিয়েছেন। পথ চলার ছন্দে মৃদু একটা বাতাস গায়ে দোলা দিয়ে যাচ্ছে। এরকম একটি সকালের জন্যই এতটা সময় অপেক্ষা করেছি। ভাইয়ার কথায় তার দিকে তাকালাম।

'শোন মিরাজ, তুই যে জাকিরকে একটা গ্রহাণুর কথা বলেছিলি, যেটার পৃথিবীতে আঘাত করার সম্ভাবনা আছে, মনে আছে?'

'TV135?'

'হুম। বিজ্ঞানিরা জানিয়েছে, সেটা আসলে পৃথিবীতে আঘাত হানবে না।'

'কেন?'

'বিজ্ঞানীরা সব তথ্য হিসেব করে দেখেছেন যে, পৃথিবীকে আঘাত করার সম্ভাবনা (১/৬৩০০০) ৬৩০০০ ভাগের একভাগ। পার্সেন্টেজ হিসেবে মাত্র ০.০০২%। মানে অঙ্কের ক্ষেত্রে এটা শূন্য (০)।'[৩০২]

'ও আচ্ছা।'

'তোকে একটা কথা বলি, একটা সময় দেখতাম, অনেক মুসলিমরা বাসে, রাস্তায় এমনকী অলি-গলিতেও মসজিদ বানানোর জন্য লোকজন থেকে প্রায় জোর করে টাকা তুলছে। এরপর অনেক ছোটোখাটো হুজরকেও দেখতাম বিভিন্ন অনুষ্ঠানে টাকার বিনিময়ে দুআ করছে। তখন আমি ভাবতাম এগুলোই মনে হয় ইসলাম। কিন্তু পরে কয়েকজন ভালো আলেমের সঙ্গে কথা বলে জানলাম, এগুলোর সঙ্গে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই বরং আলেমরাই এগুলোর বিরোধিতা করেন।

কথা বলতে বলতে আমরা মসজিদের কাছাকাছি চলে আসলাম। দূর থেকে একটা চেনা অবয়ব দেখতে পেলাম মসজিদের সামনে। সুবহে সাদিকের ঝাপসা আলোয় খুব ভালো চিনতে পারলাম না। একটু কাছে আসতেই চোখ জোড়া আটকে গেল আমাদের। মাথায় টুপি, প্যান্টের নিচের দিকটা সুন্দর করে টাখনুর ওপরে গোটানো এক অতি পরিচিত মুখ। ভাইয়া বিস্ময়ের স্বরে বলে উঠলেন,

'জাকির, তুই!'

ভাইয়া প্রায় ছুটে গিয়ে তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকল।

---

৩০২. http://news.msn.com/science-technology/nasa-asteroid-coming-back-but-we-dont-need-to-worry

জাকির ভাই বললেন, 'সারা রাত আমি নিজের সঙ্গে লড়েছি। অনেক তীব্র এবং সূক্ষ্ম বোঝাপড়া করেছি। নিজেকে বারবার প্রশ্ন করেছি। আলহামদুলিল্লাহ্! আমি উত্তরও পেয়েছি।'

এবার আমার দিকে ফিরে বললেন, 'মিরাজ, আমার ফিরে আসার পেছনে অন্যতম একটা কারণ হলো তোর ব্যবহার। তুই যখন উত্তেজিত না হয়ে মুচকি হাসি দিস, তখন আমি ভাবতাম এত আত্মবিশ্বাস আসে কোথা থেকে? কিন্তু এর বিপরীতে তুই যদি আমার সঙ্গে রূঢ় আচরণ করতিস, তাহলে আমি আমার অবিশ্বাসের জেদটাকে আরও বেশি আঁকড়ে ধরে থাকতাম। যেমন, অনলাইনে আমরা যখন কোনো বিষয় নিয়ে বাদানুবাদ করতাম, তখন বিশ্বাসী লোকজন কেউ কেউ এসে আমাদের জাহান্নাম পর্যন্ত ঠেকিয়ে দিত। সেই সঙ্গে অশালীন ভাষা তো আছেই। দেখ মিরাজ, অনেকে এমন আচরণ করে যে, বোঝাই যায় না; কে বিশ্বাসী, আর কে অবিশ্বাসী। কিন্তু সেই পরীক্ষায় তুই পাশ করেছিস।'

দ্বিতীয়বারের মতো আমার চোখদুটো তার জলের স্রোতকে দমিয়ে রাখতে পারল না। সামনের দৃশ্যগুলো আরও ঝাপসা হয়ে উঠল। ভাইয়া নিঃশব্দে জাকির ভাইকে খুব শক্ত করে বুকে জরিয়ে ধরল।

ফজরের সালাত শুরু হয়েছে। আমরা পাশাপাশি দাঁড়ালাম। ইমাম সাহেব সুললিত কণ্ঠে তেলাওয়াত করছেন...

هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا

মানুষের ওপর এমন কিছু সময় অতিবাহিত হয়েছে, যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না।

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا

আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিশ্র শুক্রবিন্দু থেকে, এভাবে যে, তাকে পরীক্ষা করব, অতঃপর তাকে করে দিয়েছি শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন।

إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا

আমি তাকে পথ দেখিয়ে দিয়েছি। এখন সে হয় কৃতজ্ঞ হয়, না হয় অকৃতজ্ঞ হয়...[৩০৩]

---

৩০৩. সূরা ইনসান (দাহর)-৭৬ : ১-৩

গার্ডিয়ান পাবলিকেশন-এর প্রকাশিত বইসমূহ

ক্রম	বই ও লেখকের নাম	মূল্য
১.	প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ– আরিফ আজাদ	৩০০/-
২.	কয়েকটি গল্প : অতঃপর– নাসরিন সুলতানা সিমা	১৩০/-
৩.	হালাল বিনোদন– আবু মুআবিয়াহ ইসমাঈল কামদার অনুবাদ : মাসুদ শরীফ	১৫০/-
৪.	৫০০০ প্রশ্নোত্তরে সীরাতুন্নবী ﷺ– ড. মো. আবদুল মান্নান	৪৯০/-
৫.	নেতৃত্বের প্রাথমিক বোঝাপড়া– ড. মুনির উদ্দিন আহমেদ (বাদল)	২৫০/-
৬.	মুক্তিযুদ্ধের বয়ানে ইসলাম– পিনাকী ভট্টাচার্য	২৫০/-
৭.	বি স্মার্ট উইথ মুহাম্মাদ ﷺ– ড. হিশাম আল আওয়াদি অনুবাদ : মাসুদ শরীফ	২৫০/-
৮.	বিয়ে– রেহনুমা বিনত আনিস	২৫০/-
৯.	দ্যা রিভার্টস : ফিরে আসার গল্প– সামছুর রহমান ওমর, কানিজ শারমিন সিঁথি	৩৫০/-
১০	বন্ধন– উস্তাদ নোমান আলী খান	২৫০/-
১১	এরদোয়ান : দ্যা চেঞ্জ মেকার– হাফিজুর রহমান	৪০০/-
১২	রোহিঙ্গা গণহত্যা : কাঠগড়ায় সু চি– ইমরুল কায়েস	২৫০/-
১৩	আকাশ ছোঁয়া স্বপ্ন দেখ– আমিনুল ইসলাম ফারুক	২২০/-
১৪	সানজাক-ই উসমান– প্রিন্স মুহাম্মদ সজল	৫০০/-
১৫	নাফ নদীর ওপারে– আসাদ পারভেজ	৩০০/-
১৬	ডেসটিনি ডিজরাপ্টেড– তামিম আনসারি অনুবাদ : আলী আহমাদ মাবরুর	৫০০/-
১৭	বাতিঘর– মাসুদা সুলতানা রুমী	৩৭৫/-
১৮.	বেবিজ ডায়েরি– সম্পাদনা : মুজাহিদ শুভ	৪৫০/-
১৯.	অ্যা লেটার টু অ্যাথিইস্ট : মুগনিউর রহমান তাবরীজ	৩৩৫/-

প্রকাশিতব্য বইসমূহ

১. প্যালেস্টাইনের বুকে ইজরাইল– আসাদ পারভেজ
২. মানবাধিকার ও ইসলাম– প্রফেসর ড. মো. নুরুল ইসলাম
৩. জ্বলে ওঠো সাহসের মন্ত্রে– আ জ ম ওবায়দুল্লাহ
৪. আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আলোচনা– ডা. আবদুল মোমিন
৫. সাইমুম সমগ্র (১২ খণ্ড)– আবুল আসাদ
৬. গুড প্যারেন্টিং– নিছার আতিক
৭. দ্যা প্রোডাক্টিভ মুসলিম- মুহাম্মাদ ফারিস, অনুবাদ : মিরাজ রহমান
৮. রিভাইব ইয়োর হার্ট– উস্তাদ নুমান আলী খান, অনুবাদক : মারদিয়া মমতাজ
৯. দ্যা ব্যাটল অব ইসলাম- মেজর জেনারেল (অব.) সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম (বীরপ্রতীক)
১০. লেটার টু ডটার– নিছার আতিক
১১. ইসলাম : সভ্যতার শেষ ঠিকানা – জিয়াউল হক
১২. নবি কাহিনি (শিশুতোষ সিরিজ)– সামছুর রহমান ওমর
১৩. দুআ : দ্যা উইপন অব দ্যা বিলিভার্স– ইয়াসির কাদি, অনুবাদ : মাসুদ শরীফ
১৪. ইতিহাসের ধুলোকালি– পিনাকী ভট্টাচার্য
১৫. Paradoxical Sajid (English Version)- Arif Azad
১৬. Science of propagation- Akhlaqe Rasul